নদিয়া গ্রামের নানা প্রসঙ্গ
শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

Nadia Village History

≈

Shyamal Chattopadhyay

নদিয়া গ্রামের নানা প্রসঙ্গ

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

নদিয়া গ্রামের নানা প্রসঙ্গ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার
নদিয়া গ্রামের বিভিন্ন তথ্যের, গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের বংশতালিকার
ও আঞ্চলিক ইতিহাসের অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

আঞ্চলিক ইতিহাসের লক্ষ্যে প্রাথমিক সংগ্রহ। কেবলমাত্র ঘরোয়া বিতরণের জন্য
বিক্রয়ের জন্য নয়। আইনগত অথবা সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী।

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম নদিয়া, পোঃ ধান্যকুড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কর্তৃক
সংকলিত, মুদ্রিত ও বিতরিত।
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

NADIA GRAMER NANA PRASANGA

A COMPILATION OF SUNDRY NOTES
ON NADIA VILLAGE, P.O. DHANYAKURIA, S.D. BASIRHAT,
DISTRICT NORTH 24 PARGANAS, PASCHIMBANGA
AND
A COLLECTION OF GENEALOGIES OF
SUNDRY FAMILIES OF NADIA VILLAGE

INCOMPLETE AND UNVERIFIED MANUSCRIPT COPY.
PRIMARY COLLECTION FOR A LOCAL HISTORY.
FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY. NOT FOR SALE.
NOT TO BE USED FOR LAGAL OR ADMINISTRATIVE PURPOSES.

COMPILED, PRINTED AND DISTRIBUTED BY
SHYAMAL CHATTOPADHYAY, VILLAGE NADIA,
P.O. DHANYAKURIA, DISTRICT NORTH 24 PARGANAS
10 FEBRUARY 2020

. . . . পুরোনো পোড়ো ভিটের ইষদুচ্চ পোতা,

বর্তমানে হয়তো আকন্দ ঝোপে ঢেকে ফেলেছে তাদের বেশি অংশটা,

হয়তো দু-একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েছে কোনো কোনো পোতায়।

এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির,

স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের,

যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তু ভিটের সঙ্গে জড়িয়ে।

কত সুখ-দুঃখের অলিখিত ইতিহাস

বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয়

শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। . . . .

•

।। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

নদিয়া গ্রামের নানা প্রসঙ্গ

বি ষ য় সূ চি

প্রসঙ্গ-কথা

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগনার একটি অতি সাধারণ, শান্ত, নিরুত্তাপ গ্রাম নদিয়া। শত শত বছরের প্রাচীন জলাভূমির মাঝে পরিত্যক্ত নদীখাতের দ্বারা বেষ্টিত উচ্চ ভুমিতে বসত করেছিল অতীতের পরিচয়হীন মানুষজন। তাই গ্রামের নাম নদিয়া। পরবর্তীকালে গ্রামের পূর্বাংশ হাজরাতলা নামে পৃথকভাবে পরিচিত। বসিরহাট ও বারাসাত শহরের মাঝে টাকি রাস্তার কাছে ধান্যকুড়িয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নদিয়া গ্রাম।

আঞ্চলিক ইতিহাসের লক্ষ্যে নদিয়া গ্রামের বিষয়ে এটি প্রাথমিক সংগ্রহ। আঞ্চলিক ইতিহাসের এক সাধারণ কাঠামো এতে সংযোজিত হয়েছে যা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা সামগ্রিক আকার পাবার প্রত্যাশা রাখে।

এই সংকলন কেবলমাত্র ঘরোয়া বিতরণের জন্য। বিক্রয়ের জন্য নয়। এর তথ্য সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী। সংকলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও অনেক ত্রুটি থাকতে পারে - যার সম্পূর্ণ দায় কেবলমাত্র সংকলকের। তথ্যগুলির মধ্যে ইতিবাচক কোনও বিষয় মিললে তার কৃতিত্বের দাবিদার অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁদের সহযোগিতায় এই কাজ সম্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে ১৯৮০-এর দশকে নদিয়া ও গোকনা গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং করা হয়েছিল। এই কাজে সর্বক্ষণের সহযোগী ও সঞ্চালক ছিলেন বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কখনও সঙ্গে ছিলেন অরুণ রায় ও প্রিয়বাস চট্টোপাধ্যায়।

অনেক ভূমিপুত্র ও ইতিহাসপ্রেমী এই প্রয়াসে আনুকুল্য ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন - যাদের মধ্যে আছেন - নিমাই (তুফান) দাশ, রমাকান্ত রায়, সুবিনয় রায়, মোঃ জোহর আলি, হিমাংশু রায়, রামদুলাল দাশ, বিভাষ চট্টোপাধ্যায়, নীরজ চট্টোপাধ্যায়, সুবীর রায়, মোঃ আবদুর রসিদ, জয়ন্ত দাশ, শ্রীমতী রূপা দাশ, শুভাশিস রায়, সত্যদুলাল মণ্ডল, দিলীপকুমার মৈতে ও অন্যান্যরা।
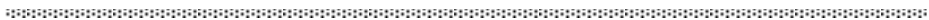
নাম রহস্য

জেলা চব্বিশ পরগনার সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটে শান্ত, ছায়া-সুনিবিড় পল্লিগ্রাম 'নদিয়া'- কে চিহ্নিত করা কষ্টকর। বাংলার প্রতিটি গ্রামের আছে আবহমানকাল-লালিত একান্ত সত্তা, আছে আত্ম গরিমা। নদিয়া গ্রামেরও অতীত দিনের পুঞ্জীভূত নীরব আত্মকথা এখনও পরিব্যাপ্ত আছে তার ঘাটে-বাটে, প্রান্তরে-বাতাসে।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখেছিলেন, "একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয়না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেতমাত্র হয়। এমন গ্রামও আছে যাহার জন্ম অবজ্ঞায় নামও ঘৃণায় বিকৃত; কিন্তু পরে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছে। . . . . . গ্রামের নামের সঙ্গে কত ইতিহাস লুকানো আছে, তাহা কে উদ্ ঘাটন করিবে ?"[১]

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম' বইতে 'গ্রাম-নামের অন্ত্য-পদ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে –

'দ্বীপ / দ্বীপা / দীয়া – এ-অন্ত্য-পদগুলি সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মন্তব্য - " সংস্কৃত 'দ্বীপ' –মূল অর্থ – দুই দিকে জলবেষ্টিত ভূমি। চারিদিকে জলবেষ্টিত হইলেও দ্বীপ। পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ।... নবদ্বীপ – নুতন দ্বীপ – প্রাচীন বাংলায় নঅদীয়া / নদীআ / নদীয়া। এইরূপে 'দীয়া' যথা, কুতবদীয়া, লক্ষণদীয়া।" আশা করি, আলোচ্য অন্ত্য-পদগুলির ব্যুৎপত্তি এ থেকেই প্রাঞ্জল হবে।

অবস্থান বা আকৃতিগত কারণে এই শ্রেণীর কিছু গ্রাম-নামের সৃষ্টি হয়েছে। যথা – নদীয়া .... (২৪ পরগণাঃ বসিরহাটঃ ২৬১১ [জন সংখ্যা / ১৯৭১ সাল], মহাদীয়া ... মুর্শিদাবাদঃ কান্দী), মাঝদীয়া ... (নদীয়াঃ কৃষ্ণগঞ্জ) প্রভৃতি।' [১]

সুন্দরবনের ভাঙাগড়ার খেলা থেকে এতৎ-সন্নিহিত অঞ্চল রেহাই পায়নি। মোগল রাজত্বে বালিয়া পরগনার সার্বিক চেহারা ছিল প্রধানত লবণাক্ত জলাভূমিতে বিল-বাওড় আর বিক্ষিপ্ত উচ্চভূমি ও জঙ্গল।

১. পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম : অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র মিত্রের অভিমত - 'প্রায় সকল নদীর পাশেই বাঁওড় আছে । কারণ সকল নদীই কোন না কোন কালে পরিবর্তন করিয়া খাত রাখিয়া গিয়াছে । কোন নদী মড়িয়াছে , কোন নদী এখনও সজীব আছে। সকলেরই খাতের চিহ্ন আছে ' ।[১]

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ নদিয়া গ্রামকে বেষ্টন করে ছিল হয়তো শীর্ণকায়া নদী অথবা কেবল জলবেষ্টনী যার রেখা এখনও বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণে বিল ও মাঠের আকৃতিতে । এরূপ ভূখণ্ড আছে স্বরূপনগর থানার কঙ্কণা বাঁওড় দিয়ে ঘেরা 'মেদিয়া' গ্রাম । বাংলাদেশের খুলনা জেলায় 'কার্তিকদিয়া' নামে নদী দিয়ে ঘেরা একটি গ্রাম আছে ।

খেয়া পারাপারের ঘাট ছিল ষষ্ঠীতলার বট গাছের নীচে । নৌকো গিয়ে পড়ত ইছামতীর পথে বাদুড়িয়া ছাড়িয়ে সোনাই নদীতে । যাওয়া যেত আমোদিয়া , সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা পর্যন্ত ।

গ্রামের বিভিন্ন স্থানে পুকুর কাটার সময় নৌকোর ভগ্নাংশ মিলেছে । 'গোয়ালা বাগানে' পুকুর কাটার সময় গবাদি পশুর হাড় , হরিণের শিং, গোলপাতা পাওয়া গেছে ।

অগ্রজদের কাছে নদীর কথা শুনেছেন অনেক প্রবীন ব্যক্তি । কিন্তু কী নাম ছিল সেই নদীর? পশ্চিম নদিয়ার নিমাই দাশ (তুফানচন্দ্র) পিতা-পিতামহর কাছে শুনেছিলেন নদীর নাম ছিল 'সুতানটী' । সেই নদীর এক প্রান্ত পদ্মার সঙ্গে , অপর প্রান্ত ধেড়ের বিল হয়ে বাদুড়িয়ার কাছে ইছামতীর পুরনো খাতে মিশেছিল । পুরনো জমিদারি খাতাতেও লেখা পাওয়া যায় 'জসাইকাটির বাঙ্গরের' কাছে 'সুতানটী'-র জমি ।

এই অবলুপ্ত নদীর বিষয়ে প্রকৃত তথ্য মিলতে পারে জমিদারি সেরেস্তার জীর্ণ কাগজে , আলিপুরের সার্ভে অফিসের ১৮৪২ সালের ম্যাপ ইত্যাদিতে ।

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত 'আড়বেলিয়া খাল ' হল বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত মনসা বিজয় কাব্যে উল্লেখিত 'বল্লুকা' নদী ।[২] এই খালের উৎস বাগজোলার উত্তরে মগরার নিকট প্রাচীন পদ্মা নদী থেকে । আবার বিথারি বাঁওড় ও শিবহাটির বক্রচন্ডীর বাঁওড় হল হারিয়ে যাওয়া 'গোবর্ধন' নদীর অবশেষ ।

আলিপুরের সার্ভে অফিসের ১৮৪২ সালের শিকড়া কুলীনগ্রামের ম্যাপে ঐ গ্রামের উত্তরে ইছামতীর এক শাখা নদী দেখা যায় । পরে এই শাখা নদী বাঁওড়ে পরিণত হয় ।[৩]

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র
২. বশিরহাট মহকুমার ইতিহাস : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীনগ্রাম : অরুণ প্রকাশ ঘোষ

সাকিন জসাইকাটী

সুতানটীর জমি →

'সুতানটী' নদী । দ্রষ্টব্য পৃঃ ১২

প্রবীণেরা বলতেন নদিয়া ‘সূর্যবেদী’ (সূর্যবেধী) গ্রাম । যে-কোনো পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ গ্রামকে সূর্য ‘বিদ্ধ’ করে, আর সে কারণে তা অমঙ্গলকর (বঙ্গীয় শব্দকোষ) । আগে অনেকে ধারণা করতেন ‘সূর্যবেদী’ গ্রামে একজনের মৃত্যু হলে পর পর তিনজনের মৃত্যু হবে ।

জনগণনা-২০১১-তে নদিয়া গ্রামের কোড : ৩২৩৫৭৯ । আসামের নলবাড়ি জেলায় ‘নদিয়া’ নামে গ্রাম আছে (কোড : ৩০৩৭৩১) । আসামের কামরূপ জেলায় নদিয়া নামে গ্রাম আছে (কোড : ৩০২৬২৬) । নদিয়া জেলার রাণাঘাট ১ ব্লকে ‘ঘোল নদিয়া’ নামে গ্রাম আছে (কোড : ৩২২০২৩) । ‘নদিয়া চক’ নামে গ্রাম আছে ঝাড়খণ্ডের জামতারা জেলার কর্মাটাঁর (বিদ্যাসাগর)-এর কাছে (কোড : ৩৭২৬১৬) ।

নয়া বসত

কোন সে অতীতে অচেনা ডাঙাতে পা রেখেছিল ভিন অঞ্চলের মানুষজন । নদীবেষ্টিত স্থানের নতুন আস্তানার নাম রেখেছিল 'নদিয়া' । কালে কালে ফাঁকা জমিতে ক্রমাগত বাদা-জঙ্গল কেটে বেড়েছে বসত । গতিহারা নদীবক্ষ পরিণত হল বিলে । বিলে ছিল হোগলার বন । অনেক পরে, প্রথমে দক্ষিণ বিলে, তারপর উত্তর বিলে চাষ শুরু হয় ।

নদিয়া মৌজার পূর্বাংশ হাজরাতলা গ্রাম নামে পৃথকভাবে পরিচিত ।

এই অঞ্চল নবাবী আমল থেকে সপ্তগ্রাম সরকারের অর্ন্তগত 'বালিয়া' পরগনার মধ্যে ছিল । প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মানসিংহের অন্যতম সহযোগী হিসাবে ভবানন্দ মজুমদারের উত্থান ঘটে । বালিয়া পরগনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এলাকাধীন হয় ।

নদিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী রাজবেড়িয়াতে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছারির (রাজবাড়ি) ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে । ধান্যকুড়িয়ার রামদেব কাবাসী এই অঞ্চলে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছারিদার ছিলেন ।[১] ইংরেজরা যে ২৪টি পরগনার জমিদারি সত্ত্ব লাভ করেছিল তার একটি ছিল বালিয়া পরগনা ।

প্রথম বসত নাকি গড়ে উঠেছিল গ্রামের দক্ষিণ বিলের 'গোঁজকাটা'-তে ।

মহামারির দাপটে কখনও লুপ্ত হয়েছে অথবা চলে গেছে গ্রামের কিছু পরিবার । কখনও পুনরায় সুন্দরবনের গ্রাসে কবলিত হয়েছে সমগ্র অঞ্চল আবার এসেছে নতুন মানুষ । জনবিন্যাসে সংযোজন-বিয়োজন ঘটেই চলেছে ।

২৪ পরগনায় গুটি-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ১৮৬৬ সালে । ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল ১৯০০ সালে । কলেরা-ওলাওঠা-প্লেগ-মহামারি লেগেই থাকত । এসব কারণে অনেক পুরনো বসতি বিলুপ্ত হয়েছে ।

মধ্য-উত্তর পাড়া (চাটুজ্জে পরিবারের আম বাগান) থেকে উধাও হয়েছে কোনও কুম্ভকার-পল্লি - যার চিহ্ন এখনও আছে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে । এই পাল পরিবারের শেষ ব্যক্তি ছিলেন যদু পাল । তাদের পুকুরটি 'কুমোরপুকুর' নাম থেকে পরে পরিচিত হয়েছিল চাটুজ্জেদের বাগান পুকুর নামে ।

১. ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মরণিকা - ১৮৮৫-১৯৮৫

পশ্চিম নদিয়ার দত্ত পরিবারের নামমাত্র স্মৃতি নিয়ে আজও আছে 'দত্ত পাড়া' ও 'দত্তদের পুকুর'। মড়কের তাড়নায় স্বজনদের হারিয়ে সুনাথ দত্ত ও শশী দত্ত রানাঘাটের কাছে কোনও গ্রামে চলে যান। পুরনো জমিদারি খাতায় পুবের মাঠে 'দত্তের আটি' নামে কৃষি জমির উল্লেখ দেখা যায়। তেমনি কোড়া-পদবীধারীদের বসতি এখন না থাকলেও তাঁদের 'কোড়াপুকুর' এখনও আছে।

জনজীবনে পুকুরগুলির ছিল একান্ত উপযোগিতা। প্রায় সব পুকুরেরই ডাকনাম থাকে। 'নদের পুকুর' (বড় পুকুর) একটি ল্যান্ডমার্ক তথা দিশা চিহ্ন। এছাড়া কোড়া পুকুর, দত্তদের পুকুর, গঙ্গাপুকুর (গঙ্গাধর রায়ের?), ভয় পুকুর, হিমসাগর পুকুর, নতুন পুকুর, ঘটক পুকুর, চক্রা পুকুর, যুগীয়া পুকুর।

গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আছে কয়েকটি দিশা চিহ্ন, যেমন - পঞ্চাননতলা, গাজিতলা, গোঁজকাটা, লক্ষীতলা, ষষ্ঠীতলা, বারোয়ারিতলা, গাবতলা, হাজরাতলা, যুগীয়া বাগান, গয়লার বাগান, জাঙ্গাল, ঘটকার ধার।

নদিয়া গ্রামের বর্তমান পরিবারগুলির মধ্যে কয়েকটি খুব প্রাচীন।

ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলের গ্রামগুলির শিক্ষা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে ধান্যকুড়িয়ার দানশীল জমিদারদের প্রভাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে শুরু করেন ১৯৫৫ সালে মার্টিন রেলের অবলুপ্তির ফলে।

দক্ষিণ মাঠের গাজিতলায় উচু জমিতে ইতস্তত ছড়ানো ভাঙা ইট ও পোড়ামাটির জিনিসের টুকরোর পিছনে কোন লুপ্ত বসতির চিহ্ন লুকিয়ে আছে কে জানে। হয়তো বা অতীতে কোনও গাজি-দরবেশ আস্তানা করেছিলেন সেখানে।

উত্তর মাঠের পুব দিকে আড়বেলিয়ার কাছে ছিল 'পদ্ম বিল'। এখনও আছে 'ভীমের খাল'। এককালে সেখানে ছিল ষোলটি তালগাছ। উত্তর মাঠে কয়েকটি 'কুনি জলকর' আছে।

পশ্চিম নদিয়ার উত্তরে গোকনা গ্রামের দক্ষিণ সীমান্ত অতীতে পরিচিত ছিল গাড়াগাছা গ্রাম নামে।

জনগণনা-২০১১-এর তথ্য বলছে নদিয়া গ্রামের আয়তন ২৮১.৭৬ হেক্টর, পরিবার সংখ্যা ৯৭১, মোট জনসংখ্যা ৩,৯১০ যার মধ্যে পুরুষ ১,৯৭৯ ও মহিলা ১,৯৩১, মোট শিক্ষিত ৩,০১৬ জন যার মধ্যে পুরুষ ১,৬০৯ ও মহিলা ১,৪০৭ জন, মোট কর্মী ১,১৯২ জন যার মধ্যে পুরুষ ১,১১৪ ও মহিলা ৭৮।

রাজা গদাধর রায়ের উত্তর পুরুষ

রায় পরিবারের পূর্বপুরুষরা নদিয়া গ্রামে আসেন বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রাম থেকে। এই গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের 'রায়' খেতাব লাভ বারো ভুঁইয়াদের রাজত্বকালে।

গদাধর রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মহেশ মজুমদার (রায়) বা তাঁর দুই পুত্র মথুরেশ রায় ও রামগোপাল রায় সম্ভবত ১৬৫০ সালের পরে নদিয়া গ্রামে বসতি শুরু করেন। মথুরেশ রায় ও রামগোপাল রায়ের উত্তর-প্রজন্মের বহু পরিবার গ্রামে বসবাস করছেন। বংশানুক্রমিকভাবে বহু-বিভক্ত রায় পরিবারের পুরোনো অট্টালিকাগুলির অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

মোগল রাজত্বে প্রতাপশালী সামন্ত জমিদার ছিলেন হায়দারপুরের রাজা গদাধর রায়[১]। নিকটেই আঁধারমানিক গ্রামে ছিল তাঁর ছোট ভাই শ্যামসুন্দরের প্রাসাদ। রাজা গদাধর বিদ্যোৎসাহী, দানী ও অন্যান্য মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁরই বদান্যতায় নিকটে মালঙ্গপাড়া সংস্কৃত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী চলত।
রাজা গদাধরের স্মৃতি-বিজরিত গ্রাম কীর্তিপুর, রাজপুর ও মাদরা। মালঙ্গপাড়াতে তাঁর রাজপুরোহিতের নিবাস ছিল। ঐ বংশের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন গঙ্গাধর ন্যায়ভূষণ।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে মানসিংহ গৌড়বঙ্গ রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন যা ঐ নামে এখনও আছে। রাস্তাটি হায়দারপুরের উপর দিয়ে যাবে শুনে গদাধর রায় আপত্তি করেন। মানসিংহের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হল এবং তিনি মানসিংহের কাছে পরাজিত হন। তাঁর রাজবাড়ি বিধ্বস্ত হল।
একই ভাবে মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে আঁধারমানিক গ্রামের তাঁর ভাই শ্যামসুন্দর সপরিবারে নিহত হন। এরপর গদাধর রায় তেঁতুলিয়ার নিকটে তাঁর বাগানবাড়ি 'খাসের বাগানে' বাস করেন। সে যায়গা এখন খাসপুর গ্রাম নামে পরিচিত। সম্ভবত এখানে সাময়িকভাবে বাস করার পরে আবার তিনি হায়দারপুরে চলে যান।

প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে তাঁর অনুগত বহু ভূস্বামী পরিবারে বিপর্যয় ঘটে, যেমন বিপর্যস্ত হয়েছিলেন রাজা গদাধর রায়। অপরদিকে নদিয়ার (জেলা) রাজবংশ, সাবর্ণ চৌধুরি পরিবার ও বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশের উত্থান ঘটে। যশোর রাজ্য 'তিন মজুমদার' করায়ত্ত করেন।[২]

১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা / পান্নালাল মল্লিক
২. যশোহর খুলনার ইতিহাস /সতীশচন্দ্র মিত্র

নদিয়া গ্রামের রায় পরিবারে রক্ষিত প্রাচীন কুরচিনামাতে দেখা যায় প্রথমে গদাধর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবচন্দ্র রায়ের প্রপ্রৌত্রগণ একে একে হায়দারপুর ছেড়ে বসতি করছেন খাঁটুরা, খাসপুর (তেঁতুলিয়া), ভেবিয়া, মুড়াগাছা, মালঙ্গপাড়া ইত্যাদি স্থানে।

গদাধর রায়ের অপর পুত্র কংসারি রায়ের বংশধরদের আরও দুই প্রজন্ম সেখানে বাস করার পরে এক অংশ নদিয়া গ্রামে আসেন ও অন্যান্য অংশ নারিকেলবেড়ে, বেহালা-বড়িশা ও মেদিয়া চলে যান। নদিয়ার রায় পরিবারের গন্ধর্ব রায়ের বংশধরেরা পরে হাদিপুর ও কচুয়া চলে যান।

এই রায় পরিবারের তেঁতুলিয়া-খাসপুরের শাখার বাসিন্দা স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন অনুশীলন দলের কর্মী। সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র সত্যেন রায় (বারাসত নিবাসী) প্রবন্ধকার, ছড়া ও প্রবাদ সংগ্রাহক ও চন্দ্রকেতুগড়ের অন্যতম প্রত্ন-গবেষক। এই পরিবারের নারিকেলবেড়ের বাসিন্দা প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

সম্ভবত পাঠান রাজত্বে অথবা যশোর রাজ্য ও সমাজ প্রতিষ্ঠার কালে রায় পরিবার বর্ধমান বা হুগলি থেকে এসে প্রাচীন যশোরের হায়দারপুরে বসতি করেছিলেন। সে সময়ে যশোর রাজ্যের মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী নিজের পূর্বনিবাস হুগলির হরিপাল থানার প্রসাদপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের বহু পরিবারকে যশোরে এনেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী কালে বড়িষার গাঙ্গুলি (সাবর্ণ চৌধুরি) পরিবার মানসিংহ কর্তৃক কলকাতা সন্নিহিত কয়েকটি পরগনার সনন্দ পেয়ে হুগলি জেলার উত্তরাংশের গোহ-গোপালপুর থেকে প্রথমত নিমতায় এবং পরে বড়িষায় বসবাস করতে থাকেন। গোহ-গোপালপুরের পরিবারের অপর অংশ হালিসহরের সাবর্ণ (গাঙ্গুলি) চৌধুরি পরিবার।

হায়দরপুরের পারিবারিক কালী মন্দিরের দেবীর হাতের খাঁড়া ও মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূল নদিয়ার এক রায় পরিবারে এখনও রক্ষিত আছে। হায়দরপুরের মোঃ টেনাজদ্দিন, মোঃ জরিপ মণ্ডল, মোঃ কেরাছতুল্ল্যা মণ্ডল ও অন্যান্যদের সঙ্গে নদিয়ার রায় পরিবারের প্রজাবিলি বন্দোবস্ত বজায় ছিল জমিদারি উচ্ছেদের আগে পর্যন্ত।

নদিয়ার রায় পরিবারের ‘চকের বাড়ি’ গৃহ-বিন্যাসের এক বিরল নিদর্শন। আন্দিরাম রায়ের বংশধরেরা পরস্পর-সংলগ্ন অনেকগুলি বাড়ি এমনভাবে নির্মাণ করেছিলেন যে, বিস্তৃত ভদ্রাসনে সামগ্রিকভাবে বিরাটাকার এক বাড়ি, যার চতুর্দিকে অনেকগুলি প্রবেশপথ আছে ও ভিতরে অনেকগুলি অঙ্গন আছে।

হায়দারপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল ওয়াহাবি ও তিতুমিরের আন্দোলনে।

অন্যান্য পরিবার

নদিয়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষ ১৭৪০-এর দশকে বর্গি-হাঙ্গামার বিপর্যয়ে বর্ধমান অথবা হুগলি অঞ্চলের বাস্তু পরিত্যাগ করেছিলেন। পরে তাঁরা এই গ্রামে আসেন। আন্দিরাম ও মানিকচাঁদ চট্টোপাধ্যায় নদিয়ার মহারাজের কাছ থেকে নিষ্কর ব্রহ্মত্র সম্পত্তি লাভ করে নদিয়া গ্রামে বসতি করেন। সম্ভবত গোবরডাঙার চট্টোপাধ্যায় পরিবার (আদি পুরুষ রামরাম চট্টোপাধ্যায়) তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজিজনগরের (হাড়োয়া) চৌধুরিদের পূর্বপুরুষ মাধব দেওয়ান বর্গি হাঙ্গামার ভয়ে নবাবি কাজ ছেড়ে আজিজনগরে বসতি করেছিলেন।

জনশ্রুতি, দারোগা হরিমোহন দাশ কর্তৃক পুকুর কাটার সময় জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি পাওয়া যায় এবং দক্ষিণ রায়ের পুজোর জন্য তিনি গোপালপুরের ভট্টাচার্য পরিবারকে আনেন।

বিখ্যাত দারোগা হরিমোহন দাশের পুত্রবধূ সুরমাসুন্দরী ছিলেন এন্টালির জমিদার নরেন্দ্র পণ্ডিতের মেয়ে ও রাণী রাসমণির পিসিমা। হরিমোহন দাশ বাড়িতে পাঠশালা বসিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে ছিল অতিথিশালা। হরিমোহন দারোগা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বাড়ি আসতেন।

বিহারের (গয়ার নিকট) টিকারি মহারাণীর বংশের উত্তরপুরুষ টিকারি (মণ্ডল) পরিবার। অতীতে তাঁদের পরিবার বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

অন্যান্য পরিবারদের বেশিরভাগই আসেন উত্তর থেকে (বনগাঁ অঞ্চল)।

তুফানচন্দ্র দাশের বৃদ্ধ প্রপিতামহের বাস ছিল গোদাঘাটা, নদিয়া জেলা।

সমাজ চিত্র

হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি

অতীত দিনের গ্রাম-জীবনের ছবি স্মৃতিমেদুরতার আবেশ আনে। সম্পন্ন গৃহস্থের গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা গরু। দালান বাড়ি। আত্মীয়-পরিজন-দাস-দাসীদের নিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। অসচ্ছলের পক্ষে চালা ঘর, নিকোনো উঠোন। চাষ-বাস, গোরু-বাছুর, পরিবার নিয়ে অভাবের সংসার। শান্ত, নিরুত্তাপ ছিল জীবনযাত্রা।

নদিয়া গ্রামের সব পাড়াতেই ছিল বড় বড় বাঁশের ঝোপ-ঝাড়। হনুমানের দঙ্গল উৎপাত করত সারা বছর। নদিয়া গ্রাম বিখ্যাত বাঁশ আর হনুমানের জন্য। সন্ধ্যায় শুরু হত শেয়ালের ডাক। প্রবীণেরা শুনেছেন এককালে পাড়ায় ঢুকেছে বাঘ আর হায়না। মধ্য পাড়ায় শজারু ধরা পড়েছিল ১৯৫০-এর দশকে।

কালবৈশাখী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসত বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব নিয়ে।

রাস্তার দহে পড়ত গোরুর গাড়ি। গোরুর পিঠে পড়ত পাঁচনের ঘা ক্রমাগত। রাতে ঢেঁকির ধুপ-ধাপ শব্দ। কখনও নিস্তব্ধ রাতে মাঝে-মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসত লোক-কণ্ঠের ভাটিয়ালি সুর।

মাঝ রাতে কোনও পল্লি থেকে উঠত আতঙ্ক-চিৎকার 'আগুন ! আগুন !' রবাহুত অসংখ্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসত উদ্ধারের কাজে - জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত অগ্নি-আবর্তে। অদ্ভুত শৃঙ্খলা আর মিলিটারি দক্ষতায় সমাধা হত যথাসাধ্য চেষ্টা।

কুমোর পাড়ায় নিত্য তৈরি হত মাটির বাসনপত্র। বৈশাখ মাসে 'চাক' বন্ধ থাকত। মাটির জিনিস শুকিয়ে গম্বুজ আকারের 'পন'-এ পোড়ানো হত।

বিরল হয়েছে হরেক রকমের পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, ছারপোকা, অনেক প্রজাতির দেশজ ফল, ফুল, গাছ-গাছালি।

দক্ষিণ মাঠে ১৯৫০-এর দশকে কয়েক মাস ধরে তেলের সন্ধানে ঘন ঘন নামত হেলিকপ্টার।

কনেবউ আসত ছই-লাগানো গোরুর গাড়িতে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে পালকি ব্যবহার হত। বিয়ের পালকি গ্রামে শেষ দেখা গেছে ১৯৫০-এর দশকে।

বিয়ের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে লাল কালিতে ছাপা 'বিয়ের কবিতা' বিতরণ করা হত। তার পরিবর্তে এখন দেওয়া হচ্ছে মেনু-কার্ড। গুরুজনেরা নববধূর মুখদেখানিতে হাতে টাকা দিতেন। অতীতে বিবাহ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দুপুরেই ভোজ হত। ভোজে আসার জন্য আবার একবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানান দেওয়া হত। শীতলপাটির আসনছিল। ব্রাহ্মণদের পৃথক পংক্তিতে বসানো হত।

ডানপিটে গোকুলদি পুরুষ মানুষের মত তর-তর করে গাছে উঠে ডাব পাড়তেন।

'ভোজ পাগল' ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিত্য যাতায়াত করত রাজবেড়িয়া থেকে মেটিয়া।

নানান রকম কাপড়ের তালি দেওয়া জোব্বা পরে দরবেশ আসত 'মুস্কিল আসান' হাঁক দিয়ে।

লাঠি খেলার দল আসত মোকামপুর, আগাপুর থেকে। পুতুল নাচের দল আসর বসাত কখনও কোনও পাড়াতে, অথবা রামযাত্রার বা মনসার জাগরণ পালার দল।

মুখে মুখে ছড়া কাটতেন স্বভাবকবি মোঃ আহমদ আলি। মোঃ আতর আলি গায়েন (গোকনা) আসর জমিয়ে কবিগান গাইতেন।

সে সময়ে রকমারি দেশজ খেলা হত। লুকোচুরি, চু-কপাটি, হা-ডু-ডু, গাদি, কানামাছি, চু-কিৎ-কিৎ, এক্কা-দোক্কা, রুমাল-চুরি, দড়ি-লাফানো, মার্বেল-গুলি, ডাং-গুলি, লেত্তি-বাঁধা আল-ওয়ালা লাট্টু খেলা, ছিল গুলতি দিয়ে পাখি মারা, 'রণপা'-য় হাঁটা, লোহার 'রিং' চালিয়ে রাস্তায় ছোটা, খালি গোরুর গাড়িতে 'ওলা-দোলা' খেলা। আমের সময় পকেটে চাকু বা ছুরি। উৎসবের দিনে টোটা বন্দুক, হাতে-বানানো চাবি-বন্দুকের বাজি, গেঁটে কামান।

তুবড়ি বানানো, ঘুড়ি বানানো আর সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া যুবকদের কাছে ছিল এক শিল্পকর্ম।

দোলের সময় বাঁশের পিচকারি বানানোর হিড়িক লাগত।

ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ। নষ্টচন্দ্রের নিশুতি রাতে গৃহস্থের ক্ষয়-ক্ষতি করত পাড়ার ছেলেরা। গৃহস্থের কাজ ছিল কী করে এই সব ভদ্র ঘরের চোরদের ঠেকাবে, আর পাড়ার-ছেলে চোরদের কাজ ছিল কী করে গৃহস্থদের ঠকাবে। এক বাড়ি থেকে গাছের ফল ইত্যাদি চুরি করে এনে অন্য বাড়িতে ফেলে আসত।

শিশু ভূমিষ্ঠ হত বাড়ির আঁতুরঘরে। ডাক্তার-নার্সের কাজ সারত পাড়ারই 'দাই'।

সেকালে শিশুর চোখে থাকত কাজলের টান আর মায়ের পায়ে আলতা।

শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে কুলো বাজিয়ে গান হত -

'আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল . . . '।

পাড়ার ছেলেরা আট ভাজা, বাতাসা আর পয়সার আটকৌড়ে বিদায় পেত।

সে কালে ছিল ভূতের আর ছেলে-ধরার উপদ্রব। ভয় ছিল পুকুরের যক্ষীবুড়ির। যক্ষীবুড়ি থাকত জলের গভীরে, কিন্তু কখনও ভর-দুপুরে ভেসে উঠত একরাশ পাকা চুল মেলে।

'নিশির ডাক'-এ ভয় ছিল মানুষের। বাণ-মারা, তুক-তাকে ছিল মানুষের বিশ্বাস। চোর ধরার জন্য ডাকা হত গুণিনকে। গুণিন চাল-পড়া, হাত-চালা, নল-চালা ইত্যাদি বিদ্যার সাহায্যে চোরকে হাতে-নাতে ধরত।

ছোটোরা সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাইরে গেলে হাতের মুঠোয় রাখত নাগ-দনা পাতা। লোকের বিশ্বাস ছিল এই পাতার গন্ধে ভূত-প্রেত দূরে পালাবে।

মেয়েদের সময় কাটত হাতে বানানো পোড়ামাটির পুতুল অথবা চিনেমাটির পুতুল নিয়ে খেলা, পুতুলের বিয়ে দেওয়া, সই পাতানো।

কুমারীরা সারা বছর অনেক ব্রত পালন করত। তাদের কণ্ঠে থাকত -

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী . . . .

বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের ওপর ছিদ্রযুক্ত জলপূর্ণ পাত্র ঝুলিয়ে 'ঝারা' দেওয়া হত।

নেমতন্ন বাড়িতে পেট পুরে খাওয়ার ধুম ছিল। বরযাত্রীর দলে খাইয়ে-লোক থাকতেন, তাঁরা খেয়ে ও খাবার নষ্ট করে বাহাদুরি নিতেন। গ্রামের বৃদ্ধ তারাপদ রায় ১৯৪০-এর দশকে মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগেও এক নেমতন্ন বাড়িতে ৯৯টা লেডিকেনি খেয়েছিলেন।

নস্যির টিপ হাতে নিয়ে, খড়ম পায়ে, আড্ডা চলত বৈঠকখানায়, মাচায় বা পুকুরের রানায় বসে।

পোশাক ছিল অতি সাধারণ। খালি পায়ে ছোট ধুতি বা লুঙ্গি আর কাঁধে গামছা। সম্ভব হলে ফতুয়া, দোলাই ও শীতে সুতির চাদর। পরে এল টায়ারের চটি ও হাওয়াই চপ্পল।

বাবুলোকদের ঘড়ি থাকত জামার ঘড়ির পকেটে বা রুমালের মধ্যে।

সাধারণ লোকেরা সচরাচর পায়ে হেঁটেই দূর পথে যাতায়াত করত। আর ছিল গোরুর গাড়ি, পালকি, নৌকো। ইংরেজরা ঘোড়ার গাড়িতে ডাক ব্যবস্থা শুরু করার পরে ঐ ডাক-গাড়িতে দূরপথে যাওয়ার জন্য যাত্রী বহনেরও ব্যবস্থা হয়। রেলপথ চালু হওয়ার পরে যাত্রী বহনের ডাক-গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

‘চাই চিনে সিঁদুর’ হাঁক শুনে মেয়ে-বউরা গুটি গুটি এগিয়ে আসত। গঙ্গারামের পিঠে বিরাট বোঁচকা। গঙ্গারাম দাওয়ায় বসে বোঁচকার গিঁটগুলো খুলত এক এক করে আর ধীর আগ্রহে ঘিরে থাকত মেয়েরা। বোঁচকায় থাকত চুড়ি, ফিতে, টিপ, আলতা, সিঁদুর, হিমানি, নখ-পালিশ, গুলি-সুতো, চিরুনি, সাবান, আয়না ইত্যাদি মেয়েদের লোভনীয় হরেক প্রসাধনী। কোনও ফেরিওয়ালা আবার হাতেও অতিরিক্ত একটা কাচের ঢাকনাওয়ালা বাকসো রাখত।

বাঁকে দই অথবা ঘোল আর হাওয়াই মেঠাই নিয়ে ফেরিওয়ালা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত। ঘুরত বায়োস্কোপের ফেরিওয়ালা রোমাঞ্চকর যন্ত্র নিয়ে। সিনেমা দেখার জন্য ঢাকনা দেওয়া গোল গোল খোপ। বাসনওয়ালা ঘন্টা বাজিয়ে পেতল-কাঁসার বাসন নিয়ে ফেরি করত, পেছন পেছন হাঁটত তার মুটে বাসনের ঝাঁকা নিয়ে।

পাড়ায় ছিঁচকে চোর ধরা পড়ত প্রায়ই। শাস্তি ছিল বেদম প্রহার, জল-বিছুটি।

কোনও না কোনও ডাক দুপুরের নিস্তব্ধতা ভাঙতো - ‘বাসুনে নাম লেখাবে’, ‘বাত ভালো, বেদনা ভালো’, ‘ভিক্ষে পাই মা’, ‘চাই হিং’, ‘শিল কা-টা-ও’, ছুরি-কাঁচি শান দেওয়ার লোক, শাঁখার ছোট বাকসো নিয়ে শাঁখারি।

ডুগডুগি বাজিয়ে খেলাওয়ালা বানর, ভাল্লুক খেলা দেখাত। সাঁপুড়ে দেখাত সাপ খেলা।

ধান্যকুড়িয়ার বিখ্যাত ‘রাসের মেলা’ ছিল সমগ্র সমাজের বিশেষ আকর্ষণ। দূর - দূরান্তের মানুষ উরভোগ করত কলকাতার সেরা দলের যাত্রাপালা। মায়েরা, শিশুরা কিনত হরেক মনোহারী জিনিস।

শিশুদের ভয়ের বিষয় ছিল যমালয়ের দৃশ্যের ছবিগুলি (‘যমপট’) যাতে থাকত শিং-ওয়ালা যমদূতরা পাপীদের প্রকাণ্ড কড়াইতে ফুটন্ত তেলে ফেলছে, করাত দিয়ে দেহটাকে চিরে ফেলছে, কাউকেবা শূলে বিদ্ধ করছে।

কিশোরদের প্রিয় ছিল স্বপনকুমার সিরিজ ও মোহন সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনি, ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানার ছোট ছোট গল্পের বই।

পায়ে-চলা ‘রানার’ ডাক হরকরা ১৯৫০-এর দশকের পরে আর দেখা যায়নি।

অনেক বাড়িতে ঘোড়া থাকত।

প্রভাত রায় ছিলেন নাম করা পালোয়ান। কয়েকজন অনুচর নিয়ে দাপটে থাকতেন। তাঁর পালোয়ানি সম্পর্কে অনেক গল্প ছিল এ অঞ্চলের সকলের মুখে।

গঙ্গায় দাহ করার জন্যে পাড়ার উপযুক্ত লোকেরা মড়া কাঁধে নিয়ে হামেশাই হেঁটে গঙ্গায় যেত।

সেকালে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পরে লাইন দিয়ে যেত সিনেমাতে বিনা পয়সায় দেশাত্মবোধক ছায়াছবি দেখার জন্য। টিকিট কেটে সিনেমা দেখার খবর পেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেই ছাত্রকে শাস্তি দিতেন।

সমাজ শাসন করতেন প্রবীণেরা। সতীশ রায়, রাসবিহারী রায়, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চানন পাল, নলিনী মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোঃ ইউছুপ আলি, তারাপদ রায়, ফণীভূষণ দাশ, বিনোদবিহারী মণ্ডল ও অন্যান্য প্রবীণেরা সকলের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একবার কলকাতা থেকে তখনকার আশ্চর্যের জিনিস নির্বাক ছায়াছবি 'দিল্লির দরবার' আনিয়ে বাড়ির প্রাঙ্গণে পর্দায় পল্লিবাসীদের দেখিয়েছিলেন।

দু-একটি বাড়িতে ছিল 'কলের গানের' যন্ত্র।

কলুপাড়ায় ছিল গোরু-চালিত সরষের তেলের ঘানি। পূর্ব নদিয়াতেও আরমান কলু, লালু কলু, হারান কলু ইত্যাদি নাম দেখা যায় পুরনো কাগজপত্রে।

ঢোল সহরৎ (ঢেঁড়া) করে পথে পথে ও হাটে সরকারি ঘোষণা জারি হত।

সিনেমার প্রচারও এভাবে হত, তবে তার সঙ্গে প্রচারপত্রও বিলি হত - 'আসিতেছে' বা 'সগৌরবে চলিতেছে' অমুক বই (ছায়াছবি)।

অন্যের গোরু-ছাগল গৃহস্থের গাছ, শস্য, ফসলের ক্ষতি করলে গৃহস্থ ঐ প্রাণীকে সরকারি খোঁয়াড়ে চালান দিত।

মাতৃবৎসল আলমবারী বিশ্বাস (টেঁটে) আর তার মা (হাজি বিবি) জীর্ণ কুটিরে সারা জীবন দারিদ্র ও কষ্টকে সয়ে জীবনমঞ্চ থেকে বিদায় নিল দুজনেই। ঝাপসা স্মৃতিতে রয়ে গেছে মা-ছেলের স্নেহ-ভালবাসার পবিত্র ছবিটুকু।

আর একটা পবিত্র ছবি ভেসে ওঠে পুত্রবৎসল বৃদ্ধা মা-মেনকা বৃদ্ধ, সরল ছেলে পঞ্চাননকে সারা জীবন আগলে এসেছেন পর্ণ কুটিরে। স্নেহ-ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় ভরা দুটি জীবন নীরবে বিদায় নিল অল্পদিনের ব্যবধানে।

নির্বান্ধব, নিরাশ্রয়, ভবঘুরে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কেন্দ্রে কীভাবে এসে পড়েছিল অকাল-জীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে। অল্পদিনেই সকলের আপনজন ও পাড়ার অতিথি 'বিমলদা' হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যিক লু শুনের মূর্তিমান 'আ কিউ'। কয়েক বছর পরে নীরবেই দেহ রাখল তার ভালোলাগার এই গ্রামটিতে।

নদিয়া গ্রামের কেন্দ্রে বড় পুকুরের কাছে আছে বিখ্যাত ল্যান্ড-মার্ক 'গাঁথন'। পরচর্চার ও আড্ডার পীঠ। সতীশ রায় মহাশয় তৈরি করেছিলেন ১৯৩০-এর দশকে। তিনি এখানে বসতেন মাতব্বরদের নিয়ে। যার-যার আসন ও বন্ধু-গোষ্ঠী নির্দিষ্ট থাকত। পরে বসতেন রাসবিহারী রায়, শৈল রায়, কিশোরী মুখার্জি। বসতেন ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। 'গাঁথনে' বসে অলস, নির্বিকার ও নিস্ফল অবসর কাটানোর আমেজই আলাদা। অবশ্য পরচর্চার এই পীঠ এড়িয়ে-চলা মানুষও কিছু ছিলেন। পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে এখনও 'গাঁথন' আছে - কেবল আসর-জমানো প্রজন্ম-পর্যায় ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে মোটামুটি নিরুত্তাপ ছিল নদিয়া গ্রাম। তবে ১৯৩০-৪০-এর দশকে ব্রতচারী ও দেশাত্ববোধক গান গাইতেন তরুণেরা। কুস্তির আখরা ছিল মাসচটকের বাগানে (রজক পাড়ার কাছে)। স্বদেশীদের গানটি তুফানচন্দ্র দাশ ও প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাসের স্মৃতি থেকে উদ্ধার-

বন্দে মাতরম্।
আল্লা হো আকবর।
সবকা মুখে বল না যে
দেশের মাতা দেশের পিতা আজ আমাদের সেই মহাত্মা।
দেশ কা বন্ধু চিত্তরঞ্জন সব কা দেবতা গান্ধিজি।
বন্দে মাতরম্।
আল্লা হো আকবর।
ভাইয়ে ভাইয়ে একই হয়ে দেশের কাজে লাগ যে।
ইংরেজ হঠাও।
ইংরেজ হঠাও।
ইংরেজ ভারত ছাড়ো।
ইংরেজ ভারত ছাড়ো

কিছু শ্রমজীবী মানুষ অন্য গ্রামের দেখাদেখি ধেড়ের বিল থেকে নোনামাটি এনে লবণ তৈরি ও বিক্রি করেছেন । আড়বেলিয়া ইত্যাদি ভিন গাঁয়ের স্বদেশীরা দরিদ্র পরিবারগুলিতে চরকায় সুতো কাটিয়ে নিয়ে যেতেন এসব কাজে তারাপদ রায় , সুবোধ চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করতেন । 'হিতবাদী' পত্রিকা কদাচিৎ আসত গ্রামে ।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর সকালে নতুন ভারতকে স্বাগত জানাতে গ্রামবাসীদের আবেগময় শোভাযাত্রা পরিক্রমা করেছিল গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ।

সমাজ চিত্র : গুণীজনের পদচারণা

নদিয়া ভট্টাচার্য বাড়িতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও চপলা ভট্টাচার্য এসেছিলেন ৭ জুলাই ১৯৫১ তারিখে।

জাগৃহি ময়দানে ১৯৬০-এর দশকে এসেছেন শৈলেন মান্না, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য। এখানে খেলেছেন ভেঙ্কটেশ, সাত্তার, নারায়ণ সান্যাল, মনা ঘোষ, নীলেশ সরকার, উৎপল ভৌমিক, বিনু চ্যাটার্জি, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি। এসেছেন ফিফা রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসবে এসেছিলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডাঃ সরোজ গুপ্ত, সবিতাব্রত দত্ত, সুরজিং সেনগুপ্ত ও অন্যান্য গুণীজন। ১৯৯৩ সালের শারদোৎসবে যোগব্যায়াম প্রদর্শনীতে এসেছিলেন মাননীয় মনোহর আইচ। ২০০৫ সালে 'জাগৃহি'-র 'রবীন্দ্র-নজরুল-সন্ধ্যায়' এসেছিলেন সাহিত্যিক মোঃ সোহারাব হোসেন।

সিনেমা ও টেলিফিল্মের সুটিং-এ এসেছেন অপর্ণা সেন, রূপা গাঙ্গুলি, শতরূপা সান্যাল প্রমুখ। ধান্যকুড়িয়ার গাইন বাড়িতে 'লা নুই বেঙ্গলি' সিনেমার সুটিং-এর সময় নদিয়া গ্রামে কয়েকমাস বাস করেছেন ফরাসি পরিচালক নিকোলাস ক্লুজ।

সমাজ চিত্র : সামাজিক সমস্যা ও জন-উদ্যোগ

নিস্তরঙ্গ পল্লি-জীবনে কখনও কখনও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাও ঘটেছে। যেমন ১৯৩০-এর দশকে চাঞ্চল্যকর 'কলা ভাজার' মানহানি মামলা। আবার মধ্য পাড়াতে ২২.০৯.১৯৭৭ তারিখে ভয়াবহ ডাকাতি। এই ডাকাতির পরে গ্রামে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং বহু বছর তা সক্রিয় ছিল।

পল্লির একটি রাস্তা নিয়ে ১৯৭০-এর দশকে থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারি যথেষ্ট হয়েছে।

শান্ত গ্রাম আলোড়িত হয়েছে কখনও বধূ নির্যাতনের প্রতিবাদে আবার কখনও ভাগচাষি খুনের প্রতিবাদে।

সত্তরের দশকে খেতমজুরেরা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন মজুরি বাড়ানোর দাবিতে এবং তা এই অঞ্চলে ব্যাপক সারা ফেলেছিল।

১৯৬০-এর দশকে নীলমণি রায় পুরনো ইট-সুরকি ফেলে পাড়ার রাস্তার সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। নদীয়া জাগৃহি সংঘও রাস্তার সংস্কারের কাজ করেছিল।

নদিয়া জাগৃহি সংঘ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের উদ্যোগ নেয় এবং সংঘের পক্ষে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৯ সালে গ্রামে বিদ্যুৎ আসে।

সমগ্র গ্রামের অগ্রণী মানুষেরা ১৯৮০-এর দশকে উদ্যোগী হয়ে পশ্চিম নদিয়া থেকে বিবিপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন অনিল কুমার দাশ মহাশয়। সহযোগিতা করেছিলেন বিবিপুর গ্রামের অনেক মানুষ ও C.C.D. সংস্থা।

একইভাবে অতীতে গণ -উদ্যোগে মাঠের জমিতে নদিয়া-পানিগোবরা পথ তৈরি হয়েছিল।

জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে নদীয়া জাগৃহি সংঘ ২৪ আগস্ট ১৯৮৬ তারিখে এক কনভেনশন আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল ১. ধান্যকুড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নীতকরণ, ২. মেটিয়া থেকে মালতিপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত পথের ব্যবস্থা, ৩. বাদুড়িয়া থেকে টাকি রোড হয়ে হাড়োয়া পর্যন্ত বাসরুট চালু করা। এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন গ্রামের বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। সংস্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে উপযুক্ত প্রশাসনিক স্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

ধর্ম ও লোকাচার

সুন্দরবনের দেবতা দক্ষিণ রায় এ অঞ্চলে পূজিত হতেন এককালে। হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়-ভিত্তিক ধর্মাচরণের সঙ্গে প্রাগার্য লোকাচারের রেশ রয়েছে।

গ্রামের মধ্যস্থানে বারোয়ারিতলা। রায় পরিবারের একাংশ (রঘুরাম রায়) তাঁদের হায়দরপুরের পূর্ব-বসতির অনুকরণে বারোয়ারিতলায় উঁচু মাটির বেদিতে রক্ষাকালী পুজো শুরু করেন। প্রতি বছরে চৈত্র মাসের এক শনিবারে নতুন চালা ঘর বানিয়ে পুজো হত। ভট্টাচার্য পরিবারের সৌজন্যে ১৯৩০-এর দশকে (১৯৩৩?) পাকা মন্দির হয়। ১৯৮০-এর দশকে মন্দির কমিটি গঠিত হয়।

নদিয়া গ্রামের একটি বিশেষ লোকাচার হল 'পথে-জল-ঢালা'। মধ্য পাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমীর দিনে 'পথে-জল-ঢালা' হয়। রক্ষাকালী দেবীর আবাহন হয় পথে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও পথে জল ঢেলে। আঙ্গিকের মধ্যে আছে পাঁচালি - যা এক প্রবীণার সহযোগে আগত মহিলারা সমবেতভাবে গান করেন - রক্ষাকালী, শিবদুর্গা, কার্তিক-গণেশ-লক্ষী-সরস্বতী, ওলাই চন্ডী, শ্মশানকালী, পঞ্চদেবতা, বড়ঠাকুর, বসন্তরায়, শীতলা, পবনদেব, মনসা, দুর্গা, পেঁচো-পাঁচি, বনবিবি ও সর্বদেবতার উদ্দেশ্যে। বসন্তরায় ও শীতলা পল্লিদেবতা। ভক্তদের প্রার্থনা - পল্লিবাসীরা কলেরা মহামারি ও সর্ব-অমঙ্গলের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকবেন।

কালীমন্দিরে দেবীর বেদি আছে, স্থায়ী প্রতিমা নেই। রক্ষাকালী পূজা হয় চৈত্র মাসের এক শনিবারে। পুজোয় অনেক ছাগ বলি হয়। মৃৎপ্রতিমার পূজার পরে শেষ প্রহরে বিসর্জন হয়। স্বগ্রাম-পার্শ্ববর্তী-গ্রামের ভক্তজন জাগ্রতাজ্ঞানে মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসীরাও আসেন অন্তরের টানে। বলি বন্ধের জন্য কয়েকবার আলোচনা-প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন চালু প্রথা বন্ধের বিষয়ে আলোচনায় কখনই ঐকমত্য হয়নি।

সারা জীবন এই মন্দিরের সেবায় নিরত থাকতেন ললনা দেবী।
মন্দিরের পশ্চিম প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছে ১৯৯০-এর দশকে।

কালী মন্দিরের কিছু দূরে পল্লির প্রান্তে ষষ্ঠীতলায় প্রাচীন বট গাছের তলায় এককালের দোলমঞ্চ এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন। অতীতে এখানে দোল উৎসব ও চড়কের মেলা হত।

পাশের মাঠের ধারে একসময়ে দেখা মিলত দণ্ডায়মান, ক্ষয়প্রাপ্ত 'বৃষকাষ্ঠ'।
গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে আছে প্রকাণ্ড বট গাছের নীচে পঞ্চাননতলা। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যাত্রাভিনয় হত।

মধ্য পাড়ার অপর প্রান্তেও চৈত্র মাসে মঙ্গলবারে রক্ষাকালী পূজা হয় । তার পাশে আছে দক্ষিণরায় ও শীতলা মন্দির । সুরেন্দ্রনাথ হাজরার সৌজন্যে নতুন মন্দির নির্মাণ হয়েছে ।

নদিয়া মৌজার পূর্ব প্রান্তে হাজরাতলায় আছে হাজরা বাবার (পঞ্চানন) মন্দির ও অন্যান্য মন্দির ।

অনেক বাড়িতে বাস্তু পুজো হত , এখনও কিছু হয় ।

অনেক ব্রাহ্মণ পরিবারে দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায় অলক্ষীর ও লক্ষীর পুজো হয় ।

হরি সংকীর্তনের দল ছিল কয়েকটি । অনিল কুমার দাশের উদ্যোগে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম নদীয়া হরিসভা অনেক বৎসর চালু ছিল ।

মধ্য পাড়ায় কালী মন্দিরের সন্নিকটে 'নদীয়া শ্রী শ্রী হরিনাম সেবা সমিতি ' ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

গ্রামের পশ্চিমে শেষ প্রান্তে ছিল 'গাম্ভীরতলা' । সেখানে বাবা ঠাকুর পঞ্চাননের থান ছিল । গোকনা গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েরা সকালে এসে কোড়াপুকুর থেকে জল নিয়ে জল ঢালতেন কিছুদিন আগেও । অনেকে মানত করতেন এখানে ।

লুপ্ত হয়েছে পশ্চিম নদিয়ার 'বনভোজনতলা', বন্ধ হয়েছে বনবিবির পুজো ও বাস্তুতলায় ওলাই চন্ডী পুজো ।

তারাপদ রায় (ফ্যালা রায়) দুর্গা পুজো করতেন বেশ ঘটা করে । পাড়ার সকলেই আমন্ত্রিত হতেন ও অংশ গ্রহণ করতেন । ১৯৩০-এর দশকে চাঞ্চল্যকর 'কলাভাজার' মানহানি মামলার কয়েক বছর পরে তাঁদের দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে যায় ।

সতীশ রায় ১৯৪০-এর দশকে উদ্যোগ নিয়ে পাড়ায় বারোয়ারি পূজা শুরু করেন । ভট্টাচার্য পরিবারের আগ্রহে উক্ত পরিবারের বাড়ির সন্নিকটে পূজা স্থানান্তরিত হয় এবং পরে ভট্টাচার্য পরিবারের ঠাকুর দালানে পূজা হতে থাকে।

ইতিমধ্যে যুবকরা পাড়ার মধ্যস্থলে দুর্গা পূজা শুরু করেন যা এখনও নদীয়া জাগৃহি সংঘ পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গা পূজা হিসেবে পরিচিত । এইভাবে নদিয়া গ্রামের প্রাচীনতম সর্বজনীন দুর্গোৎসবটি নদীয়া জাগৃহি সংঘ ১৯৬২ সাল থেকে নিজেরা পরিচালনা করে চলেছে।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের দুর্গা পূজার কিছু বিশিষ্টতা আছে। কাঠামো পূজা জন্মাষ্টমীতে। নিত্য নতুন পদে পঞ্চব্যঞ্জনে অন্নভোগ হয়।

পঞ্জিকাবিহিত দশমী পূজার দিন সন্ধ্যায় বরণের পর কালীমন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমা করা হয় তারপর ভেলায় প্রতিমা বিসর্জন পর্ব সমাধা হয় । পূজায় বাহ্যিক আড়ম্বরের পরিবর্তে শাস্ত্রাচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় । শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় । ১৯৬৯ সাল থেকে দুর্গোৎসবে বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হয়েছে ।

অতীতে রায় পরিবারসমূহের অনেক বাড়িতে বাৎসরিক কালী পূজা হত । এখনও কিছু পরিবারে তা বজায় আছে । পরে বিভিন্ন সংঘ সর্বজনীন কালী পূজা শুরু করে ।

গ্রামের দ্বিতীয় সর্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু করে নদীয়া মিতালি সংঘ । নদীয়া বেকার (কল্যাণ) সমিতি প্রথম থেকেই দুর্গা পূজা করছে । নদীয়া তরুণ সংঘ দুর্গা পূজা করে চলেছে কয়েক বৎসর যাবৎ ।

বিপ্রনাথরায়ের (বোকা রায়ের পিতামহ) বাড়ি দেল-দোল উৎসব হত । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতামহ কয়েক বছর পারিবারিক দুর্গা পূজা করেছিলেন । শান্তনু রায় ও রাজীব রায় তাঁদের পারিবারিক পূজা করছেন ২০১০ সাল থেকে ।

নীলমণি রায় ১৯৭০-এর দশকে কয়েক বছর অন্নপূর্ণা পূজা করেছিলেন ।

পালপাড়াতে ১৯৯০-এর দশকে কয়েক বছর অন্নপূর্ণা পূজা হয়েছিল ।

গ্রামের মধ্য পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় মসজিদ আছে । ইসলামি পরবগুলির সময় আনন্দ-মুখরিত হয় মসজিদ-প্রাঙ্গণ । নিত্য অনুরণিত হয় আজানের ধ্বনি । বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা । মানিক পিরের দরগা আছে মধ্য পাড়ায় ।

অতীতে যে কালে হজ-যাত্রা কষ্টসাধ্য ছিল, সেই সময়ে পবিত্র হজে গিয়েছিলেন গ্রামের মোঃ হাজী বাহারদ্দিন ।

শিক্ষা ও জীবিকা

গণেশ পাঠশালা

শিক্ষাচর্চা নদিয়া গ্রামে সব সময়েই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এই গ্রামের অনেক কৃতী সন্তান কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

নদিয়া গ্রামে অতীতে ছিল পণ্ডিত পীতাম্বর সরকারের পাঠশালা। ধান্যকুড়িয়ার দানবীর জমিদার শ্যামাচরণ বল্লভের জীবনীকার লিখেছেন শ্যামাচরণ বাল্যে পীতাম্বর সরকারের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছিলেন।[১]

সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য ১৮৭৭ সালে স্থায়ী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মণ্ডল পরিবারের গণেশ মণ্ডল। আগে খড়ের চালা ছিল। পরে হয় পাকা বাড়ি। এই গণেশ পাঠশালার আদর্শ পণ্ডিত তথা শিক্ষকদের সুনামের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিশুরাও এখানে পড়তে আসত। বর্তমানে গণেশ পাঠশালা নদিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

অতীতে এই পাঠশালার কালীপদ পণ্ডিতের খুব নাম ছিল। পাঠশালা পর্বের শেষের দিকে পণ্ডিত ও শিক্ষক ছিলেন নলিনী রায়, রাখাল ভট্টাচার্য, সতীশ রায় ও বিনয় মণ্ডল। এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অসংখ্য ব্যক্তি। পরিতাপের বিষয়, সেই যুগে অশিক্ষার অনামিশার মাঝে আলোক বর্তিকা বহন করেছিলেন যে মহাপ্রাণ গণেশ মণ্ডল, আজ তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন রাখেনি পরবর্তী প্রজন্ম।

পাঠশালায় অতীতে প্রথমে শুরু হত তালপাতা, মধ্যে কলাপাতা, শেষে কাগজ। প্রথমে পাততাড়ি শ্রেণি। পরে প্রথম শ্রেণিতে। চাটাই-এর আসন, তালপাতা, কঞ্চির কলম আর কালির দোয়াত নিয়ে পাঠশালায় যেত ছাত্রেরা। পরে এল স্লেট, খাতা।

পড়ার ফাঁকে ছাত্রেরা শ্লেটে চিকে-শূণ্য খেলা করত।

ছাত্রদের শাস্তি ছিল হাতের তালুতে ও পিঠে বেত্রাঘাত, মাথায় গাঁট্টা, পেটের চামড়ায় মোচড় (মধু চিমটি), দেয়ালে পিঠ দিয়ে চেয়ারের মত বসা, এক পায়ে কান ধরে দাঁড়ানো, ডান হাতের তালুতে একখানি ইট নিয়ে নাড়ুগোপাল হয়ে বসা, জলে ভেজানো বিছুটি দিয়ে খালি গায়ের ওপর আঘাত ইত্যাদি। শাস্তির কাজে সাহায্য করত 'পোড়ো' বা 'সরদার পড়ুয়া'।

১. দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ : সন্ন্যাসীচরণ চন্দ্র

স্কুলে ইনস্পেকটর আসতেন ।ইনস্পেকটরের ভয়ে শিক্ষক -ছাত্রেরা তটস্থ থাকতেন । সরকারি ডাক্তার প্রতি বছর স্কুলে এসে ছাত্রদের টিকা দিতেন। ছাত্রদের সরকারি গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হত ।

দারোগা হরিমোহন দাশ নিজের বাড়িতে কিছু দিনের জন্য পাঠশালা বসিয়ে ছিলেন ।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

নদীয়া জাগৃহি সংঘের কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ১৯৭৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে তা চলেছিল ।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

নদিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (S.S.K.) আছে পশ্চিম নদিয়াতে ।

নদিয়ার নাগরিক সমাবেশ - ১৯৩৭±
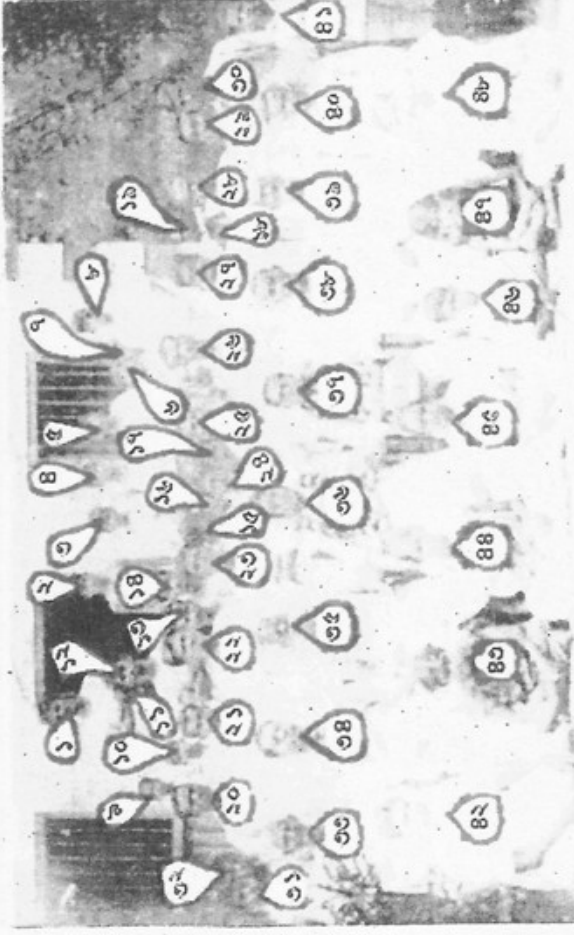
১. কানাই রায় ২. ?? ৩. মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় ৪. পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ৫. নীরদ চট্টোপাধ্যায় ৬. দুলাল ঘোষ ৭. বড়সাহেব ৮. ভবানী মুখোপাধ্যায় ৯. সুবিমল রায় ১০. সুবিকাশ রায় ১১. ?? ১২. সনৎ রায় ১৩. বিকাশ বিশ্বাস ১৪. অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য ১৫. সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬. প্রবোধ রায় ১৭. ?? ১৮. ?? ১৯. ?? ২০. ভোলানাথ রায় ২১. প্রসাদকালী রায় ২২. ভবানীপ্রসাদ রায় ২৩. শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪. দেবেন্দ্র ঘোষ ২৫. দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬. সুধীর মুখোপাধ্যায় ২৭. ভুপেন রায় ২৮. কিশোরী মুখোপাধ্যায় ২৯. কালিদাস রায় ৩০. মণিমোহন রায় ৩১. হিমাংশু রায় ৩২. জগদ্দুর্লভ হালদার ৩৩. প্রমথ রায় ৩৪. ফনী বল্লভ, ধান্যকুড়িয়া ৩৫. সতীশ রায় ৩৬. > ৩৭-এর পত্নী ৩৭. নাসিরুদ্দিন সাহেব, S.D.O. বসিরহাট ৩৮. তারাপদ রায় ৩৯. হরি রায় (প্রণব রায়-এর পিতামহ) ৪০. ননী চট্টোপাধ্যায় ৪১. দ্বিজেন্দ্র রায় ৪২. যতীন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৩. কল্যাণী (২৫-এর কন্যা) ৪৪. শিনু রায় (৩৩-এর কন্যা) ৪৫. ?? ৪৬. ?? ৪৭. বাসন্তী (২৫-এর কন্যা) ৪৮. প্রফুল্ল ভট্টাচার্য

শিক্ষা ও জীবিকা : উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সমাহার

নদিয়া গ্রামের জনজীবনে ১৮০০ শতকের শেষ থেকে বহু শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মানুষের সমাবেশ ঘটে। তাঁদের অনেকেই শহরে চাকরি করতেন এবং সাপ্তাহিক ছুটিতে গ্রামে থাকতেন। কেউ কেউ ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত বা শিক্ষক । আর অনেকে ছিলেন ধনী, জোতদার বা ব্যবসায়ী। ইংরেজ রাজত্বে প্রতাপশালী দাগোগা ছিলেন হরিমোহন দাশ। সমাজেও তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল।

গ্রামের প্রথম স্নাতক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ রায় ও দ্বিতীয় স্নাতক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল । ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ রায় এ অঞ্চলের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী ও বৈদান্তিক।

শচীন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর রায় (মধ্যমগ্রাম নিবাসী) ডঃ রমা চৌধুরি পরিচালিত 'প্রাচ্যবাণী' সংস্কৃত নাট্যদলের অভিনেতা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করেছেন।

শচীন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্কর রায় (দত্তপুকুর নিবাসী) 'উত্তরণ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজ ও অন্যান্য সংস্কৃতিচর্চায় রত।

পণ্ডিত মশায় ছিলেন নলিনী রায়, রাখাল ভট্টাচার্য, হরিদাস রায়।

সত্যচরণ রায় ও বিপ্রনাথ রায় ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ।

ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় কয়েক দশক ধরে নদিয়া গ্রামের সকল সামাজিক কাজে অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। ডাক্তার হিসেবে তিনি আশেপাশের সব গ্রামের মানুষের সম্মান ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

ইমপিরিয়াল ব্যাংকে (বর্তমানে স্টেট ব্যাংক) উচ্চপদে কাজ করতেন পঞ্চানন পাল । 'বিলেত- ফেরত' রমাকান্ত রায় (I.O.B., London) ব্যাংকের উচ্চপদের অফিসার ছিলেন।

গ্রামের (পশ্চিম নদিয়া) কৃতী সন্তান ডাঃ রিয়াজুদ্দিন আহমেদ (MBBS, D Ch London) পরে লন্ডন-প্রবাসী হয়েছিলেন।

ডাক্তার হয়েছিলেন ডাঃ পার্থ কুমার ভট্টাচার্য , ডাঃ সুভাষ রায় । ডাঃ পার্থ কুমার ভট্টাচার্য The Bengal Obstetric & Gynaecological Society-এর Vice-President ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন পঙ্কজ কুমার ভট্টাচার্য, সুনির্মল রায়।

রেলকর্মী ছিলেন জিতেন রায়, ধীরেন রায়, রাসবিহারী রায়, চুনীলাল রায়, মোঃ মোসলেম মণ্ডল (বাংলাদেশ-প্রবাসী), তারাপদ হাজরা, গোপাল ভট্টাচার্য, উৎপল রায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ছিলেন কালিদাস রায়, সরোজ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, অবনীকান্ত পাল, প্রবোধ হাজরা, ভাস্কর রায়, পবিত্র রায়, অজিত রায়, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য, সমীর (রতন) রায়, ড. শিবাজী রায়, মোঃ আবদুল হামিদ, সলিল রায়, চিত্ত নায়েক, মদনমোহন সরদার, জয়দেব খাঁড়া, প্রশান্ত খাঁড়া, মোঃ আবদুল লতিফ, মোঃ আবদুর রসিদ।

সাহেব কোম্পানির ও দেশী সওদাগরি অফিসের কর্মী ছিলেন প্রমথনাথ রায় (বোম্বাইতে), ক্ষেত্রপদ রায়, গণেশ রায়, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাকান্ত রায়, উমাকান্ত রায়, তারাদাস রায়, গোবিনলাল মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবিমল রায় (জার্মান প্রবাসী), সুনির্ম্মল রায়, বিধান রায়, বিমল রায়, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল রায়, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, সূর্যকান্ত পাল, রবীন পাল, নিখিল পাল, সুশান্ত মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শুভাশীষ রায়, তাপস রায়, অনুপ রায়, সমীর রায়, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম রায়, সমর রায়, সুজিত রায়।

শিক্ষকতা করতেন হরিনাথ রায়, শচীন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভোলানাথ রায়, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশ রায়, বিনয় মণ্ডল, মোঃ আসরাফ আলি মণ্ডল, ধনঞ্জয় দাশ, নন্দদুলাল পাল, সুভাষ মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডল, সন্তোষ দাশ, গোকুলচন্দ্র পাল, জগবন্ধু রায়, দুলালকৃষ্ণ ঘোষ, সুবিকাশ রায়, রামদুলাল দাশ, তারাপদ মণ্ডল, নির্ম্মল কুমার দাশ, গণেশ বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজকুমার রায়, আবদুল গফফার, দীনবন্ধু দাশ, তীর্থঙ্কর রায়, চিত্তরঞ্জন হাজরা, সুপ্রকাশ রায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুকৃতিরঞ্জন মণ্ডল, বাসুদেব মণ্ডল, অমল দাশ, সুবীর রায়, জহরলাল মণ্ডল, শ্রীমতী কমলা মণ্ডল, সুজিত মণ্ডল, নির্ম্মল ভট্টাচার্য, মদনমোহন ঘোষ, প্রশান্ত হাজরা, দেবীপ্রসাদ রায়, গোপীবল্লভ রায়, মোঃ আবদুর রসিদ, মদন দাশ, নিতাই নায়েক, চন্দন মণ্ডল, মোঃ আবদুল হামিদ, মোঃ আক্তারুল হক, প্রভাত সেন, শ্যামসুন্দর ঘোষ ও আরও অনেকে।

বিমাকর্মী প্রণব রায় , যাদব সরকার।

ব্যাংককর্মী গোবিনলাল মুখোপাধ্যায়, রমাকান্ত রায়, রাধাকান্ত রায়, সুবিনয় রায়, রতন রায়, শ্রীনাথ রায়, সুকমল রায়, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, তপন রায়, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সরকার, সমীর(বাচ্চু)রায়, শশাঙ্ক রায়, দুলাল দাশ, মনোজ কাহার ।

কলকাতার বি. বা. দী. বাগ অঞ্চলে সওদাগরি কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন সমর মুখোপাধ্যায় ও ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন সুবিনয় রায়।

আইনজীবী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমল দাশ, মোঃ নজরুল ইসলাম।

কলকাতায় ব্যাবসা চালাতেন ভূষণ রায়, কৃষ্ণধন রায়। কনট্রাক্টরি করতেন দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। কলকাতার চেতলাতে প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের 'নদীয়া টিম্বার কোং' নামে কাঠের আড়ত ছিল।

সরকারি দপ্তরে নাজির ছিলেন যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নায়েবি করেছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বাজির ব্যবসায়ী ছিলেন বিজয় দাশ। তামাক খাওয়ার 'হুঁকো'-র বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন শ্যামাচরণ দাশ।

রাজ্য সরকারের কর্মী বনমালী চট্টোপাধ্যায়, অবনীকান্ত রায়, যতীনদ্রনাথ রায়, অনিল দাশ, সুশীল রায়, জগবন্ধু রায়, শ্রীকান্ত রায়, শিবপ্রসাদ রায়, রবীন চক্রবর্তী, মধুসূদন রায়, চন্দ্রকান্ত পাল, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন পাল (২), শ্রীমতী উষারানি পাল, হরেন্দ্র মণ্ডল, নিতাই দাশ, গোবিন্দ দাশ, মোঃ সুরত আলি, বিভাষ চট্টোপাধ্যায়, নীরজ চট্টোপাধ্যায়, অসিত রায়, বিশ্বনাথ রায়, লক্ষীকান্ত সরদার, তপন খাঁড়া, মোঃ আবদুল জলিল আহমেদ, শ্রীকুমার দাশ, শ্রীমতী রূপা দাশ, শ্যামল দাশ, বাবুলাল সরকার, মোঃ কাছেদ আলি, নরেশ সরকার, হরিদাস দাশ, পরেশ দাশ, রমেশ দাশ, জয়দেব মণ্ডল, সুনীল কাহার, শংকরলাল সরকার, অঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল, মোঃ আনোয়ার আলি, দিলীপ সরকার, মোঃ আইজেল, রূপেন মণ্ডল।

শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ 'প্রণতি' নামে গীতিকাব্য প্রকাশ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত কবিতার বই 'মানবী'। সুকৃতিরঞ্জন মণ্ডলের প্রকাশিত কবিতার বই 'ইচ্ছে ডানা'। প্রয়াত উজ্জ্বল দাশের লেখা বই - 'রবীন্দ্র নাট্যরূপগুচ্ছ' (রবিবার, শেষের কবিতা, সৌদামণি, ল্যাবরটরি, দুই বিঘা জমি, ত্রিকোণ) ও 'প্রশ্নোত্তরে নন্দনতত্ত্ব'।

শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন।

রুদ্রপ্রসাদ রায়কে মেধা কৃতিত্বের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার ১৯৮১ সালে পুরস্কৃত করে।

বিভাষ চট্টোপাধ্যায় ও সুবীর রায় কলকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেছেন। বিভাষ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার নির্দেশনার কাজে যুক্ত আছেন ও বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করে চলেছেন।

টিভি সিরিয়াল-খ্যাত শ্রীপর্ণা রায় এই গ্রামের রায় পরিবারের মেয়ে। পিংকি দাশ টিভিতে অভিনয় করছেন।

গ্রামের পরবর্তী প্রজন্মের কৃতী সন্তান প্রশান্ত হাজরা, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা রায়, মিনতি ঘটক, ব্রতীত দাশ, লীলা চট্টোপাধ্যায়, বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ রায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, শিবাজী রায় (ইঞ্জিনিয়ার), কল্লোল রায়, বরুণ পাল, মোঃ আক্তাউর হক, সঙ্গীতা দাশ, ড. মৃণাল মণ্ডল, পিয়ালী মণ্ডল, মৃন্ময় মণ্ডল, ড. উজ্জ্বল দাশ, মোঃ সাজাহান মণ্ডল, সুতপা দাশ, সান্ত্বনা রায়, সুমনা চট্টোপাধ্যায়, সোনিয়া ইসলাম, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অরণি চট্টোপাধ্যায়, অরুণিম চট্টোপাধ্যায়. সুকুমার দাশ প্রমুখ।

প্রতিভাবান তরুণ উজ্জ্বল দাশের (পিতা চিত্তরঞ্জন দাশ) অকাল প্রয়াণে নদীয়া গ্রাম এক উজ্জ্বল সন্তানকে হারিয়েছে। এই মেধাবী ডক্টরেট স্বল্পায়ু জীবনে রবীন্দ্রনাথের রচনাভিত্তিক অনেক নাটক ও নাট্য বিষয়ক বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লেখা বই - 'রবীন্দ্র নাট্যরূপগুচ্ছ' (রবিবার, শেষের কবিতা, সৌদামণি, ল্যাবরটরি, দুই বিঘা জমি, ত্রিকোণ) ও 'প্রশ্নোত্তরে নন্দনতত্ত্ব'। এ ছাড়াও অনেক সামাজিক সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

কলকাতার প্রথম মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার পাপিয়া গাঙ্গুলি (রায়) এই গ্রামের মেয়ে ছিলেন।

এই গ্রামেরই দুরন্ত ছেলে মনিরুল মোল্লা (বাপি রাজ) এখন বিখ্যাত যাদুকর ও গায়ক। দেশে দেশে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন ও গান করছেন সুনামের সাথে।

বাগবাজার, কলকাতা নিবাসী নদিয়া গ্রামের বাবলু মণ্ডল (খাঁড়া) (পিতা গোষ্ঠবিহারী) ১৯৭০-এর দশকে বাগবাজারে খুন হয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের হাতে। তাঁর স্মরণে বাগবাজারে 'বাবলু মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড' ফুটবল প্রতিযোগিতা চলেছিল দীর্ঘদিন। তাঁর পরিবারের সৌজন্যে ১৯৮৩ সালে নদীয়া জাগৃহি সংঘ জাগৃহি ময়দানে 'বাবলু মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড' খেলা পরিচালনা করেছিল।

সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনকে নিয়ে নদিয়ার গর্ব করার আছে - তিনি পশ্চিম নদিয়ার এক পরিবারের দৌহিত্র ছিলেন।

সামাজিক সংস্থা

নদীয়া হিতকরী সমিতি

নদীয়া গ্রামের প্রথম সামাজিক সংস্থা হল নদীয়া হিতকরী সমিতি । রাসবিহারী রায় ও গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ১৯১৮/১৯১৯ সালে এই সংস্থা স্থাপন করে নদীয়া গ্রামের ইতিহাসের নতুন যুগের সূচনা করেন । এর মাধ্যমে গ্রামে সংঘ-চেতনার বীজ রোপণ হল । আগের হরিসভা , বারোয়ারিতলা, বৈঠকখানার আড্ডা ছাড়াও তৈরি হল গ্রামবাসীদের নতুন মিলনস্থল।

রাসবিহারী রায় প্রতি রবিবার কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি এসে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষা ও কিছুক্ষেত্রে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করতেন নদীয়া হিতকরী সমিতির তহবিল সৃষ্টির জন্য । ঐ অর্থ থেকে দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা হত। দরিদ্র ব্যক্তির দাহ-সৎকারেও সাহায্য দেওয়া হত। পরে আর অর্থ সংগ্রহ ও তহবিল সৃষ্টি হয়নি। হিতকরি সমিতির অর্থে গ্রামে প্রথম টিউবওয়েল বসে৷

পরে নদীয়া হিতকরী সমিতি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড তৈরি হয় ১৯৭৫ সালে । ট্রাস্টির সদস্য ছিলেন সুবিকাশ রায়, শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, চুনিলাল রায়, গোবিনলাল মুখোপাধ্যায়। ট্রাস্টি ১৯৭৫-১৯৯৩ সময়কালে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি, পরীক্ষার ফি, বই কেনার জন্য সাহায্য, কলেজের ভর্তি ফি ও কন্যার বিবাহে অর্থ সাহায্য করে।

নদীয়া হিতকরী সমিতি কার্যত অবলুপ্ত হওয়ায় অবশিষ্ট তহবিল শিশু উদ্যানের উন্নতিকল্পে ২০০৭ সালে নদীয়া জাগৃহি সংঘকে দেওয়া হয়েছে।

তারাপদ রায়ের যাত্রা দল

ধনী ব্যবসায়ী তারাপদ রায় (ফ্যালা রায়) -এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত যাত্রাদল ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামবাসীদের সাংস্কৃতিক দাহিদা পূরণ করেছে। ১৯২০ ও ১৯৩০ -এর দশকে তিনি ধারাবাহিকভাবে যাত্রার ব্যবস্থাপনা করেছেন। এ জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন।

নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ

রাসবিহারী রায় ও অন্যান্য ব্যক্তিরা **১৯২০/১৯২১** সালে নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ স্থাপন করেন । এই সংস্থা **১৯৪০**-এর দশক পর্যন্ত বড় বড় নাটক মঞ্চস্থ করেছে । কলকাতার পেশাদারি মঞ্চের সমতুল্য খুব উচ্চমানের অভিনয় করতেন তাঁরা । এই সংস্থা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে নদীয়া জাগৃহি সংঘের প্রতিষ্ঠার ফলে।

নদীয়া কিশোর পাঠাগার

সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অন্যান্যরা **১৯৩৩** সালে নদীয়া কিশোর পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বেশ কয়েক বৎসর এই পাঠাগার চালু ছিল।

নদীয়া ব্রতচারী সংঘ

নদীয়া ব্রতচারী সংঘ **১৯৪০**-এর দশকে কয়েক বৎসর চালু ছিল। নদীয়া জাগৃহি সংঘের উদ্যোগে আবার **১৯৮৯** সালে ব্রতচারী দল চালু হয়েছিল। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

‘S. Ray & Brethren’

ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়ের পুত্রেরা ১৯৪৩ সালে ‘S. Ray & Brethren’ নামে একটি পারিবারিক নাট্য গ্রন্থাগার করেছিলেন।

নদীয়া ইউনাইটেড ক্লাব

ডাঃ মণিলাল মিত্রমুস্তাফি ও ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়ের সাহচর্যে **১৯৪৬** সালে গঠিত নদিয়া ইউনাইটেড ক্লাব পরবর্তী পর্যায়ে জাগৃহি সংঘের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। নবাগত ভিনদেশি তরুণ ‘মুস্তাফি ডাক্তার’ পল্লির শিশু-কিশোরদের স্নেহ-ভালবাসায় আকৃষ্ট করে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। মাসচটকদের বাগানে (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ির দক্ষিণে) নদিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের কুস্তির আখড়া ছিল। নদীয়া জাগৃহি সংঘ স্থাপনের পরে ইউনাইটেড ক্লাবের বিলুপ্তি ঘটে।

নদীয়া জাগৃহি সংঘ

বান্ধব নাট্য সমাজ ও ইউনাইটেড ক্লাবের ধারায় সিক্ত হয়ে নদীয়া জাগৃহি সংঘ পঞ্চাশের দশকে উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে থাকে। সংঘ ১৯৫১ সালে পাকাপোক্ত রূপ নিলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন কিশোর ১৯৪৯ সালেই, মতান্তরে ১৯৪৮ সালে, 'জাগৃহি সংঘ' নাম নিয়ে খেলাধূলা শুরু করেছিলেন। ১৯৫০/১৯৫১ সাল থেকে কয়েকটি নাটকও তাঁরা এই পর্বে অনুষ্ঠিত করেছিলেন।

'জাগৃহি সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে ১৯৪৯[১] সালকে 'নদিয়া জাগৃহি সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠার বৎসর বিবেচনা করা যুক্তিসংগত।

নদিয়া গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ১০ অক্টোবর ১৯৬০ তারিখে মুখার্জি বাড়িতে এক সভায় মিলিত হয়ে 'নদীয়া জাগৃহি সংঘ'-এর বিধিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭ নভেম্বর ১৯৬০ তারিখের সভায় সুবিনয় রায় কর্তৃক প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং তা বিধিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।

নদিয়া গ্রামের জনজীবনে নদীয়া জাগৃহি সংঘ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছে । প্রতিষ্ঠার পরেই নদীয়া জাগৃহি সংঘ গ্রামে বিদ্যুৎ-সংযোগের ও একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নদীয়া জাগৃহি সংঘ অতীতে কার্যত গ্রামের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে বলা যায়।

নদিয়া গ্রাম তথা নদীয়া জাগৃহি সংঘ কয়েক প্রজন্মব্যাপী নাট্যচর্চার বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী। খেলাধুলাতেও এই গ্রামের নাম সুবিদিত।

সংঘের দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রমাকান্ত রায়ের প্রচেষ্টায় দুস্থদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বস্ত্র বিতরণ করা হত। এই কাজে পরে কয়েক বছর সহায়তা করেছিলেন সংঘের শুভাকাঙ্ক্ষী দেবেশ দাশ। রমাকান্ত রায়ের উদ্যোগে নর-নারায়ণ সেবার কর্মসূচী শুরু করা হয়েছিল যা পরবর্তীকালে সুবিকাশ রায় ও অন্যান্যরা চালু রেখেছিলেন।

সংঘের ১৯৬৩ সালে নির্মিত পুরনো বাড়ি ১৯৮৭ সালে নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারকে দান করা হয়েছে। সংঘের বর্তমান বাড়ি প্রথমত তিন দিক ঘেরা 'জাগৃহি মঞ্চ' নামে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে এবং তা সংঘ-কক্ষে রূপান্তরিত হয় ২০০১ সালে। পরে সরকারি আর্থিক আনুকুল্য ও সংঘের নিজস্ব তহবিলের অর্থে নতুন প্রশস্ত মুক্তমঞ্চ নির্মিত হয়েছে । নবনির্মিত জাগৃহি মঞ্চের শুভ উদ্বোধন হয় ১১ মার্চ ২০১৬ তারিখে।

১. জাগৃহি বার্ষিকী ১৯৬১, রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ১৯৮৫, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা ২০০১

জাগৃহি মিউচুয়াল বেনিফিট ক্লাব

নদীয়া জাগৃহি সংঘের কতিপয় সদস্যের উদ্যোগে **২২** ফেব্রুয়ারি **১৯৮১** তারিখে জাগৃহি মিউচুয়াল বেনিফিট ক্লাব গঠিত হয়। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের এই প্রতিষ্ঠান নিজ পরিসরে সদস্যদের সেবা করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান বাংলায় হিসাব-পত্র রেখে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

নদীয়া যুবক সঙ্ঘ

পশ্চিম নদিয়াতে 'নদীয়া যুবক সঙ্ঘ' **১৯৬০**-এর দশকে কয়েক বছর রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নাট্যাভিনয় করেছিল। অভিনয় করতেন চিত্তরঞ্জন দাশ, অনাথ দাশ, চিত্তরঞ্জন হাজরা, অমল দাশ, তপন দাশ, নির্মল ভট্টাচার্য, অর্জুন দাশ, রামপ্রসাদ দাশ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, তুলসী দাশ, জগদীশ দাশ, মাণিক গাঙ্গুলি, শ্যামল দাশ, সুবেন্দু কাপাসি, নিমাই দাশ, বিশ্বনাথ কাহার, বলাই পাল ও অন্যান্যরা।

নদীয়া মিতালি সংঘ

নদীয়া মিতালি সংঘ **১৯৬৬** সালে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের দ্বিতীয় সর্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু করে নদীয়া মিতালি সংঘ। এ ছাড়াও নদীয়া মিতালি সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কালী পূজা ও খেলাধূলা হয়ে থাকে।

নদীয়া বেকার (কল্যাণ) সমিতি

নদীয়া বেকার (কল্যাণ) সমিতি প্রথম থেকেই দুর্গাপূজা করছে। তা ছাড়াও নদীয়া বেকার (কল্যাণ) সমিতি কালী পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করে থাকে।

নদীয়া আজাদ সংঘ

নদীয়া আজাদ সংঘ **১৯৭০** সালে প্রতিষ্ঠিত। নদীয়া আজাদ সংঘ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করে থাকে।

বি. বা. দী. সংঘ

বি. বা. দী. সংঘের প্রতিষ্ঠা ১৯৮০ সালে। বি. বা. দী. সংঘ আড়ম্বরের সঙ্গে কালী পূজা করে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে।

নদিয়া যোগশ্রী সংঘ

নদিয়া যোগশ্রী সংঘ (স্থাপিত - ১৯৯০) একক উদ্যোগে ও নদিয়া জাগৃহি সংঘের সহযোগে অনেক অনুষ্ঠান করে চলেছে। ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায় স্মৃতি শিশু উদ্যানে নদিয়া যোগশ্রী সংঘ ২০০৩ সালে ব্রতচারী শুরু করেছিল।

নদীয়া তরুণ সংঘ

নদীয়া তরুণ সংঘের প্রতিষ্ঠা ২০০১ সালে। নদীয়া তরুণ সংঘ দুর্গাপূজা করে চলেছে ২০০৮ সাল থেকে।

Institute of Popular Science

নদিয়ার কতিপয় বিদ্যানুরাগী যুবক ১৯৮০-এর দশকে অলোক মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে Institute of Popular Science নামে ছাত্র-চাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষাশিবির চালিয়েছিলেন নদীয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার

নদীয়া জাগৃহি সংঘের রেজিস্ট্রি-পরবর্তী ১৬ অক্টোবর ১৯৬১ তারিখের প্রথম বাৎসরিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় জানান যে সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা। সভাপতি ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়েরও এই ইচ্ছা ছিল।

১৯৬৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৬৮ সালে নদীয়া জাগৃহি সংঘের পাঠাগার বিভাগ খোলার চেষ্টা হয়েছিল। অবশেষে তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৭২ সালে। সংঘের পক্ষে অর্থ মঞ্জুর করা হয় ও গ্রামের বহু মানুষ পাঠাগারে বই দান করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। পরে ১৯৮৪ সালে সংঘের কয়েকজনের উদ্যোগে পাঠাগার আবার নতুন পর্যায়ে নিয়মিতভাবে চালু হয়।

সরকারি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে পাঠাগার বিভাগকে 'নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার' নামে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন করা হয় এবং নদীয়া জাগৃহি সংঘের তৎকালীন পরিচালন সমিতিকে নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারের পরিচালন সমিতি হিসাবে মনোনীত করা হয়। নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার স্বতন্ত্রভাবে পৃথকীকরণ হয় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে।

সরকারি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২৩ মে ১৯৮৭ তারিখে সরকারি আধিকারিকগণ, সরকারি কমিটির সদস্য ও বিধায়ক মাননীয় নারায়ণ মুখার্জি ও সদস্য অমিতাভ নন্দী পাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং পাঠাগারের অধিগ্রহণের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের প্রস্তাবমত ১৯৮৭ সালে নদীয়া জাগৃহি সংঘ নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারের পক্ষে সরকারের অনুকুলে গৃহ ও জমিসহ পাঠাগারের সম্পত্তি দলিল সম্পাদন করে দান করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠাগারকে সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে স্বীকৃতি দান করে ১৪ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারকে ১৯৮৭ সালেই আর্থিক অনুদান দেয়। তার সাথে নদীয়া জাগৃহি সংঘের আর্থিক অনুদান এবং শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র কুমার রায়ের প্রদত্ত ইমারতি দ্রব্য-সহযোগে পাঠাগারের ছোট ঘরটি ১৯৮৮ সালে নির্মিত হয়।

পাঠাগার ১৯৯৯ সালে লক্ষাধিক টাকার সরকারি অনুদান পায়। উক্ত টাকায় পুরনো বাড়ি প্রায় সবই ভেঙে ও টিনের চাল ফেলে নতুন ছাদসহ পাঠাগার গৃহ নির্মিত হয়।

সরকারি অনুদানের মাধ্যমে ২০১৮ সালে পাঠাগারের দ্বিতল নির্মিত হয়েছে।
নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার একক উদ্যোগে ও নদীয়া জাগৃহি সংঘের সহযোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে।
১৯৮৭ সালে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের ১৫০তম জন্ম দিবস পালন করে পাঠাগার। এই উপলক্ষ্যে বানান, শ্রুতিলিখন, অঙ্কন, প্রশ্নোত্তরে সাধারণ জ্ঞান, বিতর্ক, সাহিত্যজ্ঞান ও তাৎক্ষণিক অভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
সরকার কর্তৃক নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারের অধিগ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ তারিখে 'সাহিত্যের জেনে লিখুন' প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও 'সমাজের প্রগতিতে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে সুসজ্জিত বইয়ের ট্যাবলো ও রবীন্দ্র-আবৃত্তি-পথনাটিকা সহযোগে প্রভাতফেরির মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপিত হয়। ২০ আগস্ট ১৯৯৫ তারিখে নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার কর্তৃক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর স্মরণে সাহিত্য সভা ও শ্রুতি নাটক 'ছুটি নাকচ' অনুষ্ঠিত হয়।

নদীয়া বালকবৃন্দ

বামুন পাড়ার মধ্যস্থলরে নদীয়া বালকবৃন্দ ১৯৬৮ সাল থেকে সরস্বতী পুজো ও কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে আসছে। এদের সহযোগতিায় ১৯৭৮ সালে অভিনীত হয়েছিল 'স্মাগলার' নাটক ও 'মেজদিদি' শিশু নাটক | ২০০৭ সালে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে অনেক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালিত হয়।

নদীয়া প্রতিরোধ বাহিনী

নদীয়া প্রতিরোধ বাহিনী ১৯৭৭ সালে সংগঠিত হয়েছিল। গ্রামের সবগুলি পাড়া নিয়ে অনেক বছর ধরে এই বাহিনী সুসংবদ্ধ ছিল। বসিরহাট থানার প্রশংসাধন্য ছিল। পরে অনিয়মিত ও পাড়াভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং অবলুপ্ত হয়।

সাঁঝবাসর

নদিয়া গ্রামের এক কালের এক ঝাঁক দাপুটে কিশোর, বর্তমানে অধিকাংশই বৃদ্ধ ও প্রবাসী, ১৯৯০-এর দশকে বছরে একবার করে মিলিত হতেন 'সাঁঝবাসর'-এর মজলিসে। আড্ডা ও ভোজের আসর বসত পল্লির কোনও নির্জন উপান্তে। শেষ 'সাঁঝবাসর' বসেছিল ২০০৫ সালে।

নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

নদিয়া চ্যাটার্জি পাড়ায় কয়েকজন কিশোর ১৯৫৯ সালে নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ গঠন করে। সংঘের একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। দৈনিক বসুমতী সংবাদপত্র রাখা হত। এই সংঘের উদ্যোগে চ্যাটার্জি পরিবারের অধুনালুপ্ত খামারের মাঠে সরস্বতী পুজো ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। সংঘের প্রথম নাট্যাভিনয় ছিল 'ডাকঘর'। নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘের নামে ও 'বিনোদিনী অপেরা'-র নামে কয়েকটি যাত্রাভিনয় হয়। পরে সংঘের ছেলেরা নদীয়া জাগৃহি সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ও ১৯৬৮ সালে নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘের বিলুপ্তি ঘটে।

নদীয়া গ্রামীণ মেলা

নদীয়া জাগৃহি সংঘের সদস্যগণের উদ্যোগে ২০০৬ সালে তিনদিনব্যাপী নদীয়া গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বৎসরের পরে গ্রামীণ মেলা আর হয়নি।

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায় স্মৃতি শিশু উদ্যান

নদীয়া জাগৃহি সংঘ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়ের পরিবারের নিকট হতে ২০০০ সালে সংঘ-সংলগ্ন জমি কিনে সেখানে এই মহান পথিকৃতের নামাঙ্কিত শিশু উদ্যান করেছে। জমিদারি আমলে ধান্যকুড়িয়ার গাইন জমিদারদের মালিকাধীন এই জমিতে সেই সময়েই শিশু উদ্যান করার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু তখন তা ফলপ্রসূ হয়নি। পরে উক্ত জমি যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়ের মালিকাধীন হয়। তার প্রায় সাত দশক পরে ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়ের পরিবারের সৌজন্যে নদীয়া জাগৃহি সংঘ একাংশ জমি কিনে পূর্বসূরিদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছে।

নদিয়া সরকারি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

গ্রামে একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের সরকারি প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নদীয়া জাগৃহি সংঘ ২০১০ সালে প্রয়োজনীয় জমি সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের অনুকুলে দান দলিল সম্পাদন করে হস্তান্তর করে এবং এখন সেই জমিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নদীয়া জাগৃহি সংঘ ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তৎকালীন সংঘ-গৃহসহ জমি দান করেছিল এবং এখন সেই গৃহে নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার স্থাপিত আছে।

প্রীতি ক্লাব

১৯৪০ সালে নদিয়ার কিছু যুবক নদিয়া 'প্রীতি ক্লাব' নামে ফুটবল খেলায় অন্য গ্রাম থেকে একবার ট্রফি লাভ করেছিলেন - একথা জানা যায় রামদুলাল দাশ মহাশয়ের স্মৃতিচারণায়। তবে প্রীতি ক্লাব সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

খেলাধুলা

আগে গ্রামের বিভিন্ন মাঠে ফুটবল খেলা হত । তা ছাড়া গাদি , কবাটি ইত্যাদি অনেক দেশজ খেলার চলন ছিল । এক কালে ব্রতচারী, কুস্তি ও ভারোত্তোলনের আখড়ায় নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন পাড়ার যুবকেরা। তখন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। ছিল না ভাল বল বা অন্যান্য সরঞ্জাম। বাতাবি লেবুর বলেই চালাতে হত ফুটবলের অনুশীলন । এক সময় ৪´-১০´´ ফুটবল টুর্নামেন্ট খুব চলত।

সুবিকাশ রায় ও অন্যান্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়ের আনুকুল্যে নদীয়া জাগৃহি সংঘের খেলার মাঠ কেনা হয় **১৯৫৫** সালে । সরকারের আর্থিক সহায়তায় **১৯৭৩** সালে খেলার মাঠের টিউব-ওয়েল বসানো হয় । সুবিকাশ রায় মহাশয়ের সৌজন্যে ও সংঘের খরচে খেলার মাঠের শিবির নির্মাণ হয় জুন **১৯৯৫** । সরকারি আর্থিক সহায়তায় **২০১২** সালে খেলার মাঠের সংস্কার হয়।

১৯৪০ -এর দশকে কার্তিকপুর ও কুলীনগ্রাম মিলিটারি ক্যাম্প থেকে সাহেবরা এসে খেলেছেন নদীয়া জাগৃহি সংঘের ময়দানে (তখনকার 'দাতার বাগান'-এ)। তখনকার অনেক নামী ফুটবলার খেলেছেন জাগৃহি ময়দানে।

খেলাধুলার বিষয়ে নদীয়া জাগৃহি সংঘ প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিতে থাকে । **১৯৬১** সালে সংঘের খেলোয়াড়দের জন্য জার্সি কেনা হয়। সংঘের মাঠে টুর্নামেন্ট চালানো ও অন্য মাঠের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। সেই সময়ে বিভিন্ন মাঠে 'ন. জা. স.' সবুজ-মেরুন জার্সির আবেগময় উপস্থিতি ভোলার নয় । সংঘের সভ্যেরা খেলায় মহকুমার বিভিন্ন সংঘের মাঠের খেলায় সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ট্রফি জিতে এনেছেন বিভিন্ন মাঠ থেকে।

অতীতে অনেক বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট নদীয়া জাগৃহি সংঘের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাগৃহি ময়দানে এসেছেন শৈলেন মান্না, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য। এখানে খেলেছেন ভেঙ্কটেশ, সাত্তার, নারায়ণ সান্যাল, মনা ঘোষ, নীলেশ সরকার, উৎপল ভৌমিক, বিনু চ্যাটার্জি, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি এবং এসেছেন ফিফা রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি । এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করতেন পঙ্কজ (শ্যামসুন্দর) চ্যাটার্জি। বুট-বিহীন যুগের ফুটবলার ছিলেন শৈল চ্যাটার্জি, হৃদয় ভট্টাচার্য, রাখাল ভট্টাচার্য, কালীপ্রসাদ রায়, মণিমোহন রায়, হরি ব্যানার্জি (গোকনা), হাজারীলাল দাশ, সন্তোষ দাশ, হরেন দাশ, নিতাই পাল, গোবিনলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরবর্তীকালের ছিলেন সুবিকাশ রায়, রামদুলাল দাশ, প্রণব রায়, নির্ম্মল কুমার দাশ, পান্নালাল চ্যাটার্জি, কমলকৃষ্ণ ঘোষ, মনোরঞ্জন দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, দীনবন্ধু দাশ, অজিত রায়, প্রভাত চ্যাটার্জি, অমল দাশ, নিতাই ব্যানার্জি (গোকনা), পবিত্র রায়, দুর্লভ রায়, প্রদীপ (তুলসী) দাশ, তপন রায়, রণজিৎ দাশ (গোকনা), বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি (গোকনা), শেখ মুস্তাকিমার রহমান (নেহালপুর), শৈলেন মণ্ডল, মোঃ আজিজার রহমান, মানিক গাঙ্গুলি ও অন্যান্যরা।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের খেলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নিয়েছেন সুবিকাশ রায়, রামদুলাল দাশ, নির্ম্মল কুমার দাশ, প্রণব রায়, প্রভাত চ্যাটার্জি। মাঠের অনুশীলনের সময় শৃঙ্খলাবোধের বিষয়ে অতি সক্রিয় ছিলেন কমলকৃষ্ণ ঘোষ। পরবর্তীকালের খেলার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পর্বে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নিয়েছেন প্রশান্ত দাশ, অসীম রায়, অনুপ চ্যাটার্জি (ভালো মামা), অনিল মাইতি, নিমাই মণ্ডল, অখিল (হুঁকোদা) মণ্ডল, তাপস রায় (বেড়াচাঁপা), বিশ্বনাথ সরকার, তারক রায় ও অন্যান্যরা।

সংঘের মাঠে এখনও খেলাধূলা চলছে - যদিও আগের দিনের সেই ধারাবাহিকতা, উদ্দীপনা, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা নেই। সংঘের নিজস্ব জিম ছিল। ছিল সব ধরণের সরঞ্জাম। সংঘের ছেলেরা খেলার সাথে শরীরচর্চা চালাতো নিয়মিতভাবে। ১৯৮০-এর দশকের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। খেলার মাঠের Tent করা হয় ১৯৯৬ সালে।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৭১ সালে। সংঘের মাঠে ক্রিকেট ও ভলিবল খেলা হয়। ব্লক যুব উৎসবের বিভিন্ন খেলায় নদীয়া জাগৃহি সংঘের সভ্যেরা অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে সংঘ 'বাবলু মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড' খেলা পরিচালনা করে। ১৯৮৬ সালে ব্লক যুব উৎসবের দৌড় প্রতিযোগিতায় ১০টির মধ্যে ৬টিতে সংঘ পুরস্কার পায়। নদীয়া জাগৃহি সংঘ ২ অক্টোবর ১৯৮৮ গোকনা পুবালি সংঘ আয়োজিত একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বড় শিল্ড ও ৯টি জার্সি পায়।

১৯৯১ সালে মাটিয়াতে এক দিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়া জাগৃহি সংঘ বিজয়ী হয়ে একটি টেলিভিশন সেট লাভ করে। নদীয়া জাগৃহি সংঘ ১৯৯৫ সালে ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দুটি ট্রফি লাভ করে। ১৯৯৩ সালের শারদোৎসবের অষ্টমীতে যোগব্যায়াম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন শম্ভু পাল ও পবিত্র রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মনোহর আইচ।

শম্ভু পাল প্রায় একক প্রচেষ্টায় বেশ কয়েক বৎসর ধরে 'যোগশ্রী'-এর মাধ্যমে যোগব্যায়াম প্রদর্শনী করে চলেছেন। ১৩ মে ১৯৯৫ তারিখে 'চন্দ্রকান্ত পাল স্মৃতি যোগব্যায়াম অনুষ্ঠান' হয়। ১৫ আগস্ট ২০০৩ তারিখে স্বাধীনতা দিবসে যোগশ্রী ও মণিমেলার অনুষ্ঠান হয়।

১৯৯৬ সালে মাটিয়াতে এক দিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়া জাগৃহি সংঘ ট্রফি লাভ করে। ১৯৯৬ সালে আড়বেলিয়া নেতাজি সংঘের মাঠে এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জাগৃহি সংঘ বিজয়ী ট্রফি লাভ করে। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ আড়বেলিয়া আমরা ক'জন ক্লাবের এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জাগৃহি সংঘ বিজয়ী হয়।

১৯৯৮ সালে ও ২০০০ সালে নদীয়া জাগৃহি সংঘের মাঠে TATA TEA-এর সৌজন্যে এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়।

২৩ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে নদীয়া জাগৃহি সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বসিরহাট একাদশ বনাম কুমারটুলি প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে মাগুরখালিতে ফুটবল প্রতিযোগিতায় সংঘ ৫০০ টাকা সহ বিজয়ী ট্রফি লাভ করে। ২০০৩ সালে আট-দলীয় একদিনের অসীম মুখার্জী স্মৃতি ফুটবল ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। ২০১০ সালে খোলাপোতা পাল পাড়া মাঠে ফুটবল খেলায় নদীয়া জাগৃহি সংঘের বিজয়ী কাপ।

সংঘের মাঠে ১৯৯৯ সালে শীতকালীন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত শিবির হয়।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের উদ্যোগে 'অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠান হয় ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে। দু-দশক পরে আবার ১৯৯২ সালে অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আকস্মিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও তাণ্ডবের কারণে প্রতিযোগিতা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।

নদীয়া জাগৃহি সংঘের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে শম্ভু পালের পরিচালনায় সংঘের শিশু উদ্যানে ব্রতচারী দল চালু হয়েছিল। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

সংঘের ময়দানে স্লো-সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবিরাম সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতা হয়েছে কয়েকবার।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে নদীয়া জাগৃহি সংঘ ছাড়াও মিতালি সংঘ, বেকার (কল্যাণ) সমিতি, আজাদ সংঘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এই সংঘগুলি ধারাবাহিকভাবে ফুটবল, ক্রিকেট, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে।

নদিয়া গ্রামের নাট্যরঙ্গ ও সংস্কৃতিচর্চা

আগেকার গ্রামীণ জীবনে বিনোদনের আসর ছিল খুবই সীমিত। হরি-সংকীর্তন, নিমাই-সন্ন্যাস পালা, মনসা পালা, কৃষ্ণ যাত্রা, পুতুল নাচ, চড়ক ও দোল উপলক্ষ্যে মেলা, জাগরণ, কবি গান, তরজা গান, জারি গান, এ সব ছিল বিনোদনের অঙ্গ। ক্রমে শখের যাত্রা পার্টি, তারও পরে শখের থিয়েটার শুরু হয় গ্রামে। পরে শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্নিগ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা জলসা-বিচিত্রানুষ্ঠান।

নদিয়া নাটকের গ্রাম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেয়ে ধারাবাহিক নাট্য কর্মকাণ্ড চালানোর বিরল ঐতিহ্য বহন করছে নদিয়া গ্রাম ও বিশেষ করে নদীয়া জাগৃহি সংঘ এবং তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সসম্ভ্রমে স্বীকৃত।

নদিয়া গ্রামে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তারাপদ রায় (ফ্যালা রায়) -এর বড় ভূমিকা ছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে তিনি ধারাবাহিকভাবে যাত্রাগানের ব্যবস্থাপনা করেছেন। এ জন্যে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। দর্শক টানার জন্য বিনামূল্যে সিঙ্গারা ও জিলিপি বিতরণ করতেন৷ যাত্রার অনুষ্ঠান হত বারোয়ারিতলায় অর্থাৎ তখনকার উন্মুক্ত কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। তিনি ছিলেন অধিকারী ও মোশান মাস্টার। তাঁর আখড়ায় বাজনদারের দলে থাকতেন কৃষ্ণচন্দ্র ধাড়া, মোঃ দিদার বক্স মন্ডল, ঠাকুরদাস দাশ। প্রম্পটার মাখনলাল বিশ্বাস। হরিশপুরের মোশান মাস্টার শৈলবাবুও থাকতেন।

তাঁর দলের স্মৃতিধর নিরক্ষর অভিনেতা মোঃ রমজান আলি তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও (ষাট বৎসরের ব্যবধানে) 'নিয়তি' পালার বিবেক অভিনয়ের blank verse ডায়ালগ ও গান মুখস্ত বলতে পারতেন। এই পর্বের যে যাত্রা পালার নাম পাওয়া গেছে সেগুলি হল নিয়তি, ভক্তবীর, গয়াসুর বধ, চন্দ্রহাস, কালকেতু-ফুল্লরা। যাত্রার ক্ষেত্রে ধান্যকুড়িয়ার রাস মেলার যাত্রাভিনয়ের প্রভাব ছিল।

থিয়েটারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পর্ব শুরু করেন রাসবিহারী রায়। তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ১৯২০/২১ সালে 'নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের একটি ছোট মঞ্চ ও কিছু সিন-সিনারি ছিল। তাঁরা বড় বড় নাটক করতেন যার মধ্যে ছিল চন্দ্রগুপ্ত, কর্ণার্জুন, পথের শেষে, দেবলা দেবী, কারাগার, বঙ্গে বর্গী, কেদার রায়। বাকি নাটকের নামগুলি এখন বিস্মৃতির গর্ভে।

'নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ'-এর অভিনেতারা ছিলেন রাসবিহারী রায় , দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নলিনী মুখোপাধ্যায়, বিহারী চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, ভবানী প্রসাদ রায় , সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় , মনমোহন রায় (বোকা রায়) , মঙ্গলকৃষ্ণ রায় , ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাশ, সনৎ রায়, নিতাইপদ পাল, সন্তোষ দাশ ও অন্যান্যরা।

নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ-এর দায়িত্ব পেলেন ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় ১৯৩০-এর দশকে । তখন থেকে তিনি গ্রামে বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তাঁর প্রযোজনাগুলির মান কলকাতার পেশাদারি নাটকের সমকক্ষ ছিল । ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায়ের অসাধারণ চরিত্রায়ণের মধ্যে কয়েকটি হল 'অ্যান্টিগোনাস' (১৯৩৩), 'কর্ণ', 'শকুনি', 'সুখদা'।

নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ পরে অবলুপ্ত হলেও ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়ের পরিচালনায় নদীয়া জাগৃহি সংঘ-এর উদ্যোগে নাটক হতে থাকে । অভিনেতারা ছিলেন তারাদাস রায়, সুবিমল রায়, সুবিনয় রায়, সুনির্মল রায়, সুবিকাশ রায়, উমাকান্ত রায়, রমাকান্ত রায়, রাধাকান্ত রায়, সুধাংশু রায়, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, রামদুলাল দাশ, হিমাংশু রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনাথ কুমার পাল, সুশীল রায়, দিলীপ সিমলাই, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, দীনেন মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার রায়, নির্ম্মল দাশ, তীর্থঙ্কর রায়, প্রণব কুমার রায়, নন্দদুলাল পাল, পবিত্র রায়, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়ের সুযোগ্য সহযোগী ছিলেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায় । নাটক ও যাত্রায় অভিনয়, নির্দেশনা, সুরারোপ, সংগীত পরিচালনা - সব বিষয়ে দক্ষতায় তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের সম্পূর্ণ নাট্য-ব্যক্তিত্ব । এই পর্বের নাট্য-সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন প্রণব কুমার রায়।

নদিয়া গ্রামের নাট্যচর্চায় ইতিমধ্যে আর এক অতি-সক্রিয় প্রজন্মের উত্থান ঘটে বিভাষ চ্যাটার্জি, সুবীর রায়, শ্যামল চ্যাটার্জি, নীরজ চ্যাটার্জি ও অন্যান্যদের উদ্যোগে। প্রথম দিকে উৎসাহ যোগাতেন শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও তাঁর স্ত্রী, সরোজ চ্যাটার্জি, পঙ্কজ চ্যাটার্জি। নির্দেশনায় থাকতেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, দুলাল পাহাড় ও প্রণব কুমার রায়।

এই কিশোররা নাট্যকর্ম শুরু করেন চ্যাটার্জি পাড়ায় নদীয়া জীবন-বিকাশ সঙ্ঘের উদ্যোগে। পরে অবিরামভাবে যাত্রাভিনয় করতে থাকেন অগ্রগামী নাট্যসমাজ, নাটুকে গোষ্ঠী, বিনোদিনী অপেরা ইত্যাদি নামে এবং অবশেষে নদীয়া জাগৃহি সংঘে।

এই পর্বের অভিনয়ে থাকতেন বিভাষ চ্যাটার্জি, তাপস চ্যাটার্জি, নীরজ চ্যাটার্জি, সুবীর রায়, উৎপল রায়, প্রশান্ত দাশ, মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ রায়, সমীর (রতন) রায়, অসিত রায়, অখিল পাল, মানিক গাঙ্গুলি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অমল রায়, গোপীবল্লভ রায়, স্বপন মণ্ডল, অচিন্ত্য ঘোষ, নির্বাস চ্যাটার্জি, অরুণ মুখার্জি, অনুপ রায়, শুভাশীষ রায়, মানস রায়, মোঃ নজরুল ইসলাম, নিখিল চট্টোপাধ্যায় (নিউ ব্যারাকপুর), সমীর (বাচ্চু) রায়, তাপস রায় (বেড়াচাঁপা), অপূর্ব মণ্ডল, অশ্রু মণ্ডল, সোমনাথ হালদার, দেবপ্রসাদ মণ্ডল, মিনতি মণ্ডল, মাধবী সাউ, বাসন্তী বিশ্বাস, ভারতী মণ্ডল, শ্রীদাম মণ্ডল, মোঃ আবদার মণ্ডল, 'বিবেক' গঙ্গাধর মণ্ডল (সাংবেড়িয়া) ও অন্যান্যরা। নেপথ্যে সলিল রায়। সুবীর রায়ের অসাধারণ অভিনয় ছিল দর্শকদের বিশেষ প্রাপ্তি।

নাট্য প্রক্রিয়ার সর্ব বিষয়ে দক্ষ বিরল নাট্য-ব্যক্তিত্ব বিভাষ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০-এর দশক থেকে অসংখ্য নাটক ও যাত্রার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় ও উৎসাহে নতুন নতুন নাট্যকর্মীদের সমাবেশ ঘটল। নাট্যক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, মঞ্চ, উপস্থাপনা - সবকিছুতে বৈচিত্র্য এনে তাঁরা আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। প্রবীণদের মধ্যে সুবিকাশ রায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মল দাশ, পবিত্র রায় আবার এলেন রঙ্গমঞ্চে। কখনও এসেছেন অরূপ কুমার মণ্ডল, ডাঃ সুভাষ রায়।

পরবর্তী পর্বে নাট্য-কর্মকাণ্ডে এলেন তারক রায়, উজ্জ্বল রায়, অসীম মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ রায়, রাজীব রায়, সুদীপ্ত রায়, সন্দীপ রায়, সুবর্ণা রায়, অনিল পাল, অরুণ পাল, উজ্জ্বল রায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু পাল, প্রবীর বিশ্বাস, জটাধর পাল, শ্যামসুন্দর ঘোষ, রাজেশ চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর দাশ, ইন্দ্রনাথ সেন, ইন্দ্রজিৎ হাজরা, পম্পা পাল, জবা মণ্ডল, পিংকি দাশ ও অন্যান্যরা। পরে এসেছেন অনিমেষ হালদার, শোভন চ্যাটার্জি তন্ময় রায় ও অন্যান্যরা।

সাময়িকভাবে নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায় (নিউ ব্যারাকপুর), সৌরেশ হালদার, ডাঃ সুভাষ রায়, অরূপ মণ্ডল, রবি দাস (কলকাতা)।

পরে নির্দেশনায় এলেন বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র রায়, রুদ্রপ্রসাদ রায়, তারক রায়, রাজীব রায় ও অন্যান্যরা। নতুন নতুন নাট্যকর্মীরা এগিয়ে এসে এই নাট্যধারাকে বহমান রাখছেন।

পশ্চিম নদিয়াতে ও পূর্ব নদিয়াতেও ধারাবাহিক নাট্যচর্চা যথেষ্ঠ ছিল। পশ্চিম নদিয়াতে অনিল কুমার দাশ, রামদুলাল দাশ, মনোরঞ্জন দাশ, পুর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ দাশ, সন্তোষ দাশ, ঠাকুরদাস দাশ, মোঃ বেরা মণ্ডল, কালীপদ (ছেনো) মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিরা অতীতে অনেক যাত্রানুষ্ঠান করেছেন।

পশ্চিম নদিয়ার যাত্রানুষ্ঠান হত দারোগা বাড়ির আঙ্গিনায়, পঞ্চানন্দতলায়, ফণীভূষণ দাশের বাড়ির আঙ্গিনায় এবং অন্যত্র। বিবেকের ভূমিকায় পারদর্শী ছিলেন কালীপদ কাহার, মোঃ ছইলদ্দি মন্ডল। পশ্চিম নদিয়াতে বজ্রনাভ, নাস্তিক, মসনদ কার ইত্যাদি যাত্রা ও ঘুর্ণী, আগন্তুক, বিবর্ণ সিদুঁর ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয়েছে। বাকি নামগুলি এখন বিস্মৃতির গর্ভে। পশ্চিম নদিয়াতে অনেক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ, অনাথ দাশ, চিত্তরঞ্জন হাজরা, অমল দাশ, তপন দাশ, নির্মল ভট্টাচার্য, অর্জুন দাশ, রামপ্রসাদ দাশ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, তুলসী দাশ, জগদীশ দাশ, মানিক গাঙ্গুলি, সুবেন্দু কাপাসি, নিমাই দাশ, বিশ্বনাথ কাহার, শ্যামল দাশ, দিলীপ সরকার, বলাই পাল ও অন্যান্যরা।

পূর্ব নদিয়াতে অনেক যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার মধ্যে ছিল নিয়তি, চাষার ছেলে মানিকমালা, মহিষাসুর বধ, লক্ষণবর্জন , দানবীর হরিশ্চন্দ্র, অশ্রু দিয়ে লেখা, শয়তানের চর ইত্যাদি। অভিনয়ে অংশ নিতেন নারায়ণ দাশ, মোঃ বেরা মণ্ডল, কালীপদ (ছেনো) মণ্ডল, মোঃ চড়াই মণ্ডল, মোঃ আজিজ মণ্ডল, মোঃ ফজলুর হক ও অন্যান্যরা।

নদীয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মহকুমা ক্রীড়া উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সন্নিকটে ফেরিওয়ালা যাত্রার নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে। নির্দেশনায় ছিলেন সার্কেল ইনস্পেক্টর (বসিরহাট পশ্চিম) বিষ্ণুপদ দাশ। অভিনয়ে ছিলেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণ ও অন্যান্যরা।

শচীন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর রায় (মধ্যমগ্রাম নিবাসী) ও শিক্ষক দিলীপ কুমার মণ্ডল (বেড়াচাঁপা নিবাসী) ডঃ রমা চৌধুরি পরিচালিত 'প্রাচ্যবাণী' সংস্কৃত নাট্যদলের অভিনেতা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করেছেন।

বৈশাখ -জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের সব পাড়াতেই রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নাটক-যাত্রার চলন ছিল বহুদিন পর্যন্ত। তখন নাটক-যাত্রার সময় দর্শকদের মধ্যে বিলি করা হত 'প্রোগ্রাম'। এই আকর্ষণীয় ছাপা কাগজের মেনু-কার্ডে থাকত কুশীলব ও নেপথ্য শিল্পীদের পরিচিতি ও নাটকের প্রতি দৃশ্যের অভিনয়ের সূচি।

নদিয়া গ্রামের রাধাকান্ত রায়, পান্নালাল রায়, বাসুদেব রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় সুনামের সাথে অভিনয় করেছেন ও করছেন।

১৯৬১ সালে অভিনীত কর্ণার্জুন নাটকেই প্রথম মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য তার পরেও গ্রামের অনেক যাত্রায় ও নাটকে মহিলা চরিত্রে পুরুষেরা অভিনয় করেছেন।

ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়ের পুত্রেরা ১৯৪৩ সালে মাঝামাঝি 'S. Ray & Brethren' নামে একটি পারিবারিক 'নাট্য গ্রন্থাগার' করেছিলেন। সে যুগে এমন অভিনব উদ্যোগ অকল্পনীয়।

গ্রামের প্রথম যুগের অর্থাৎ ১৯৫১ ও ১৯৬০-এর দশকের নাট্যমঞ্চের অপরিহার্য কুশলী শিল্পী ছিলেন বিশ্বনাথ মণ্ডল।

নদিয়া গ্রামের নাট্যরঙ্গ ও সংস্কৃতিচর্চা (অসম্পূর্ণ তালিকা)

১৯২১ ⇨ ১৯৪০

◊ নিয়তি : যাত্রা : তারাপদ রায় (ফ্যালা রায়) -এর যাত্রা দল
◊ ভক্তবীর : যাত্রা : তারাপদ রায়ের যাত্রা দল
◊ কারাগার : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
◊ বঙ্গে বর্গী : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
◊ কর্ণার্জুন : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
১৯৩৩ ◊ চন্দ্রগুপ্ত : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ

১৯৪১ ⇨ ১৯৫০

◊ কালকেতু-ফুল্লরা : যাত্রা : তারাপদ রায়ের যাত্রা দল
◊ পথের শেষে : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
◊ কর্ণার্জুন : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
◊ কেদার রায় : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
◊ দেবলা দেবী : নাটক : নদীয়া বান্ধব নাট্য সমাজ
১৯৪৬ ◊ গয়াসুর বধ : যাত্রা : তারাপদ রায়ের যাত্রা দল

১৯৫১ ◊ বীর মোহনলাল : নাটক : জাগৃহি
◊ স্বাধীনতা জাগলো : নাটক : জাগৃহি

১৯৫১ ⇨ ১৯৬০

◊ ছেলে কার ? : নাটক : জাগৃহি
◊ তাই তো ! : নাটক : জাগৃহি
◊ সাজাহান : নাটক : জাগৃহি
◊ চন্দ্রগুপ্ত : নাটক : জাগৃহি

১৯৬১ ⇨ ১৯৭০

◊ গুরু-দক্ষিণা : নাটক : জাগৃহি
◊ বজ্রনাভ : যাত্রা : পশ্চিম নদিয়া
◊ নাস্তিক : যাত্রা : পশ্চিম নদিয়া
◊ মসনদ কার : যাত্রা : পশ্চিম নদিয়া
◊ সিরাজদৌল্লা : নাটক : জাগৃহি

২৭ মে ১৯৬১ □ ◊ হাস্যকৌতুক ও সঙ্গীত : জাগৃহি

□ ◊ কর্ণার্জুন : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়

* * * ১৯৬১ □ ◊ জাগৃহি : রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

৯ জুন ১৯৬২ □ ◊ কেদার রায় : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়

১৬ জুন ১৯৬২ □ ◊ বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

১৯৬৫ □ ◊ ডাকঘর : নাটক : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

১৯৬৬ ◊ □ল্কা : নাটক : জাগৃহি ।: নির্দেশনা : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়

এপ্রিল ১৯৬৬ ◊ □মুকুট : নাটক : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

১৯ জুন ১৯৬৬ □ ◊ ঘূর্ণী : নাটক : নদীয়া যুবক সঙ্ঘের তৃতীয় নিবেদন
পরিচালনা : নির্ম্মল দাশ

□ ◊ আগন্তুক : নাটক : পশ্চিম নদিয়া

১৩ মে ১৯৬৭ □ ◊ অর্ঘ্য : নাটক : জাগৃহি

২০/২১ মে ১৯৬৭ □◊ রবীন্দ্র জন্মোৎসব : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

□ ◊ রাজপুত বীর : নাটক : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ
নির্দেশনা : দুলাল পাহাড়
(প্রথম দিনে বৃষ্টির কারণে মাঝ-পথে অভিনয় বন্ধ থাকে। পরের দিন মঞ্চস্থ হয়)

১১ মে ১৯৬৮ □ ◊ রবীন্দ্র জন্মোৎসব : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

□ ◊ সোনার ভারত : যাত্রা : নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ
নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৭ মে ১৯৬৯ ◊ □রাজা দেবিদাস : যাত্রা : সহযোগিতায় জাগৃহি : নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৬ মে ১৯৭০ ◊ নাচমহল : যাত্রা : সহযোগিতায় জাগৃহি। নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০ অক্টোবর ১৯৭০ ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান : শারদোৎসব : বিজয়া দশমী
ইন্দুভূষণ রায় / মধুকর/ বিমান সাউ / আশীষ সাউ / সুবীর রায় / বিভাস চ্যাটার্জি

১৯৬১ □ ১৯৭০

□ ◊ ডাক্তারবাবু : নাটক

□ ◊ অচল পয়সা : নাটক

১৯৭১ □ ১৯৮০

৩ জুন ১৯৭২ □ ◊ রক্তে রাঙা মসনদ : যাত্রা : অগ্রগামী নাট্য সমাজ
নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯ মে ১৯৭৩ □◊ রক্ত দিয়ে কিনলাম : যাত্রা : নাটুকে গোষ্ঠী : নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৭ এপ্রিল ১৯৭৪ □◊ চন্ডীতলার মন্দির : যাত্রা : নাটুকে গোষ্ঠী
নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায় / প্রণব রায়

২৪ মে ১৯৭৫ ◊ সিঁদুর নিওনা মুছে : যাত্রা : বিনোদিনী অপেরা
নির্দেশনা: সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩ অক্টোবর ১৯৭৫ ◊ হরিশচন্দ্র : যাত্রা : বিনোদিনী অপেরা ।
নির্দেশনা: সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৮ ফেবুয়ারি ১৯৭৬ ◊ সেমসাইড : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : প্রণব রায়
২৯ মে ১৯৭৬ ◊ কে ঠাকুর ডাকাত : যাত্রা : বিনোদিনী অপেরা
নির্দেশনা: সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী
◊ সিঁদুর নিওনা মুছে : যাত্রা : বিনোদিনী অপেরা ।
নির্দেশনা : প্রণব রায়

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ : বিজয়পুর ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েসন (সোদপুর) একাংক প্রতিযোগিতা
◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা : অশোক চট্টোপাধ্যায়
(সংঘের বাইরে জাগৃহির প্রথম অভিনয়)
২০ অক্টোবর ১৯৭৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী
◊ রামায়ণ গান : নিখিল চট্টোপাধ্যায়
২১ অক্টোবর ১৯৭৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী
◊ রামায়ণ গান : নিখিল চট্টোপাধ্যায়
২১ অক্টোবর ১৯৭৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী
◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
২২ অক্টোবর ১৯৭৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : দশমী
◊ সেমসাইড : নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা: প্রণব কুমার রায়
২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৭ : স্বরূপনগর
◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা: অরূপ মণ্ডল
৮ জানুয়ারি ১৯৭৮ : হালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ নাট্য প্রতিযোগিতা
◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
(লোডশেডিং এর জন্য অভিনয় বর্জন)
৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮ : নব ব্যারাকপুর জাগৃতি সংঘ নাট্য প্রতিযোগিতা
◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
১১ জুন ১৯৭৮ : নদীয়া বামুন পাড়া
◊ স্মাগলার : নাটক : নদীয়া জাগ্রত অপেরা : নির্দেশনা : মানস রায়
◊ মেজদিদি : শিশু নাটক : মহিলা সমিতি : নির্দেশনা : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

২৭ জানুয়ারি ১৯৭৯ : ছোট জাগুলিয়া : নন্দনম নাট্য প্রতিযোগিতা

◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

২৯ জানুয়ারি ১৯৭৯ : বাঁশবেড়িয়া খামারপাড়া শিশু সংঘ (হুগলি) একাংক প্রতিযোগিতা

◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি :

দীপালি দালাল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

১৬ জুন ১৯৭৯ ◊ গরীব কেন মরে : নাটক : জাগৃহি

◊ সাজানো বাগান : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা অশোক চট্টোপাধ্যায়

৩১ জানুয়ারি ১৯৮০

◊ উত্তাল তরঙ্গ : নাটক : জাগৃহি

ফেবুয়ারি ১৯৮০ : নব ব্যারাকপুর শরৎ সংঘ নাট্য প্রতিযোগিতা

◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

০৮ জুন ১৯৮০

◊ কার দোষ : নাটক : জাগৃহি

◊ গেব্রিএল পেরী : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

২২ জুন ১৯৮০

◊ সাজানো বাগান : মাটিয়া সেটেলমেন্ট অফিসের নাটক : বেড়াচাঁপা রূপছায়া হলে সহযোগিতায় জাগৃহি

২০ অক্টোবর ১৯৮০ : শারদোৎসব : একাদশী

◊ হাঁড়ি ফাটিবে (রাতের অতিথি) : নাটক : জাগৃহি

১৯৮০ ◊ অবিচার সিনেমার সুটিং গ্রামে

১৯৭১ ⇨ ১৯৮০

◊ অশ্রু দিয়ে লেখা : যাত্রা : পূর্ব নদিয়ার হাজারী পাড়া

◊ শয়তানের চর : যাত্রা : পূর্ব নদিয়ার হাজারী পাড়া

১৯৮১ ⇨ ১৯৯০

◊ বুদ্ধির জয় : নাটক : জাগৃহি

২ মে ১৯৮১ : খোলাপোতা ব্লক যুব উৎসব

◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : অরুপ মণ্ডল (শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাস চট্টোপাধ্যায়)

১১ জুলাই ১৯৮১ : বসিরহাট দেবযানী সিনেমা

◊ মাদারিকা খেল : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

০৭-১৩ মার্চ ১৯৮২ : জাগৃহি ময়দানে সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব

২৩ অক্টোবর ১৯৮২ : জাগৃহি শারদোৎসব : ষষ্ঠী ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

২৪ অক্টোবর ১৯৮২ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◊ অঙ্কন প্রতিযোগিতা
◊ সমাজের জঞ্জাল : নাটক : জাগৃহি
২৫ অক্টোবর ১৯৮২ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী
◊ জীবনরঙ্গ : নাটক : জাগৃহি
২৬ অক্টোবর ১৯৮২ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী
◊ রক্ত দিল যারা : নাটক : দেবদূত সংঘ, ধান্যকুড়িয়া
১২ অক্টোবর ১৯৮৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : ষষ্ঠী
◊ বিচিত্রানুষ্ঠান
১৩ অক্টোবর ১৯৮৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◊ অঙ্কন প্রতিযোগিতা
◊ কুবেরের পাশা : নাটক : জাগৃহি
১৪ অক্টোবর ১৯৮৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী
◊ ঝিনুকে মুক্তো : নাটক : জাগৃহি
১৫ অক্টোবর ১৯৮৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী
◊ বাউল গান | সুজিত দে
১৭ অক্টোবর ১৯৮৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী
◊ মানুষ ও যন্ত্র : নির্বাক নাটক
নির্দেশনা : সুবীর রায়

০১ অক্টোবর ১৯৮৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী
◊ খুনিরও মন আছে : নাটক : জাগৃহি
০২ অক্টোবর ১৯৮৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী
◊ বিবর্ণ সিদুঁর : নাটক : নদীয়া বেকার (কল্যান)সমিতি
০৩ অক্টোবর ১৯৮৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী
◊ লোকগীতি অনুষ্ঠান : অমিতাভ চৌধুরী, দূরদর্শন
◊ মৃতের হাট (কফন) : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়
০২ জুন ১৯৮৪ : জাগৃহির রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত সন্ধ্যা
◊ দিনান্ত : নাটক
নির্দেশনা: বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ : ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে
◊ কফন (মৃতের হাট) : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ : সম্মিলনী, হাড়োয়া
◊ মৃতের হাট (কফন) : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৪ মার্চ ১৯৮৫ : জাগৃহি রজত জয়ন্তী উৎসব

◇ প্রভাত ফেরি : পতাকা উত্তোলন

◇ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ডাঃ সরোজ গুপ্ত, ডাঃ নিরঞ্জন ব্যানার্জ্জী, প্রীতিন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরজিং সেনগুপ্ত

◇ সঙ্গীতানুষ্ঠান : শুভব্রত দত্ত, গীতা দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত

◇ দুঃখীর স্বর্গ ও ভিখারী : শিশু নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

◇ একটি অবাস্তব গল্প : একাঙ্ক নাটক : উদ্যম, গোকনা

২৫ মার্চ ১৯৮৫ : জাগৃহি রজত জয়ন্তী উৎসব

◇ সঙ্গীতানুষ্ঠান : আবৃত্তি অনুষ্ঠান : নৃত্য অনুষ্ঠান

◇ রমেশ : শিশু নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

◇ ঈশ্বর বাবু এসেছেন : সুমেরু, বসিরহাট

২৬ মার্চ ১৯৮৫ : জাগৃহি রজত জয়ন্তী উৎসব

◇ তবলা তরঙ্গ : পরিচালনায় বাসুদেব মণ্ডল

◇ পথের পাঁচালী : সিনেমা

২৭ মার্চ ১৯৮৫ : জাগৃহি রজত জয়ন্তী উৎসব

◇ রাহুমুক্ত : নাটক : লোক রঞ্জন শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১২ অক্টোবর ১৯৮৫ : গোকনা, উদ্যম্ -এর অনুষ্ঠান

◇ ভূতের মুখে রাম নাম : জাগৃহি

৩১ মে ১৯৮৬ : জাগৃহির ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

◇ আবৃত্তি : সঙ্গীত : নৃত্য : পত্র লিখন প্রতিযোগিতা

◇ বিনি পয়সার ভোজ : একক অভিনয় : পবিত্র রায়

◇ সূক্ষ্ম বিচার : হাস্য কৌতুক : সৌরেশ হালদার ও অরুণ রায়

◇ বিশেষ অনুষ্ঠান : সুবীর রায়

◇ শাস্তি : নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা : সৌরেশ হালদার

১০ অক্টোবর ১৯৮৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◇ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ◇ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

◇ শ্রুতি নাটক

◇ হিংসার জবাব : নাটক : জাগৃহি
নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

◇ আয়না : একাঙ্ক নাটক : উদ্যম, গোকনা

১১ অক্টোবর ১৯৮৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী + নবমী

◊ ▯যুব সমাজের আলোর উৎস : কৌতুক নকশা : বরুণ পাল

◊ ▯অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মণ্ডলের ঘর গেরস্তি : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : পবিত্র রায়

১৩ অক্টোবর ১৯৮৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী : ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

১২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ : গোকনা গ্রামে উদ্যম্ -এর অনুষ্ঠানে

◊ শাস্তি : নাটক : জাগৃহি

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ : গোকনা গ্রামে উদ্যম্ -এর অনুষ্ঠানে

◊ অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মণ্ডলের ঘর গেরস্তি : জাগৃহি

৩ জানুয়ারি ১৯৮৭ অম্বিকানগর পল্লি উন্নয়ন সংস্থা-এর অনুষ্ঠান

◊ অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মণ্ডলের ঘর গেরস্তি : জাগৃহি

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ : গোপালপুর মোড় : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক

◊ খুকুর বিয়ে : জাগৃহি

রচনাও নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৫ মার্চ ১৯৮৭ ◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৭ মার্চ ১৯৮৭ : শ্রীনগর ◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৫ মার্চ ১৯৮৭ ◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

৬ জুন ১৯৮৭ : জাগৃহির বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব

◊ সঙ্গীত : আবৃত্তি

◊ জুতা আবিষ্কার : শিশু নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

◊ রবি মামার সন্ধানে : শিশু নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো, শ্রুতি লিখন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত

◊ কুড়োরাম : নাটক : উদ্যম, গোকনা

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ বানান, স্মৃতিশক্তি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

◊ সারি সারি পাঁচিল : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : পবিত্র রায়

১ অক্টোবর ১৯৮৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী ◊ বিতর্ক, তাৎক্ষণিক অভিনয়, আবৃত্তি, সঙ্গীত

◊ সদগতি : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

◊ পাথর : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : সৌরেশ হালদার

১২ জুন ১৯৮৮ : 'ব্যাংকাল্ট', দেগঙ্গা

◊ শুক-সারী : নাটক : সহযোগিতায় জাগৃহি

৩ জুলাই ১৯৮৮ : স্বরূপনগর, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বসিরহাট-২ সম্মেলন মঞ্চ

◊ মৃতের হাট (কফন) : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ : সরকার কর্তৃক নদীয়া জাগৃহি পাঠাগারের অধিগ্রহণের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে

◊ 'সাহিত্যের জেনে লিখুন' প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

◊ আলোচনাচক্র : 'সমাজের প্রগতিতে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা'

১৭ অক্টোবর ১৯৮৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ বর্ণ লিখন ও বানান প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ লালুভুলু : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : নিবেদিতা দাস

১৮ অক্টোবর ১৯৮৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

(ফাঁস নাটক বৃষ্টির কারণে ২১ অক্টোবর অভিনীত)

১৯ অক্টোবর ১৯৮৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের আসর

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ তাৎক্ষণিক অভিনয়

◊ সীতার অগ্নিপরীক্ষা : নাটক : উদ্যম, গোকনা

◊ মহাভারত : নাটক : উদ্যম, গোকনা

২১ অক্টোবর ১৯৮৮ ◊ ফাঁস : নাটক : জাগৃহি :

নির্দেশনা: পবিত্র রায়

১৯৮৮ : আড়বেলিয়া হাইস্কুলে মানবেন্দ্রনাথ রায় জন্ম শতবর্ষে

◊ ভূতের মুখে রাম নাম : নাটক : জাগৃহি

৭ জানুয়ারি ১৯৮৯ : ঘোড়ারাস গ্রামে

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

৭ অক্টোবর ১৯৮৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

৮ অক্টোবর ১৯৮৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী ◊ বর্ণ লিখন প্রতিযোগিতা

৯ অক্টোবর ১৯৮৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী ◊ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ শপথ : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৩ জানুয়ারি ১৯৯০ : খোলাপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৪ জানুয়ারি ১৯৯০ : চাঁপাপুকুর

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৬ জানুয়ারি ১৯৯০ : জাগৃহি ও উদ্যম-এর নাট্যোৎসব : জাগৃহি মঞ্চ

◊ সফদর হাসমি স্মরণ

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান : তৃতীয় বিশ্ব সাংস্কৃতিক সংস্থা

◊ সত্যি ভুতের গপ্পো : নাটক : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার

◊ ভুলব না : নাটক : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ভিসুভিয়স শাখা

◊ যুযুধান : নাটক : মিনাস, কলকাতা

২৭ জানুয়ারি ১৯৯০ : জাগৃহি ও উদ্যম-এর নাট্যোৎসব : জাগৃহি মঞ্চ

◊ পৃথিবীর জন্য : নাটক : মঞ্চদীপ, কলকাতা

◊ সম্বিত : নাটক : মহুয়া, বসিরহাট

◊ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ : নাটক : সুমেরু, বসিরহাট

২৮ জানুয়ারি ১৯৯০ : জাগৃহি ও উদ্যম-এর নাট্যোৎসব : জাগৃহি মঞ্চ

◊ পুনর্জন্ম : নাটক : কালচারাল ইউনিট, বসিরহাট

◊ কেন না মানুষ : নাটক : নাট্যম, টাকি

◊ স্বরবর্ণ : নাটক : আমরা ক'জন, হাড়োয়া

১৯৯০ : জাগৃহির বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

◊ তাহার নামটি রঞ্জনা : নাটক : জাগৃহি

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী ◊ তাৎক্ষণিক অভিনয় প্রতিযোগিতা

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ সোনাই দীঘি : যাত্রা : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২২ অক্টোবর ১৯৯০ : ধলতিথা যাত্রা প্রতিযোগিতা

◊ সোনাই দীঘি : যাত্রা : জাগৃহি (প্রথম পুরস্কার) :

নির্দেশনা: বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০-এর দশকে নদীয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহকুমা ক্রীড়া উৎসব

◊ 'ফেরিওয়ালা' যাত্রার নাট্যরূপ :

নির্দেশনা : বিষ্ণুপদ দাশ (সার্কেল ইনসপেক্টর, বসিরহাট পশ্চিম)

১৯৯১ ⇨ ২০০০

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার প্রতিযোগিতা

◊ বিচার : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ : মহুয়া, বসিরহাট -এর নাট্যোৎসব

◊ বিচার : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ : চাঁপাপুকুর

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৮ মার্চ ১৯৯১

◊ খুকুর বিয়ে (স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

রচনা ও নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৯৯১ ◊ রবীন্দ্র জন্মোৎসব : প্রভাত ফেরি ও পথনাটিকা 'সমস্যাপূরণ'

১৫ অক্টোবর ১৯৯১ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ ভোরাই খেয়া : নাটক : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার

১৬ অক্টোবর ১৯৯১ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

◊ কৈফিয়ত : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৭ অক্টোবর ১৯৯১ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ পাথর : নাটক : উদ্যম, গোকনা

১৯ অক্টোবর ১৯৯১ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ মীরার বঁধুয়া : যাত্রা : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

১৯৯১ : জাগৃহির কালীপূজা উপলক্ষে

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

১৯৯১ : ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার : আবৃত্তি পুরস্কার : সুতপা দাশ

২৪ এপ্রিল ১৯৯২ : বসিরহাট মোমিনপুর দাশ পাড়া

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৫ এপ্রিল ১৯৯২ : রঘুনাথপুর মণ্ডল পাড়া

◊ পথ নির্দেশ (স্বাস্থ্য দপ্তর-এর সৌজন্যে প্রচার নাটক) : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

৩ অক্টোবর ১৯৯২ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ বাঁকনল : নাটক : উদ্যম, গোকনা

৪ অক্টোবর ১৯৯২ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ বিচার : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৫ অক্টোবর ১৯৯২ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

◊ কালো রক্ত : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৮ অক্টোবর ১৯৯২ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ রিকসাওয়ালা : যাত্রা : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

এপ্রিল ১৯৯৩ : ১৪০০ বঙ্গাব্দ বরণ : প্রভাত ফেরি : বাংলা ভাষার কর্মশালা

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

◊ বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তীতে জাগৃহির শোভাযাত্রা

২২ অক্টোবর ১৯৯৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী ◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ আদাব : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২৩ অক্টোবর ১৯৯৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ শেষ বিচার : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ রায়

২৪ অক্টোবর ১৯৯৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ নীলরক্ত : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : পবিত্র রায়

২৬ অক্টোবর ১৯৯৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান ও ম্যাজিক

২৬ জানুয়ারি ১৯৯৪ : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার প্রতিযোগিতা

◊ আদাব : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৫ মে : ১৭ মে : ২৪ মে ১৯৯৪ : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় স্মৃতি নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে

◊ একক অভিনয় প্রতিযোগিতা

৭ মে ১৯৯৪ : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় স্মৃতি নাট্যোৎসব

◊ একক অভিনয় : শম্ভু পাল : কলকাতা

◊ ভালো মানুষ : একাঙ্ক নাটক : মঞ্চদীপ, কলকাতা

◊ মায়ের আঁচল : নাটক : জাগৃহি : নির্দেশনা : পবিত্র রায়

৮ মে ১৯৯৪ : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় স্মৃতি নাট্যোৎসব

◊ একক অভিনয় : সুপ্রিয় মণ্ডল : বসিরহাট ◊ একক অভিনয় : প্রদীপ দত্ত : অম্বিকানগর

◊ আশ্রয় : একাঙ্ক নাটক : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার

◊ গোধুলি বেলায় : একাঙ্ক নাটক : শবনম

◊ সেই সুর : একাঙ্ক নাটক : বসিরহাট মহকুমা হাসপাতাল রিক্রিয়েশন ক্লাব

৯ মে ১৯৯৪ : ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় স্মৃতি নাট্যোৎসব ◊ রবীন্দ্র প্রণাম

◊ একক অভিনয় : অরূপ মণ্ডল, ধান্যকুড়িয়া

◊ গুলশন : একাঙ্ক নাটক : স্বর্গদল, বসিরহাট

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

◊ প্রভাত ফিরে এসো : একাঙ্ক নাটক : উর্বি, বসিরহাট

১৫ অক্টোবর ১৯৯৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ মহাবিদ্যা : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

◊ কৃষ্ণচূড়ার রং লাল : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১৬ অক্টোবর ১৯৯৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ ডাক্তার : যাত্রা : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৭ নভেম্বর ১৯৯৪ : দেগঙ্গা তারা সিনেমায় 'ব্যাংকাল্ট'-এর অনুষ্ঠান

◊ সাজানো বাগান : নাটক : নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায় : সহযোগিতায় জাগৃহি

৯ মে ১৯৯৫ ◊ জাগৃহির রবীন্দ্র-জয়ন্তী

২৬ জানুয়ারি ১৯৯৫ : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার প্রতিযোগিতা

◊ কৃষ্ণচূড়ার রং লাল : নাটক : জাগৃহি

৩০ জানুয়ারি ১৯৯৫ : অম্বিকানগর ইয়ুথ কয়ার অনুষ্ঠান

◊ সাজানো বাগান : 'ব্যাংকাল্ট', দেগঙ্গা : সহযোগিতায় জাগৃহি

২০ আগস্ট ১৯৯৫ : নদীয়া জাগৃহি পাঠাগার

◊ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর স্মরণে সাহিত্য সভা :
আলোচক: শুভময় মণ্ডল, মোঃ গোলাম হোসেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়,
গোপাল মুখোপাধ্যায়, সমীর বিশ্বাস

◊ শ্রুতি নাটক 'ছুটি নাকচ'

৫ অক্টোবর ১৯৯৫ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ স্বরসপ্তক : শ্রুতি নাটক : অম্বিকানগর

◊ নতুন পথের যাত্রী : শ্রুতি নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

◊ সংঘাত : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৭ অক্টোবর ১৯৯৫ : জাগৃহি শারদোৎসব : চর্তুদশী

◊ একটি পয়সা : যাত্রা : জাগৃহি

নির্দেশনা : ডাঃ সুভাষ রায়

১৯৯৫ ◊ এ আমি চাইনি : নাটক : জাগৃহি

১৯৯৫ : নদীয়া জাগৃহি সংঘের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্যাপন

২৩ অক্টোবর ১৯৯৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ শুক-শারী : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

* * * বিশেষ আকর্ষণ – মঞ্চে দ্বিতল বাড়ি * * *

১৮ মে ১৯৯৬ : দেগঙ্গা ব্লক নেহরু যুবকেন্দ্র : হাদিপুর

◊ সংঘাত : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

(নির্দেশনায় প্রথম স্থান)

১৯৯৬ : জাগৃহির রবীন্দ্রজয়ন্তী

১৯৯৬ : হাদিপুর নবোদয় সংঘ

◊ কাকচরিত্র : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

৩১ মে ১৯৯৭ : জাগৃহির রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

◊ কেষ্টা : বালিকাদের নাটক : জাগৃহি

১০ অক্টোবর ১৯৯৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ গানের আসর : সংযোজনা : বিপ্লব চক্রবর্তী ও শংকর পাল

১২ অক্টোবর ১৯৯৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ স্বদেশী সংগীত মালা ‘স্বাধীন সুরে স্বাধীনতা’

পরিচালনা : নির্বাস চট্টোপাধ্যায়

◊ রক্তে ভেজা দেশের মাটি : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : পবিত্র রায়

১৩ অক্টোবর ১৯৯৭ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ তাহার নামটি রঞ্জনা : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : তপন মুখার্জি

৯ নভেম্বর ১৯৯৭ : গোকনা চন্ডীমণ্ডপ-এর অনুষ্ঠান

◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য 'স্বাধীন সুরে স্বাধীনতা'

৩১ নভেম্বর ১৯৯৭ : মাটিয়া দেশবন্ধু সেবা সমিতি-র অনুষ্ঠান ◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য

১৯৯৭ : আড়বালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ৫০ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান ◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য

১৯৯৭ : বসিরহাট বই মেলা ◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য

১৯৯৭ : ঈশ্বরীগাছায় অনুষ্ঠান ◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য

১৯৯৭ : জাগৃহির তারাশঙ্কর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ : সাংবেড়িয়া

◊ স্বদেশী সংগীত মালা : 'স্বাধীন সুরে স্বাধীনতা' : জাগৃহি

◊ রক্তে ভেজা দেশের মাটি : নাটক : জাগৃহি

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ : ব্লক ২ যুব উৎসবে জাগৃহি (বেগমপুর বিবিপুর উচ্চ বিদ্যালয়)

◊ আবৃত্তি : রাজীব রায় (দ্বিতীয় স্থান)

◊ তাহার নামটি রঞ্জনা : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি (প্রথম স্থান)

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ : বসিরহাট ব্লক ২ যুব উৎসবে জাগৃহি (বেগমপুর বিবিপুর উচ্চ বিদ্যালয়)

◊ রবীন্দ্র সঙ্গীত : সঙ্গীতা দাশ (দ্বিতীয়া) : জয়ন্ত দাশ (তৃতীয়)

◊ নজরুল গীতি : জয়ন্ত দাশ (দ্বিতীয়)

◊ তবলা লহরা : বুদ্ধদেব পাল (প্রথম) : বিপ্লব চক্রবর্তী (তৃতীয়)

◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য (প্রথম স্থান)

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ : বেগমপুর বিবিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব

◊ জাগৃহির গীতি আলেখ্য

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ গানের আসর : 'সপ্তক'

২ অক্টোবর ১৯৯৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

◊ গানের আসর 'গানের দ্বীপ'

◊ ভালো মানুষের গল্পো : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : পবিত্র রায়

৩ অক্টোবর ১৯৯৮ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ সুবর্ণ জয়ন্তী : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : ইন্দ্রনাথ সেন

১৯৯৮ : ব্লক ২ যুব উৎসব

◊ সুবর্ণ জয়ন্তী : নাটক : জাগৃহি (প্রথম স্থান)

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ : জেলা যুব উৎসব : মধ্যমগ্রাম

◊ সুবর্ণ জয়ন্তী : নাটক : জাগৃহি : পিংকি দাশ শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্র অভিনেত্রী

২৬ মার্চ ১৯৯৯ : যাদবপুর নাথ পাড়া (হাদিপুর) বাসন্তী পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে

◊ ভালো মানুষের গল্পো : নাটক : জাগৃহি

◊ অনুপ্রবেশ : নাটক : জাগৃহি

মে ১৯৯৯ : বসিরহাট নাট্য একাডেমি একাঙ্ক প্রতিযোগিতা

◊ সুবর্ণ জয়ন্তী : নাটক : জাগৃহি (পিংকি দাশ শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী)

২৫ মে ১৯৯৯ : হাদিপুর নবোদয় সংঘ

◊ সুবর্ণ জয়ন্তী : নাটক : জাগৃহি

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

◊ বসিরহাট নাট্য আকাদেমি আয়োজিত ৪০ দিনের অভিনেতার কর্মশালায় জাগৃহির পক্ষে বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও পিংকি দাশের অংশগ্রহণ

১৮ অক্টোবর ১৯৯৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ সঙ্গীত জলসা ও লোকনৃত্য

১৯ অক্টোবর ১৯৯৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : অধিক নবমী

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান ‘আনন্দ ভেলা’

২১ অক্টোবর ১৯৯৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ জীবনরঙ্গ : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : পবিত্র রায়

২২ অক্টোবর ১৯৯৯ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◊ ইচ্ছাপত্র : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : রাজীব রায়

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ : বসিরহাট ব্লক ২ যুব উৎসব : ঘোড়ারাস

◊ নাটক : জাগৃহি (প্রথম স্থান)

১৯৯৯ : বসিরহাট নাট্য আকাদেমি

◊ সাজানো বাগান : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

(প্রথম স্থান ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সুবীর রায় + শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাধবী সাউ)

২০০০ : বসিরহাট ব্লক২ যুব উৎসব

◊ নেপথ্যে : একাঙ্ক নাটক : জাগৃহি

পরিচালনা : সৌরেশ হালদার

(শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রবীর বিশ্বাস)

০৭ অক্টোবর ২০০০ : সংঘের নাটকের অভিনেত্রী মাধবী সাউ ও সরস্বতী ঘোষকে সম্বর্ধনা ও উপহার প্রদান

২৪ ডিসেম্বর ২০০০ : জাগৃহির 'গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতি শিশুমেলা'

◊ নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, অঙ্কন, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা

২০০১ ⇨ ২০১০

২২ ডিসেম্বর ২০০১ : জাগৃহি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

◊ উদ্বোধন : প্রভাতফেরি ◊ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, প্রবীণ বরণ, গুণীজন সম্বর্ধনা

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান (কলকাতার শিল্পী সমন্বয়ে)

২৩ ডিসেম্বর ২০০১ : জাগৃহি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

◊ নৃত্য ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান : তবলা লহরা : সঙ্গীত

◊ স্বপ্নের বাড়ি : নাটক : মহুয়া, বসিরহাট

◊ সাজানো বাগান : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

২৪ ডিসেম্বর ২০০১ : জাগৃহি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

◊ গানের আসর

◊ চাপা পড়া মানুষ : নাটক : টাকি নাট্যম

◊ পরশ পাথর : নাটক : শবনম বসিরহাট

◊ হাসির হাটে কান্না : যাত্রা : গৌরাঙ্গ নাট্য সমাজ, ধান্যকুড়িয়া

২০০২ ◊ লাইফবয় সাবান কোম্পানির সৌজন্যে অনুষ্ঠান : জাগৃহি

২০০৩ ◊ রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা : জাগৃহি

২ অক্টোবর ২০০৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ 'জাগৃহি' দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ

◊ মহিলাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

৩ অক্টোবর ২০০৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

৬ অক্টোবর ২০০৩ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◇ জিয়ন কন্যা : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : রবীন্দ্রনাথ দাশ

২০০৩ : হাসনাবাদ

◇ ভালোমানুষের গল্প : নাটক : জাগৃহি : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা পুরস্কার

২০০৩ : জিরাকপুর

◇ ভালোমানুষের গল্প : নাটক : জাগৃহি

২০০৩ : দেগঙ্গা বই মেলার অনুষ্ঠানে

◇ জিয়ন কন্যা : নাটক : জাগৃহি

২০০৩ : ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের অনুষ্ঠানে

◇ জিয়ন কন্যা : নাটক : জাগৃহি

২০০৩ : শিক্ষার অধিকার : নাটক : জাগৃহি

২০০৪ ◇ জাগৃহির রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত সন্ধ্যা

১৯ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : ষষ্ঠী

◇ দেবী প্রতিমার উদ্ভাসন : স্বামী গীতানন্দজী

২০ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◇ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◇ 'জাগৃহি' পত্রিকা প্রকাশ

◇ কবি সম্মেলন

◇ সঙ্গীতানুষ্ঠান : অরুণ রায়

২১ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◇ যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা

◇ রামায়ণ গান : নিখিল চট্টোপাধ্যায়

২২ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◇ একক অভিনয় প্রতিযোগিতা ◇ নৃত্য প্রতিযোগিতা

◇ সঙ্গীতানুষ্ঠান

২৪ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◇ পুরস্কার বিতরণ

◇ বিচিত্রানুষ্ঠান

◇ নেপথ্যে : নাটক : জাগৃহি

◇ অসামাজিক : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২৫ অক্টোবর ২০০৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

◇ বিচিত্রানুষ্ঠান : লোকরঞ্জন শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ : দেগঙ্গা বই মেলা

◊ কৃষ্ণচূড়ার রং লাল : নাটক : জাগৃহি

৬ মার্চ ২০০৫ : তরুণ সংঘ, মোহনপুর (হাসনাবাদ)

◊ রক্তে ভেজা দেশের মাটি : নাটক : জাগৃহি

২৯ মে ২০০৫ : জাগৃহির রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

◊ উজ্জ্বল উপস্থিতি : মাননীয় সত্যদুলাল মণ্ডল ও মোঃ সোহারাব হোসেন

◊ নৃত্য : সঙ্গীত : আবৃত্তি

◊ নাটক : জাগৃহি

১১ অক্টোবর ২০০৫ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ 'জাগৃহি' দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ

◊ একক অভিনয় প্রতিযোগিতা

◊ যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা

১২ অক্টোবর ২০০৫ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ নৃত্য প্রতিযোগিতা

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

১৪ অক্টোবর ২০০৫ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ পুরস্কার বিতরণ

◊ নাটক জাগৃহি

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : সপ্তমী

◊ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

◊ 'জাগৃহি' দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : অষ্টমী

◊ তাৎক্ষণিক একক অভিনয় প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

১ অক্টোবর ২০০৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : নবমী

◊ যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা ◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

◊ জাগৃহি মিউচুয়াল বেনিফিট ক্লাব -এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁদের সৌজন্যে নৃত্যানুষ্ঠান

◊ 'ফুটবল' : নাটক : জাগৃহি

◊ সত্যম শিবম সুন্দরম : নাটক : জাগৃহি

৩ অক্টোবর ২০০৬ : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

* * * * * *

২০০৯ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ সত্যি ভুতের গপ্পো : নাটক : জাগৃহি

২০১০ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ নাটক : জাগৃহি

২০১১ : ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ পূর্তি

◊ সত্যি ভুতের গপ্পো : নাটক : জাগৃহি

২০১১ : ২২শে শ্রাবণ

◊ জাগৃহি : রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদ্যাপন

২০১১ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ বিচিত্রানুষ্ঠান

২০১১ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ চোখে আঙ্গুল দাদা : নাটক : জাগৃহি

২০১১ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ জীবনরঙ্গ : নাটক : জাগৃহি

২০১১ : জাগৃহি শারদোৎসব

◊ চোর : নাটক :

নির্দেশনা : মানস কুমার দাশ

* * * * * *

২০১৬ : ১১ মার্চ ‘জাগৃহি মঞ্চ’ উদ্বোধন ও নাট্য উৎসব

◊ নাটক : অশ্বমেধের ঘোড়া : ‘ভাবনা’ (ন্যাজাট)

২০১৬ : ১২ মার্চ ‘জাগৃহি মঞ্চ’ উদ্বোধন ও নাট্য উৎসব

◊ নাটক : জুতা আবিষ্কার : ‘দৃষ্টি’ (দত্তপুকুর)

◊ নাটক : পরশ পাথর : ‘মহুয়া’ (বসিরহাট)

২০১৬ : ১৩ মার্চ ‘জাগৃহি মঞ্চ’ উদ্বোধন ও নাট্য উৎসব

◊ নাটক : মড়া চাঁদ : ‘নাট্যম’ (টাকী)

◊ নাটক : তামাশা : ‘চারণ সাহিত্য চক্র’ (মধ্যমগ্রাম)

২০১৬ : ১২ অক্টোবর : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◊ সেমসাইড : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : তারক রায়

২০১৭ : ৯ মে ◇ জাগৃহি-র রবীন্দ্র-প্রণাম

২০১৭ : ১০ মে

◇ জাগৃহি মঞ্চে যাত্রাভিনয় : 'অসুর নিধনে আসছে দুর্গা'

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায় : স্টার যাত্রা পার্টি : ন্যাজাট

২০১৭ : ১১ মে

◇ জাগৃহি মঞ্চে যাত্রাভিনয় : 'মন সঁপেছি কৃষ্ণ পদে'

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায় : স্টার যাত্রা পার্টি : ন্যাজাট

২০১৮ : ২০ অক্টোবর : জাগৃহি শারদোৎসব : একাদশী

◇ দন্তরঙ্গ : নাটক : জাগৃহি

নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২০১৯ : ১৫ অক্টোবর : জাগৃহি শারদোৎসবের পরে

◇ বৈতরণী : নাটক : স্বপ্নসৃজনী, বসিরহাট

২০২০ : ১ ফেব্রুয়ারি :

◇ বিচিত্রানুষ্ঠান

◇ অ-পূর্বা : নাটক : মনন, বরানগর

২০২০ : ২ ফেব্রুয়ারি :

◇ বিচিত্রানুষ্ঠান

◇ কল্পতরু : নাটক : মহুয়া, বসিরহাট

''জাগৃহি'-র নাট্য উৎসব :

১ : ২৪ / ২৫ / ২৬ / ২৭ মার্চ ১৯৮৫ ◇ ''জাগৃহি' রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্য উৎসব

২ : ২৬ / ২৭ / ২৮ জানুয়ারি ১৯৯০ ◇ ''জাগৃহি ও উদ্যম নাট্যোৎসব' : জাগৃহি মঞ্চ

৩ : ৭ / ৮ / ৯ মে ১৯৯৪ ◇ ''ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায় স্মৃতি নাট্যোৎসব'

৪ : ২২ / ২৩ / ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ ◇ ''জাগৃহি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব' উপলক্ষ্যে নাট্য উৎসব

৫ : ১১ / ১২ / ১৩ মার্চ ২০১৬ ◇ ''জাগৃহি মঞ্চ' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নাট্য উৎসব

৬ : ১০ / ১১ মে ২০১৭ ◇ ''জাগৃহি মঞ্চে' যাত্রা উৎসব

৭ : ১ / ২ ফেব্রুয়ারি ◇ ''জাগৃহি মঞ্চে' নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান

স্বাধীনতা জাগলো । নাটক । ১৯৫১

স্বাধীনতা জাগলো

অভিনেতা বর্গ	...	নাট্যোল্লিখিত চরিত্র
শ্রীসুবিমল রায়	...	মাস্টার দা (সূর্য্য সেন)
,, সুবিনয় রায়	...	লোকনাথ বল,
,, সুনির্ম্মল রায়	...	গুপ্তচর,
,, সুকমল রায়	...	টেগরা,
,, তীর্থঙ্কর রায়	...	রজত সেন,
,, নির্ম্মল কুমার দাস	...	ত্রিপুরা সেন,
,, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়	...	প্রভাস বল,
,, সন্তোষ কুমার ,,	...	অর্ধেন্দু দস্তিদার,
,, দিলীপ কুমার সিমলাই	...	নরেশ রায়—নির্ম্মল।

অন্যান্য ভূমিকায় :— শ্রীঅনাথ কুমার পাল, শ্রীকমল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীপবিত্র কুমার রায়, শ্রীপান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজ কুমার রায় ও আরো অনেকে।

——::——

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরা সেন, মাস্টার দা, টেগরা, নরেশ রায়, প্রভাস বল, বিধু ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৈনিক, লোকনাথ বল, নির্ম্মল, ১ম যুবক ও ২য় যুবক।

তৃতীয় দৃশ্য

মাষ্টার দা, রজত সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, টেগরা ও ত্রিপুরা।

চতুর্থ দৃশ্য

মাস্টার দা, ত্রিপুরা সেন, সৈনিক, টেগরা, লোকনাথ বল, প্রথম সৈনিক ও দ্বিতীয় সৈনিক ও গুপ্তচর।

পঞ্চম দৃশ্য

রজত সেন, মাষ্টার দা, টেগরা ও বল।

বীর মোহনলাল । নাটক । ১৯৫১

বীর মোহনলাল

অভিনেতা বর্গ	নাটোল্লিখিত ব্যক্তি
শ্রীপ্রণব কুমার রায়	মোহন লাল
,, দিলীপ কুমার মুখোঃ	মীরজাফর
,, সুনির্ম্মল রায়	সিরাজদ্দৌলা
,, অনাথ কুমার পাল	হাজী মহম্মদ ও কৃষ্ণবল্লভ,
,, দিলীপ কুমার সিমলাই	নওয়াজেস ও মীরমদন,
,, কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ	আলীবর্দ্দী খাঁ,
,, নির্ম্মল কুমার দাস	জানকীরাম ও শ্যামসুন্দর,
,, সুশীল রায়	জগৎশেঠ,
শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোঃ	সামসের খাঁ, উমিচাঁদ
,, তীর্থঙ্কর রায়	ভাস্কর পণ্ডিত,
,, পান্নালাল চট্টোঃ	মীর হবিব, আনোয়ার খাঁ,
,, সুবিনয় রায়	ওয়াটস, রায় বায়ন,
,, সুবিমল রায়	ড্রেক ও ক্লাইভ,
,, পবিত্র কুমার রায়	মীরণ,
,, সুশান্ত রায়	শোভন লাল,
,, রাজ কুমার রায়	সৈয়দ আহম্মদ ও সুরদাস।

অন্যান্য ভূমিকায় :— শ্রীবিমল কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীকমল কৃষ্ণ ঘোষ; শ্রীরাধা কান্ত রায়; শ্রীমুকুল রায়; শ্রীসুকুমার মণ্ডল।

—ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ—

১ম দৃশ্য
রায় বায়ণ, নওয়াজেস, হাজী মহম্মদ, মোহন লাল ও খোজাগণ।

২য় দৃশ্য
ভাস্কর পণ্ডিত, মীর হবিব, সিরাজ, সৈয়দ, সামসের খাঁ ও মোহনলাল।

৩য় দৃশ্য
সৈয়দ, মীরজাফর, জানকীরাম, ভাস্কর পণ্ডিত, আলী

কর্ণার্জ্জুন । নাটক । ২৭ মে ১৯৬১। পৃ ১

নদীয়া জাগৃহি সংঘ

কর্ত্তৃক

অপরেশ চন্দ্রের

কর্ণার্জ্জুন

পরিচালনা

ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়।

মঞ্চ ব্যবস্থাপনা :—

শ্রীনাথ রায়

সুবিনয় রায়

অমরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়

মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা :—

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মারক :—

শ্রীনির্ম্মল দাস

শ্রী প্রণব রায়

আলোক সম্পাত :—

শ্রীপঙ্কোজ ভট্টাচার্য

মাইক ও লাউডস্পীকার :—

মাইক ও বিজলী

মেটিয়া হাট

২৪ পরগণা

ব্যবস্থাপনা :—

শ্রীগোবিন লাল মুখোপাধ্যায়

রূপ সজ্জা :—

ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং (বসিরহাট)

২৭ মে ১৯৬১

কর্ণার্জ্জুন পৃ ২

চরিত্র		রূপায়ণে
শ্রীকৃষ্ণ	—	পঙ্কোজ ভট্টাচার্য্য
বলরাম	—	সুকমল রায়
সূর্য্য	—	তীর্থঙ্কর রায়
ইন্দ্র	—	পরিতোষ হালদার
জামদগ্ন	—	অমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋষি	—	সন্তোষ কুমার দাস
ভীষ্ম	—	দীনেন মুখোপাধ্যায়
ধৃতরাষ্ট্র	—	তারাদাস রায়
সঞ্জয়	—	পান্নালাল রায়
বিদুর	—	পঙ্কোজ চট্টোপাধ্যায়
দ্রোণাচার্য্য	—	অনিল দাস
শকুনি	—	সুবিকাশ রায়
দুর্য্যোধন	—	সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
দুঃশাসন	—	পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়
বিকর্ণ	—	নির্ম্মল দাস
অধিরথ	—	হিমাংশু রায়
কর্ণ	—	রমাকান্ত রায়
যুধিষ্ঠির	—	দেবকুমার সেনগুপ্ত
ভীম	—	উমাকান্ত রায়
অর্জ্জুন	—	রাধাকান্ত রায়
নকুল	—	বানিয়া ঠাকুর
সহদেব	—	নন্দদুলাল পাল
ধৃষ্টদ্যুম্ন	—	রাজকুমার রায়
শল্য	—	প্রভাত চট্টোপাধ্যায়
ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ	—	সুধাংশু রায়
কর্ণের মন্ত্রী	—	অজিত রায়
বৃষকেতু	—	সুভাষ চট্টোপাধ্যায়
কৃপ	—	সুভাষ রায়
জরাসন্ধ	—	মৃণাল চট্টোপাধ্যায়
প্রতিকামী	—	সুকল্যাণ রায়
দ্রৌপদী	—	মাধবী ভট্টাচার্য
পদ্মা	—	মালতী ভট্টাচার্য্য
কুন্তী	—	রেখা সিকদার
নিয়তি	—	নিতাই পাল

কর্ণার্জ্জুন পৃ ৩

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—নদীতীর
কর্ণ, অগ্নিহোত্র, শূদ্র, অধিরথ

১ম অঃ—২য় দৃশ্য
হস্তিনা-প্রাসাদ
শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন,
দ্রোণাচার্য্য।

১ম অঃ—৩য় দৃশ্য
পর্বত শ্রেণীর আশ্রম
কর্ণ, জামদগ্ন্য, নিয়তি

১ম অঃ—৪র্থ দৃশ্য
পদ্মা, মহাদেব, নিয়তি

১ম অঃ—৫ম দৃশ্য
কর্ণ, নিয়তি, ঋষি

১ম অঃ—৬ষ্ঠ দৃশ্য
মল্লভূমি
ভীষ্ম, দ্রোণ, পঞ্চপাণ্ডব,
দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কুন্তি

—বি শ্রা ম—

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য
হস্তিনা প্রাসাদ
বিদুর, ভীষ্ম, শকুনি, দুর্যোধন।

২য় অঙ্ক—২য় দৃশ্য
স্বয়ম্বর সভা
শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দুর্যোধন,
দুঃশাসন, শকুনি, দ্রোণ, কর্ণ,
শল্য, দ্রৌপদী, ব্রাহ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব

২য় অঃ—তৃয় দৃশ্য
প্রান্তর
দ্রোণ, ভীষ্ম, দুঃশাসন, ভীম,
যুধিষ্ঠির।

২য় অঃ—৪র্থ দৃশ্য
নদীতীর
কর্ণ, নিয়তি, পদ্মা

—বি শ্রা ম—

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য
ইন্দ্রপ্রস্থ
দুর্যোধন, শকুনি, শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ
দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির, নিয়তি।

৩য়—২দৃশ্য
কক্ষ
শকুনি, দুর্যোধন, ভীম

৩য়—৩য় দৃশ্য
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠীর, ভীম,
অর্জ্জুন, নিয়তি।

কর্ণার্জ্জুন পৃ ৪

৩য় অঃ—৪র্থ দৃশ্য

রাজসভা

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বিদুর,
দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ,
পঞ্চপাণ্ডব, শকুনি, দ্রৌপদী
প্রতিকামী।

— বি রা ম —

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

হস্তিনা

শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী, বিদুর

৪র্থ অঃ—২য় দৃশ্য

প্রভাস কানন

ভীম, যুধিষ্ঠীর, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী

৪র্থ অঃ—৩য় দৃশ্য

প্রাসাদ

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, কর্ণ

৪র্থ অঃ—৪র্থ দৃশ্য

কর্ণের অন্তপুর

পদ্মা, কর্ণ ব্রাহ্মণ, বৃষকেতু,
দৌবারিক, শ্রীকৃষ্ণ।

— বি রা ম —

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য হস্তিনা

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্যোধন

৫ম অঃ—২য় দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল

৫ম অঃ তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণ, কুন্তি।

৫ম অঃ—৪র্থ দৃশ্য

কর্ণের প্রাসাদ

পদ্মাবতী, ছদ্মবেশীসূর্য্য নিয়তি

৫ম অঃ—৫ম দৃশ্য

কর্ণের প্রাসাদ কক্ষ

কর্ণ, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র, পদ্মা,
নিয়তি

৫ম অঃ—ষষ্ঠ দৃশ্য

রণস্থল

শকুনি, দুর্যোধন, শল্য, দুঃশাসন
ভীম, কর্ণ, যুধিষ্ঠীর, শ্রীকৃষ্ণ
অর্জ্জুন।

— য ব নি কা —

ডাকঘর

নাটক

মে ১৯৬৫

নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

অভিনয়ে ~

মোড়ল / অচিন্ত্য ঘোষ
পিসেমশায় / নীরোজ চ্যাটার্জী
অমল / তাপস রায়
দইওয়ালা / নির্বাস চ্যাটার্জী
নগররক্ষী / বিশ্বনাথ রায়
মালিনী / নমিতা চ্যাটার্জী
কবিরাজ / অঞ্জন ঘোষ
রাজবৈদ্য / উৎপল রায়
ঠাকুরদা / বিভাষ চ্যাটার্জী
রাজদূত / শ্যামল চ্যাটার্জী

মুকুট

নাটক

এপ্রিল ১৯৬৬

নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ

অভিনয়ে ~

ইশা খাঁ / বিভাষ চ্যাটার্জী
রাজধর / নীরোজ চ্যাটার্জী
ধুরন্ধর / সমীর (বাচ্চু) রায়

রাজপুত বীর

নাটক

২২ মে ১৯৬৭

নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ
নির্দেশনা ~ দুলাল পাহাড়
ব্যবস্থাপনা ~ শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ে ~

রাম সিং / নীরোজ চ্যাটার্জী
ভক্ত সিং / বিশ্বরূপ মণ্ডল
খড়গ সিং / প্রশান্ত দাশ
কেতন সিং / তাপস চ্যাটার্জী
প্রতাপ সিং / সমীর (রতন) রায়
দলীপ সিং / নিমাই দাশ
বলবন্ত / নির্মল ভট্টাচার্য
নাগভট্ট / কাশীনাথ ঘোষ
অনন্তশর্মা / প্রশান্ত দাশ
কিসবর খাঁ / জহরলাল মণ্ডল
হুকুম আলি / সোমনাথ (বিচু) ব্যানার্জী
কৃষ্ণাবাঈ / বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
অন্যান্য / মনোরঞ্জন চ্যাটার্জী
মোঃ আবদার মণ্ডল

উল্কা । নাটক । ১৯৬৬

নদীয়া জাগৃহী সঙ্ঘের তৃতীয় নিবেদন—

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের

—"উল্কা"—

১৯৬৬ সাল

: চরিত্র চিত্রণে :

রায়বাহাদুর রাজীব নাথ ঘোষ—	ধনী ব্যবসায়ী	রাধাকান্ত রায়
অরুণাংশু—	ঐ পরিত্যক্ত প্রথম সন্তান	সুবিকাশ রায়
সুবীর—	ঐ দ্বিতীয় সন্তান	সুকমল রায়
ডাঃ সুহৃৎ সরকার—	ঐ বাল্য বন্ধু	উমাকান্ত রায়
আগরওয়ালা—	ঐ পার্টনার	তপন রায়
প্রফুল্ল—	ঐ বৃদ্ধ সরকার	ভোলানাথ চ্যাটার্জী
গণেশ বসু—	সুবীরের বন্ধু	পান্না রায়
তু'পে—	'মিড নাইট হোটেলের' বর্মী ম্যানেজার	প্রণব রায়
সুব্রত—	ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টর	প্রভাত চ্যাটার্জী
স্বামীজী—	স্বর্গাশ্রমের অধ্যক্ষ	দীনেন্দ্র মুখার্জী
কমলেশ—	গোপার বন্ধু	নির্মল দাস
দাদু—	কমলার মামা	অনিল দাস
সোলেমান	গণেনের অনুচর	পান্না চ্যাটার্জী
মালী/লিংফু—	বাগানের মালী ও চোরা কোকেন কারবারী	চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী
মধু—	ডাঃ সুহৃৎ সরকারের পুরাতন ভৃত্য	সুভাষ চ্যাটার্জী
অশোক—	এস, আই	তারাদাস রায়
কমলা—	রাজীবের স্ত্রী	কল্পনা রায়
গোপা—	ঐ কন্যা	দিপালী ভট্টাচার্য্য
মিলি—	ডাঃ সুহৃৎ সরকারের মেয়ে	মঞ্জুশ্রী রায়
মা'কিন—	বর্মী নর্তকী	খুকু ভট্টাচার্য্য
লছমী বাঈ—	স্বর্গাশ্রমের বালিকা	কৃষ্ণা মুখার্জী
ক্ষ্যান্ত—	ঝি	

★ ★ ★

উদ্বোধন সঙ্গীত— দীপান্বিতা রায়

নেপথ্যে

নাট্য পরিচালনায়—**ডাঃ ভবানী প্রসাদ রায়**

সঙ্গীত পরিচালনায়—অনিল ওঝা (সুরমালা অর্কেষ্ট্রা, কলিকাতা)

মঞ্চ সজ্জায়— ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, বসিরহাট

আলোক সজ্জায়— নন্দী ব্রাদার্স, বসিরহাট

স্মারক— সুকুমার চ্যাটার্জী
দুলাল পাহাড়

মঞ্চ ব্যবস্থাপনায়— শ্রীনাথ রায়
সুবিনয় রায়

সোনার ভারত : যাত্রাভিনয় : ১১ মে ১৯৬৮

চরিত্র গ্রহণে :

অপূর্ব মণ্ডল অমল রায় অশ্রু মণ্ডল শুভাশীষ রায় নীরজ চ্যাটার্জি তাপস চ্যাটার্জি তাপস রায়
নজরুল ইসলাম প্রশান্ত দাশ সমীর (বাচ্চু) রায় বিভাস চ্যাটার্জি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ রায়
মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি মানস রায় সমীর (রতন) রায় সুভাষ চ্যাটার্জি সোমনাথ হালদার

নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘের চতুর্থ নিবেদন

"সোনার ভারত" ১১ মে ১৯৬৮

রচনা	পরিবেশনা	পরিচালনা	ব্যবস্থাপনা
অজয় কুমার দে সুর-যোজনা নিতাইচন্দ্র পাল	নদীয়া জীবন-বিকাশ সংঘ	শ্রীগুরুকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সহকারী শ্রীরামদুলাল দাস	শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সহকারী শ্রীসুবীর কুমার রায়

॥ চরিত্র গ্রহণে ॥

, অমল, মাস্টার অশ্রু, আশীষ, চট্টু, তাপস চট্টোপাধ্যায়, তাপস রায়, নজরুল, প্রশান্ত দাস, বাচ্চু, বিভাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ রায়, মনোরঞ্জন, মানস, সমীর, সুভাষ, সোমনাথ।

॥ চরিত্র পরিচিতি ॥

পৃথ্বীরাজ (দিল্লীর সম্রাট), সমর সিংহ (মেবারের রাণা), জয়চাঁদ (কনোজরাজ), রূপচাঁদ, গোকুলচাঁদ, তমাল (ঐ পুত্রদ্বয়), মিত্ররায় (ঐ মন্ত্রী) মহম্মদ ঘোরী (কাবুলের সুলতান), কুতবউদ্দীন (ঐ ক্রীতদাস), বক্তিয়ার (ঐ সেনাপতি), হেমাদেব (দিল্লীর দ্বাররক্ষী), দেবার (ঐ পুত্র), চারণ (গুপ্তচর) অরিমর্দন (গজনরাজ), মোহিনী (ঐ নাতনী), পূর্ণিমা (জয়চাঁদের স্ত্রী), সংযুক্তা (ঐ কন্যা), পৃথা (সমরসিংহের স্ত্রী)

[illegible]	দ্বিতীয় অঙ্ক	তৃতীয় অঙ্ক	চতুর্থ অঙ্ক
...দ মহম্মদ, ।	১—শিবির মহম্মদ ঘোরী, কুতব, বক্তিয়ার, গোকুল।	১—শিবির মহম্মদ ঘোরী, কুতব, হেমদেব, বক্তিয়ার, সমর।	১—কনোজ রাজপ্রাসাদ গোকুল, তমাল, রূপচাঁদ, মিত্ররায়, তমাল, মহম্মদ, গোকুল। ২—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ বক্তিয়ার, পৃথা, সংযুক্তা, হেমাদেব, তমাল, পূর্ণিমা, পৃথা।
...ক্তা	২—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ দেবার, রূপচাঁদ, সমর, পৃথা, পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, বক্তিয়ার, হেমাদেব।	২—শিবির রূপচাঁদ, পূর্ণিমা, গোকুল, জয়চাঁদ, পৃথ্বিরাজ।	৩—রণস্থল দেবার, হেমাদেব, সমর, মহম্মদ, রূপচাঁদ, গোকুল জয়চাঁদ, পূর্ণিমা, মোহিনী, মহম্মদ, কুতব।
...রসিংহ, পৃথা ।	৩—গজনরাজ প্রাসাদ অরিমর্দন, মোহিনী, রূপচাঁদ, কম্বুকণ্ঠ।	৩—শিবির মোহিনী, অরিমর্দন, সংযুক্তা, রূপচাঁদ, মোহিনী।	৪—রণস্থলের পার্শ্বদেশ পৃথ্বীরাজ, জয়চাঁদ, সংযুক্তা, পৃথা। **পঞ্চম অঙ্ক** ১—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ মহম্মদ, কুতব, হেমাদেব, বক্তিয়ার জয়চাঁদ।
...ম্বর সভার অন্দর তোরণ সংযুক্তা, মিত্ররায়, গোকুলচাঁদ, পূর্ণিমা রূপচাঁদ, সংযুক্তা, জয়চাঁদ, গোকুল, পৃথ্বীরাজ।	৪—কনোজ রাজপ্রাসাদ তমাল, গোকুল, পূর্ণিমা, মিত্ররায়, জয়চাঁদ, মহম্মদ ঘোরী, কম্বুকণ্ঠ, সংযুক্তা, পূর্ণিমা।	৪—প্রাসাদ অঙ্গন হেমাদেব, জয়চাঁদ, পৃথা, সমর, সংযুক্তা, পূর্ণিমা, মিত্ররায়, পৃথ্বীরাজ, কম্বুকণ্ঠ।	(যবনিকা)

রাজা দেবিদাস । যাত্রা । ১৭ মে ১৯৬৯ শনিবার

রাজা দেবিদাস

পঞ্চাঙ্ক লোকনাট্যাভিনয়

নেপথ্যে -

রচনা - শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার দে
নির্দেশক - শ্রী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্মারক - শ্রী প্রণব কুমার রায়
ব্যাবস্থাপনা - শ্রী শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়
সুর-সংযোজনা - শ্রী নিতাই পাল

রূপায়ণে -

তাপস চ্যাটার্জী, উৎপল রায়, বিশ্বনাথ রায়, অশ্রু মণ্ডল, অখিল পাল,
বিভাস চ্যাটার্জী, অপূর্ব মণ্ডল, তাপস রায়, সুভাষ চ্যাটার্জী, সমীর রায়,
নীরজ চ্যাটার্জী, সোমনাথ হালদার, প্রশান্ত দাশ, মিনতি মণ্ডল,
নির্বাস চট্টোঃ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদাম মণ্ডল

নাচমহল । যাত্রা । ১৬ মে ১৯৭০ শনিবার রাত্র ৯ ঘটিকায়

—ঃ আমাদেরসপ্তম প্রয়াস ঃ—

"নাচমহল"

রচনা

শ্রীভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহযোগিতায়—নদীয়া জাগৃহি সংঘ

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সাল, শনিবার, রাত্র ৯ ঘটিকায়

চরিত্রচিত্রণে

সমীর, বিশ্বনাথ, অখিল, সুভাষ, উৎপল, তাপস, নিরোজ, অপুর্ব, বিভাস, গঙ্গাধর, নির্বাস, আবদার, বিশ্বনাথ(২), অমল, সুবীর, মানিক।

চরিত্র পরিচয়

মুর্শিদ কুলী (বাংলার নবাব), জিন্নতউন্নিস (ঐ কন্যা), দবির খাঁ (ঐ কর্মচারী), সুজাউদ্দিন(ঐ নাজির), সমুদ্রসেন (সমুদ্র গড়ের রাজা) বসন্ত-সেন (ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র), হেমন্ত সেন (ঐ কনিষ্টপুত্র), চৈতন্য (রাজভৃত্য), মন্দোদর চূড়ামনি (সমাজপতি), গাজী রহমান (সমুদ্রগড় বাসী), কাসেম আলি (ঐ প্রতিবেশী), কালিসের (নায়েক), বকুল (হেমন্তের স্ত্রী), ইরাবতী (নায়েব কন্যা), খসবু বিবি (গাজীর স্ত্রী)।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

পদ্মদীঘির ঘাট

ইরাবতী, হেমন্ত, চৈতন্য, দবির, কাসেম, হেমন্ত, বিবেক —

দ্বিতীয় দৃশ্য

গাজীরহমানের বাড়ী

খসবু, কাসেম, গাজীরহমান

তৃতয় দৃশ্য

সমুদ্রগড় প্রাসাদ

চৈতন্য, বসন্ত, সমুদ্র, চূড়ামনি, গাজী, হেমন্ত, ইরাবতী—

৪র্থ দৃশ্য

ইরাবতীর গৃহ সম্মুখ

দবির খাঁ, গাজী কাসেম, খসবু, ইরাবতী, চূড়ামনি, দবির।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ কক্ষ

জিন্নত, সুজা, দবির খাঁ, মুর্শিদ, দবির, সুজা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্রগড়ের প্রাসাদ

হেমন্ত, ইরাবতী, বকুল, চৈতন্য, সমুদ্র, বসন্ত, কাসেম দবির

তৃতীয় দৃশ্য

গাজীরহমানের বাড়ী

খসবু, গাজী, চূড়ামনী, কাসেম, বসন্ত, খসবু।

৪র্থ দৃশ্য

মুর্শিদাবাদের বাঈজীমহল

ইরাবতী, দবির, জিন্নত, মুর্শিদ, বাইজী, ইরাবতী জিন্নত দবির, সুজা, বসন্ত, ইরাবতী জিন্নত, বিবেক, জিন্নত।

তৃতীয় অংক

সমুদ্রগড় রাজ প্রাসাদ

সমুদ্র, কাসেম, বসন্ত, চৈতন্য, বকুল, হেমন্ত, বকুল, চৈতন্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

গাজী রহমানের বাড়ী

গাজী, দবির, ইরাবতী, খসবু, কাসেম।

তৃতীয় দৃশ্য

নবাব প্রাসাদ

মুর্শিদকুলি, দবির, জিন্নত, সুজা, মুর্শিদকুলি, বিবেক।

৪র্থ দৃশ্য

হেমন্ত, চৈতন্য, ইরাবতী, বকুল, চৈতন্য, সমুদ্র, বসন্ত, বিবেক, কাসেম।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

দবির খাঁর শিবির

দবির, গাজী, চূড়ামনি, রক্ষী, হেমন্ত, গাজী, ইরাবতী, দবির বসন্ত, গাজী, মুর্শীদ, রক্ষী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবাব প্রাসাদ

মুর্শীদ, জিন্নত, সুজাউদ্দিন, মুর্শীদ, বিবেক।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

সমুদ্র, কাসেম, চৈতন্য, গাজী, দবির খাঁ

৪র্থ দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর

বকুল, খসবু, গাজী, সমুদ্র, দবির, রক্ষী, সুজা।

৫ম অংক

প্রথম দৃশ্য

হেমন্ত, ইরাবতী, বকুল, কাসেম, দবির, মুর্শীদ, সুজা।

রাধা আর্ট প্রেস, নেহালপুর, ২৪ পরগণা।

সিঁদুর নিওনা মুছে । যাত্রা । ২৪ মে ১৯৭৫

বিনোদিনী অপেরার
একাদশ নিবেদন

সিঁদুর নিওনা মুছে

যাত্রাভিনয়

রচনা - নির্মল মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা - নদীয়া জাগৃহি সংঘ
নির্দেশনা ও সুরারোপে - সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র রূপায়ণে -
তাপসকুমার, কুমার অখিলেশ, কল্পনা নাথ , সুবিকাশ রায়,
গোপীবল্লভ রায়, সুবীর রায়, মাস্টার উৎপল, প্রশান্ত দাশ,
নীরজ চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার, বিভাস চট্টোপাধ্যায়,
বিশ্বনাথ রায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য,
স্বপন মণ্ডল, দিপালী দেবী, বিন্দুরাণী

হরিশ্চন্দ্র

যাত্রাভিনয় : ১৩-১০-১৯৭৫
(বিনোদিনী অপেরা)
পরিচালনা : নদীয়া জাগৃহি সংঘ
নির্দেশনা : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : শ্যামল চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়ে -

অখিল পাল   মানস রায়   বিভাস চট্টোপাধ্যায়   মাস্টার সঞ্জয়   সুবিকাশ রায়
বিশ্বনাথ রায়   সুবীর রায়   উৎপল রায়   সমীর (বাচ্চু) রায়   পবিত্র রায়
শুভাশীষ রায়   স্বপন মণ্ডল   বিন্দুরাণী   অপূর্ব মণ্ডল   দ্বীপান্বিতা রায়

মাদারিকা খেল

একাঙ্ক নাটক : ২১ অক্টোবর ১৯৭৭
প্রযোজনা : জাগৃহি
রচনা : শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়
অভিনয়ে -

অরুণ মুখোপাধ্যায়   বিভাস চ্যাটার্জি   সুবীর রায়   বিশ্বনাথ রায়   দিপালী দালাল

সেমসাইড

নাটক : ২২ অক্টোবর ১৯৭৭
প্রযোজনা : জাগৃহি
রচনা : শৈলেশ গুহনিয়োগী ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী
নির্দেশনা : প্রণব কুমার রায়
আবহ সঙ্গীত : কালীপদ মান্না, (বেতার)
অভিনয়ে :

তাপস চট্টোপাধ্যায়   আশীষ রায়   মানস রায়   প্রশান্ত দাশ   অসিত রায়   উৎপল রায়
বিশ্বনাথ রায়   নীরজ চট্টোপাধ্যায়   সমীর (বাচ্চু) রায়   দেবীপ্রসাদ মণ্ডল   তাপস রায়
সুবীর রায়   স্বপন মণ্ডল   অরুণ মুখোপাধ্যায়   বিভাস চট্টোপাধ্যায়   ও   ডলি সরকার

স্মাগলার : নাটক : ১১ জুন ১৯৭৮

এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

'অগ্রদূত' রচিত—"স্মাগলার" ১৯৭৮

পরিচালনায়—নদীয়া জাগ্রত অপেরা। ১১ই জুন, রবিবার, রাত্রি ৭ ঘটিকায়

স্থান—নদীয়া বামন পাড়া নির্দেশনায়—মানস রায়

● অভিনয়াংশে আছেন ●

সুহাস চ্যাটার্জী, অলোক কুমার, দীপক দাস, মাঃ দেবব্রত, তরুণকুমার, তপনকুমার, সুজিৎ রায়, মৃণালকান্তি রায়, প্রিয়বাস চ্যাটার্জী, ভূপেন দাস, কমল ব্যানার্জী ও অঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

চরিত্র লিপি

সত্যেন ঘোষাল—(ধনী সমাজ সেবী)
মিহির—(ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র)
ভবেন—(ঐ মধ্যম পুত্র)
ভাস্কর—(ঐ কনিষ্ঠ পুত্র)
রসিকলাল—(ঐ কর্ম্মচারী)
অনাদি—(মোসায়েব)
হরিপদ রায়—(স্কুল মাষ্টার)
শুভেন্দু—(বেকার শিক্ষিত যুবক)
পটল—(স্মাগলার)
ঘোৎনা—(ঐ)
শাহ আলম—(আফগারী ইনস্পেকটর)
ললিত মুখার্জী—(সত্যেনবাবুর শ্যালক) হেড মাষ্টার

প্রথম অংক

(প্রথম দৃশ্য)
[সত্যেন বাবুর বৈঠকখানা]
সত্যেন, হরিপদ, অনাদি, ললিত, মিহির, ভবেন, শাহ আলম, পটল।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)
[পথ]
হরিপদ, শুভেন্দু, ভাস্কর, পটল, ঘোৎনা, রসিকলাল, শাহ আলম, ভবেন।

(তৃতীয় দৃশ্য)
[বারোয়ারী তলা]
ভবেন, মিহির, ললিত, অনাদি, শাহ আলম, শুভেন্দু, ভাস্কর; সত্যেন, রসিকলাল, হরিপদ।

(চতুর্থ দৃশ্য)
[পথ]
পটল, ঘোৎনা, অনাদি, হরিপদ, শুভেন্দু, ভাস্কর, ভবেন, ললিত, শাহ আলম।

দ্বিতীয় অংক

(প্রথম দৃশ্য)
[ভাস্করের ঘর]
ভাস্কর, ললিত, মিহির, সত্যেন, অনাদি।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)
[থানা]
শাহ আলম, পটল, ঘোৎনা, ভবেন, হরিপদ, শুভেন্দু, সত্যেন, অনাদি।

(তৃতীয় দৃশ্য)
[সত্যেন ঘোষালের বাড়ী]
ভাস্কর, মিহির, সত্যেন, অনাদি, রসিকলাল, ললিত, শাহ আলম, হরিপদ, শুভেন্দু, পটল ও ঘোৎনা

ব্যবস্থাপনায়—সুমিত রায়, কল্লোল রায়, বিরঞ্জন চ্যাটার্জী ও রঞ্জন রায়।

তৎসহ শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত—

পরিচালনায়—মহিলা সমিতি নির্দেশনায়—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

সোনাই দীঘি

যাত্রানুষ্ঠান : জাগৃহি : ৩০ সেপ্টেম্বের ১৯৯০

রচনা : ব্রজেন্দ্র কুমার দে

স্মারক : নীরোজ চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : অখিল পাল

অংশ গ্রহণে :

গোপীবল্লভ রায় তাপস চট্টোপাধ্যায় অখিল পাল গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজু রায়
তারক রায় পবিত্র রায় অনিল পাল বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য শম্ভু পাল অরুণ রায়
রবীন মণ্ডল সুবিকাশ রায় তপন মুখোপাধ্যায়
পাপয়িা রায় পম্পা পাল গায়ত্রী দত্ত দীপালী দালাল

মীরার বঁধুয়া

১৯ অক্টোবর ১৯৯১

রচনা : সত্যপ্রকাশ দত্ত

নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে :

সুবিকাশ রায় গোপাল মুখোপাধ্যায় সুভাষ মণ্ডল পবিত্র কুমার রায় গোপীবল্লভ রায়
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তাপস চট্টোপাধ্যায় রবীন মণ্ডল অখিল পাল অরুণ রায়
শঙ্কর সরকার প্রশান্ত খাঁড়া তপন মুখোপাধ্যায় শম্ভু পাল ধীমান দাশ
পম্পা পাল অর্পনা দত্ত অপর্ণা বসু বেবী ও বিন্দুরাণী

রিক্সাওয়ালা

যাত্রাপালা : জাগৃহি : ৮ অক্টোবর ১৯৯২

স্মারক : নীরজ চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ে :

অসীম মুখোপাধ্যায় তাপস চট্টোপাধ্যায় অনিল পাল শঙ্কর সরকার
সুভাষ মণ্ডল জটাধর পাল অরুণ রায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সুবিকাশ রায়
শম্ভুনাথ পাল অখিল পাল অপন মুখোপাধ্যায় রবীন মণ্ডল
সান্ত্বনা রায় পবিত্র রায় তরুণ ভট্টাচার্য লাল্টু রায়
পম্পা পাল মিস বেবী অপর্ণা বসু পাপিয়া রায়

বিচার : কালোরক্ত : ৮-১০-১৯৯২

শিল্পী পরিচিতি

নাটক : বিচার

অভিনয়ে–

অসীম মুখোপাধ্যায়

শম্ভু পাল (বড়)

শম্ভু পাল

ও

তারক রায়

নাটক : কালোরক্ত

অভিনয়ে–

বিশ্বজিৎ দাশ

চিন্ময় মিশ্র

শ্যামসুন্দর ঘোষ

উজ্জ্বল রায়

শ্যামসুন্দর দাশ

সুমিত মুখার্জী

মানস মণ্ডল

সুদীপ্ত রায়

রাজেশ চ্যাটার্জী

শম্ভু পাল

ও

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়ে ও নামভূমিকার :

রণজিত্ রায়

পূজামণ্ডপ সজ্জা : স্বপন সরকার ও সম্প্রদায়

আলো : রঞ্জন রায়

প্রতিমা : মলয় মণ্ডল

মহাবিদ্যা

নাটক : **১৫** অক্টোবর **১৯৯৪**
রচনা : মনোজ বসু
পরিবেশনা : জাগৃহি
অভিনয়ে :
সান্ত্রী : তপন মুখোপাধ্যায়
তুলসী : শম্ভু পাল
দেওয়ান : উজ্জ্বল রায়
গৌরহরি : চিন্ময় মিশ্র
কোতোয়াল : তারক রায়
রাজা : রণজিৎ রায়
সম্পাদনা : নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহণে : অরুণ মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচূড়ার রং লাল

নাটক : **১৫** অক্টোবর **১৯৯৪**
রচনা : সুধাংশু দাশগুপ্ত
পরিবেশনা : জাগৃহি
চরিত্র চিত্রণে :
কল্যাণ : সন্দীপ রায়
সন্তু : রাজীব রায়
ডা. ঘোষ : ইন্দ্রনাথ সেন
ইনস্পেকটর : রাজেশ চ্যাটার্জি
ইদ্রিস : সুদীপ্ত রায়
অরুর ভূমিকায় : সুবর্ণা রায়
সম্পাদনা : নির্দেশনা : বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শুকশারী

* * * বিশেষ আকর্ষণ – মঞ্চে দ্বিতল বাড়ি * * *
নাটক : ২৩ অক্টোবর ১৯৯৬
রচনা : মনোজ মিত্র
নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়
প্রযোজনা : জাগৃহি
আলো : অনিল মুখার্জি ও কুমার রাজেশ
মঞ্চ : শ্যামল চট্টোপাধ্যায়
আবহ সঙ্গীত : সাগর সেন
চরিত্রলিপি :
কর্তা : নির্ম্মল দাশ
জিতেন ডাক্তার : পবিত্র রায়
কানাই : ইন্দ্রনাথ সেন
শ্যামল : উজ্জ্বল রায়
অরূপ : তপন মুখোপাধ্যায়
বড় খোকা : বিশ্বনাথ সরকার
ছোট খোকা : রাজীব রায়
রামদেও : জটাধর পাল
পেল্লাদ : ইন্দ্রজিৎ হাজরা
গিন্নি : কুমারী জবা মণ্ডল
বকুল : শ্রীমতী সুবর্ণা রায়
ব্যবস্থাপনায় : সাহেব ভাই ও জাগৃহি সংঘের সভ্যবৃন্দ

ডাক্তার

যাত্রাপালা

১৬ অক্টোবর ১৯৯৪ : জাগৃহি শারদোৎসব : দ্বাদশী

রচনা : চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়

সংগীত, সংযোজনা ও নির্দেশনা : বিভাষ চট্টোপাধ্যায়

সাজ বাদ্য আলো ও ধ্বনি : সারদা সাজঘর, বসিরহাট

স্মারক : মানস রায়

অভিনয়ে :

মহীতোষ চৌধুরী	দেবীনগরের জমিদার	গোপীবল্লভ রায়
অনিমেষ	ঐ পুত্র	শঙ্কর সরকার
বটব্যাল	ঐ ভৃত্যরূপী দেওয়ান	অরুণ রায়
ব্রজেশ্বর	আরোগ্য নিকেতনের ডাক্তার	পবিত্র রায়
চতুর্মুখ	ঐ কম্পাউন্ডার	শম্ভু পাল
নরেন ঘোষ	গ্রামের ছেলে	তপন মুখোপাধ্যায়
বিপ্লব	পলায়িত বিপ্লবী	বিভাষ চট্টোপাধ্যায়
উপেন	পলায়িত বিপ্লবী	শ্যামসুন্দর দাশ
বরেন	পলায়িত বিপ্লবী	প্রবীর বিশ্বাস
বিপিন চক্রবর্তী	গ্রাম্য মোড়ল	তাপস চট্টোপাধ্যায়
ধীরেন মণ্ডল	ঐ	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
কালুসিং	কুখ্যাত গুণ্ডা	জটাধর পাল
ভূপেন বোস	কুখ্যাত দারোগা	অখিল পাল
নটিংহাম	ব্রিটিশ মেজর	অনিল পাল
হাবিলদার	পুলিশ	প্রবীর বিশ্বাস
প্রীতিলতা	মহীতোষের কন্যা	মিস বেবী
দিপালী	আরোগ্য নিকেতনের সেবিকা	কল্পনা দেবী
ক্ষেমঙ্করী	বিপিনের স্ত্রী	অর্পণা দেবী
ঝুমকি	বিপ্লবীদের ডানহাত	পম্পা পাল

শারদোৎসব—১৯৯৫

সাংস্কৃতিকী

বৃহস্পতিবার / ৫ অক্টোবর

সন্ধ্যা ৭.০০টায়

শ্রুতি নাটক :: পরিবেশনায়
স্বর-সপ্তক,
অম্বিকানগর

রাত্রি ৭.৪৫ টায়

শ্রুতি নাটক :: নতুন পথের যাত্রী
কাহিনী :: আশাপূর্ণা দেবী
নাট্যরূপ :: অপূর্ব নন্দী
পরিবেশনা :: জাগৃহি
নির্দেশনা :: বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়ে :: পম্পা পাল
:: শর্মিষ্ঠা রায়
অসীম মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বল রায়

রাত্রি ৮.৩০ টায়

নাটক :: সংঘাত
রচনা :: পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্দেশনা :: বিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশনা :: জাগৃহি
অভিনয়ে :: সন্দীপ রায়
:: সুবর্ণা রায়
:: রাজীব রায়
:: গার্গী রায়
মঞ্চ :: সুদীপ্ত রায়

শনিবার / ৭ অক্টোবর

রাত ৯টায় যাত্রানুষ্ঠান
:: "একটি পয়সা"

একটি পয়সা

যাত্রা : ৭ অক্টোবর ১৯৯৫

নদীয়া জাগৃহি সংঘ প্রযোজিত
সামাজিক যাত্রাপালা 'একটি পয়সা'
জাগৃহি মঞ্চ ▯ ৭ অক্টোবর '৯৫ শনিবার, রাত ৯টায়

রচনা ▯ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা ও নির্দেশনা ▯ ডাঃ সুভাষ রায়

স্মারক ▯ অলক মুখোপাধ্যায়

—: অভিনয়ে :—

ভুজঙ্গ নারায়ণ রায়	:	ভূতপূর্ব জমিদার	:	গোপীবল্লভ রায়
দীপ নারায়ণ	:	ঐ পুত্র	:	অখিল পাল
রূপ নারায়ণ	:	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র	:	তাপস চ্যাটার্জী
মি. কে. কে. ঘোষাল	:	ঐ ম্যানেজার	:	অসীম মুখার্জী
বদ্রী প্রসাদ	:	চোরাকারবারী	:	রণজিৎ রায়
হীরালাল হালদার	:	কুশীদজীবী	:	কমল ব্যানার্জী
শুভংকর চ্যাটার্জী	:	বকুলপুরের প্রজা	:	নির্মল দাশ
দিবাকর চ্যাটার্জী	:	ঐ ভ্রাতা	:	শংকর সরকার
চয়ন	:	শুভংকরের পুত্র	:	শান্তনা রায়
অশোক চ্যাটার্জী	:	কারখানার শ্রমিক	:	দ্বিপেন রায়
অলোক চ্যাটার্জী	:	ঐ ভ্রাতা (যাত্রাভিনেতা)	:	তপন মুখার্জী
মি. সেন	:	পুলিশ অফিসার	:	প্রবীর বিশ্বাস
পাগলা	:	জনৈক উন্মাদ	:	পবিত্র রায়
পাগলা কবি	:	জনৈক গায়ক	:	জয় কুমার মণ্ডল
দারোয়ান	:		:	
শবরী	:	শুভংকরের ভগ্নী	:	পুতুল ঘোষ
মৌসুমী	:	বস্তির মেয়ে	:	অঞ্জু বিশ্বাস
রাঙা বৌ	:	জেলেনী	:	রিক্তা বিশ্বাস
সুধামুখী	:	অশোকের ভগ্নী	:	পম্পা পাল

নাটক ঃ রক্তে ভেজা দেশের মাটি

অভিনয়ে ঃ ১২ - ১০ - ১৯৯৭

সুধাময় ঃ শ্রীপবিত্র রায়
শচী ঃ কুমারী জবা মণ্ডল
বিমল ঃ উজ্জ্বল রায়
ভজহরি ঃ ইন্দ্রজিৎ হাজরা
নন্দলাল ঃ অসীম মুখার্জী
হীরালাল ঃ বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
রাখহরি ঃ শম্ভু পাল
সত্যেন ঃ তারক রায়
কানাই ঃ তপন মুখার্জী
নরেন গোঁসাই ঃ শ্যাম দাশ
শ্রীশ পাল ঃ প্রবীর বিশ্বাস
জন মিলার ঃ শ্রীবিশ্বনাথ সরকার

নাটক ঃ তাহার নামটি রঞ্জনা

অভিনয়ে ঃ ১৩ - ১০ - ১৯৯৭

বিরাজ ঃ তপন মুখার্জী
পণ্ডিত ঃ তারক রায়
কৌশিক ঃ রাজীব রায়
প্রহরী ঃ সুদীপ্ত রায়
ডাক্তার ঃ বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
রঞ্জনা ঃ এণাক্ষী মুখার্জী

প্রয়াণ সারণি (অসম্পূর্ণ)

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১ কার্তিক ১৩৫১
সুশীল কুমার রায় (তরুণ রায়ের পিতা)	৮ নভেম্বর ১৯৬৬
হরিদাস রায়	৯ নভেম্বর ১৯৬৬
সুধীর ভট্টাচার্য	১৫ নভেম্বর ১৯৬৬
শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
কিশোরী মুখোপাধ্যায়	৭ মে ১৯৬৮
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৪. আগস্ট ১৯৮০
ভোলানাথ রায়	৩০ ডিসেম্বর ১৯৮০
রাসবিহারী রায়	৬ ডিসেম্বর ১৯৮১
নীলমণি রায়	১২ নভেম্বর ১৯৮৪
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	ডিসেম্বর ১৯৮৪
কালিদাস রায়	৭ জানুয়ারি ১৯৮৫
সুকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১ নভেম্বর ১৯৮৮
প্রফুল্ল ভট্টাচার্য	১২ ডিসেম্বর ১৯৮৮
ভবানীপ্রসাদ রায়	১ জানুয়ারি ১৯৮৯
পশুপতি রায়	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
গোবিন্দ রায়	১৯৮৯
যতীন্দ্রনাথ রায়	২৩ আগস্ট ১৯৯২
রমাকান্ত রায়	২১ জুন ১৯৯৪
সমর মুখোপাধ্যায়	৮ মার্চ ১৯৯৬
গোপাল মুখোপাধ্যায়	২৬ এপ্রিল ১৯৯৬
অনিল কুমার দাশ	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
ক্ষেত্রপদ রায়	১৯৯৭
অসিত রায়	১৯৯৭
প্রণব কুমার রায়	০৮ নভেম্বর ১৯৯৯
অনাথ পাল	২০০১
রাধাকান্ত রায়	২০০১
কালীপদ কাহার	২০০১

প্রয়াণ সারণি (অসম্পূর্ণ)

নাম	তারিখ
অসীম মুখোপাধ্যায়	২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
নিতাইপদ পাল	২০০৩
দুর্লভ রায়	২০০৩
সুবিকাশ রায়	২১ জানুয়ারি ২০০৪
পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়	২০০৪
কার্তিক হাজারী	২০০৪
শ্রীনাথ রায়	২০০৬
সুবিনয় রায়	২০০৬
গোপীবল্লভ রায়	৬ মে ২০০৮
গোবিনলাল মুখোপাধ্যায়	১১ মে ২০১০
দীনবন্ধু দাশ	২০১০
কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য	৬ অক্টোবর ২০১০
পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩
তাপস চট্টোপাধ্যায়	১৮ মার্চ ২০১৭
মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
সমীর (রতন) রায়	১১ মার্চ ২০১৮
শিবানী চট্টোপাধ্যায় (বিরঞ্জনের মাতা)	২৮ এপ্রিল ২০১৮
দীনেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২ ডিসেম্বর ২০১৯
গণেশ রায় (বয়স ১০১+)	২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নদিয়া গ্রামের বংশতালিকা সংগ্রহ

(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

নদিয়া গ্রামের বংশতালিকা সংগ্রহ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার নদিয়া গ্রামের
বিভিন্ন পরিবারের বংশতালিকার অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত পাণ্ডুলিপি।
গ্রামীণ ইতিহাসের লক্ষ্যে প্রাথমিক সংগ্রহ।
কেবলমাত্র ঘরোয়া বিতরণের জন্য। বিক্রয়ের জন্য নয়।
আইনগত অথবা সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী।
শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম নদিয়া, পোঃ ধান্যকুড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কর্তৃক
সংকলিত, মুদ্রিত ও বিতরিত।
২৭ ডিসেম্বর ২০১৮

নদিয়া গ্রামের বংশতালিকা সংগ্রহ

(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

কৈফিয়ত

চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার তথা সাবেক বালিয়া পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম নদিয়া । নদিয়া গ্রামের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের প্রয়াসের একটি পর্যায় হল নানা পরিবারের বংশতালিকা সংকলন । এই সংকলনটি চূড়ান্ত নয় , একটি প্রয়াসের এটি ভিত্তি মাত্র । পরবর্তীকালে যোগ্যতর ব্যক্তিদের দ্বারা এর সংশোধন ও ক্রমাগত পরিবর্ধন ঘটবে এ প্রত্যাশা নিয়েই এই অভিনব সংকলনের উদ্যোগ ।

অল্প কয়েকটি পরিবারের প্রাচীন অংশের লিখিত কুলজি পাওয়া গেছে । হিমাংশু কুমার রায়ের সৌজন্যে রায় পরিবারের বিস্তৃত কুলজি পাওয়া গেছে , যা ১৮৮০-৯০ সালের লেখা , প্রাচীন আদলের হস্তাক্ষর । শতায়ুপ্রায় প্রবীন গ্রামবাসী মোঃ জোহর আলি মহাশয় তাঁর আশ্চর্যজনক স্মৃতি থেকে বহু তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহের কাজে বহু মানুষ সানন্দে সহযোগিতা করেছেন, যাদের মধ্যে আছেন - সুনীল কাহার , তপন খাঁড়া , অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় , ছায়ারাণী চট্টোপাধ্যায় , সন্তোষ দাশ , শ্রীকুমার দাশ , ধনঞ্জয় দাশ , যমুনাবালা দাশ , অবনীকান্ত পাল , অখিল পাল , গণেশ পাল , বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য , বাবলু ভট্টাচার্য , সুকৃতিরঞ্জন মণ্ডল , অজিত মণ্ডল , ভবানীপ্রসাদ মণ্ডল , বুদ্ধদেব মণ্ডল, রূপেন মণ্ডল, নারায়ণ মণ্ডল, গোবিনলাল মুখোপাধ্যায়, মোঃ আবদুর রসিদ, মোঃ বারিক মণ্ডল, মোঃ আবদুল মজিদ, মোঃ আবদুর রহিম, মোঃ আরশাদ মণ্ডল, মোঃ নুর ইসলাম বিশ্বাস, মোঃ আবদুল হাফিজ, মোঃ নজরুল ইসলাম, গণেশ রায়, জগবন্ধু রায়, সুবিকাশ রায়, রাজকুমার রায়, লক্ষীকান্ত রায়, পবিত্র রায়, শংকরলাল সরকার, মদনমোহন সেন, জগবন্ধু হাজারী, চিত্তরঞ্জন হাজরা, প্রশান্ত হাজরা ও আরো অনেকে । এই কাজে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন জয়ন্ত দাশ ।

এটি প্রাথমিক সংগ্রহ । কেবলমাত্র ঘরোয়া বিতরণের জন্য । বিক্রয়ের জন্য নয় । মূলত মৌখিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংকলিত এই তথ্য সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী ।

নদিয়া গ্রামের বংশতালিকার এই সংকলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও অনেক ত্রুটি থাকতে পারে - যার সম্পূর্ণ দায় কেবলমাত্র সংকলকের।

সূচি প রি বা র পৃষ্ঠা

নদিয়া গ্রামের কাহার পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
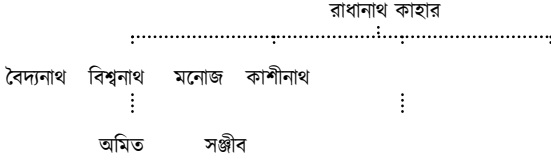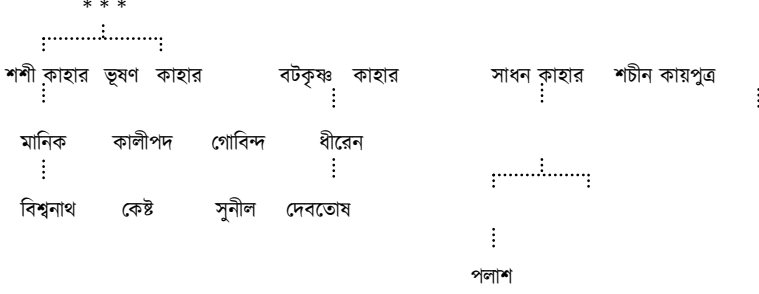
নদিয়া গ্রামের খাঁড়া পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
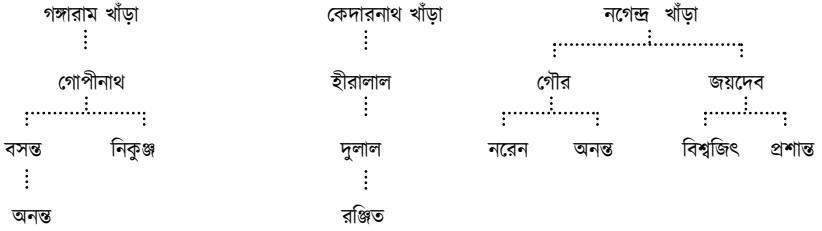
নদিয়া গ্রামের ঘটক পরিবারের বংশতালিকা
(অ-নিবাসী পরিবার) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

অমূল্য ঘটক

পঞ্চানন বাদল সুকুমার

নদিয়া গ্রামের ঘোষাল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

ভূপাল ঘোষাল (কলকাতা)

জবা ঘোষাল

নদিয়া গ্রামের ঘোষ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

মতিলাল ঘোষ

মহেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ

দুলাল কৃষ্ণকিশোর কমলকৃষ্ণ মায়ারানী

অচিন্ত্য অঞ্জন লক্ষী পদ্মা অসীম মদনমোহন শ্যামলী শ্যামসুন্দর মধুমিতা

পিয়ালী মাম শ্রেয়া বিদিশা তৃষা অন্বেষা তিয়াসা

নদিয়া গ্রামের অঞ্জন চক্রবর্তী পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্ব নিবাস ফরিদপুর জেলা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন

অঞ্জন রত্না বিপ্লব

নদিয়া গ্রামের অরুণ চক্রবর্তী পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

শান্তি চক্রবর্তী

অরুণ অমিত

নদিয়া গ্রামের দত্ত পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

কৃষ্ণলাল দত্ত

অচিন্ত্য

চঞ্চল অঞ্চল

নদিয়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আংশিক বংশতালিকা (পূর্ব নিবাস বর্ধমান জেলা) ১/৩
(বিভাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অংশ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আংশিক বংশতালিকা (পূর্ব নিবাস বর্ধমান জেলা) ২/৩
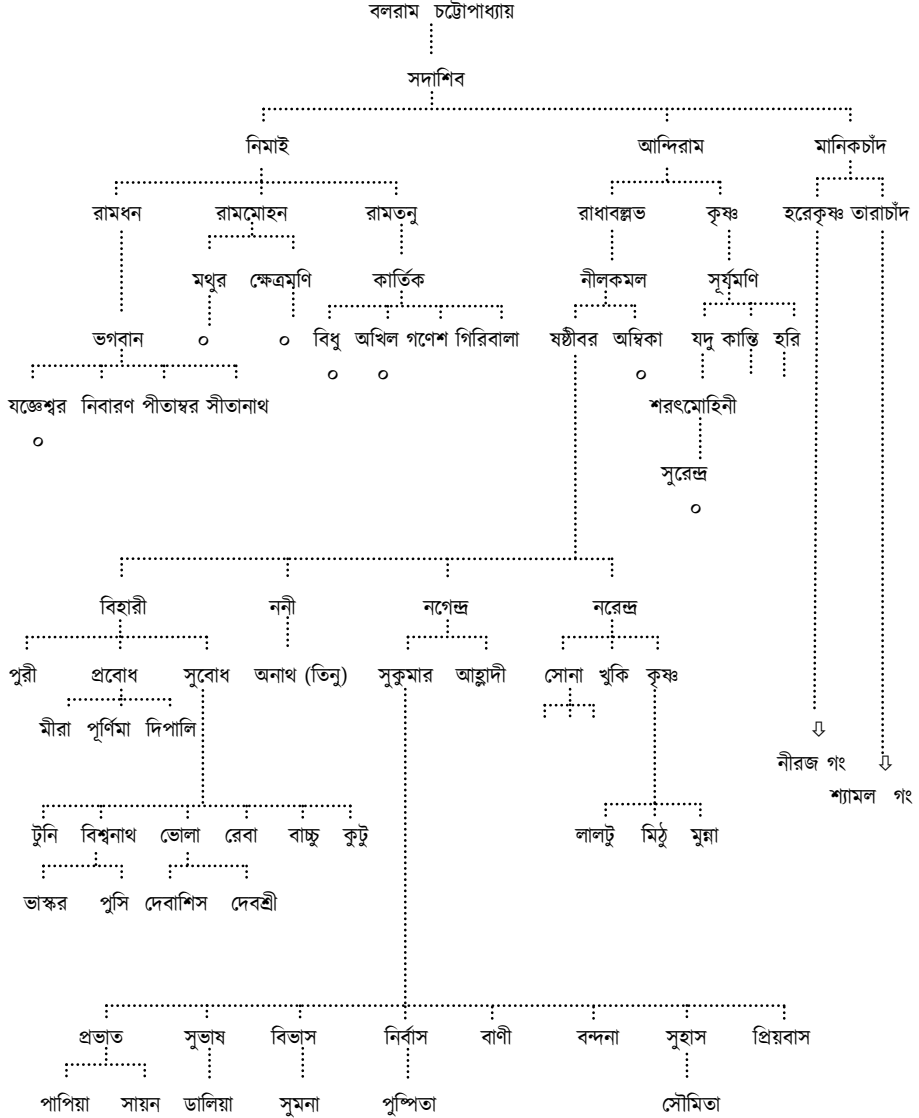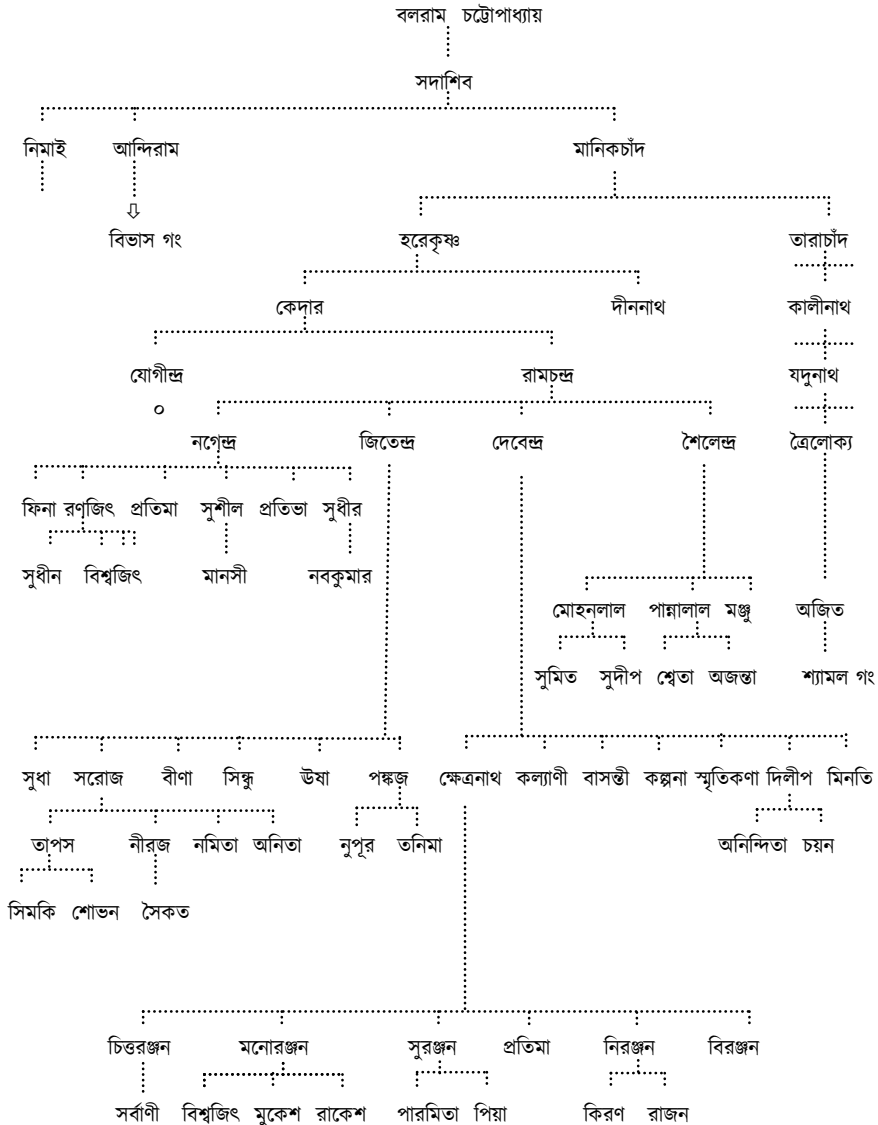
(নীরজ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অংশ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আংশিক বংশতালিকা (পূর্ব নিবাস বর্ধমান জেলা) ৩/৩
(শ্যামল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অংশ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
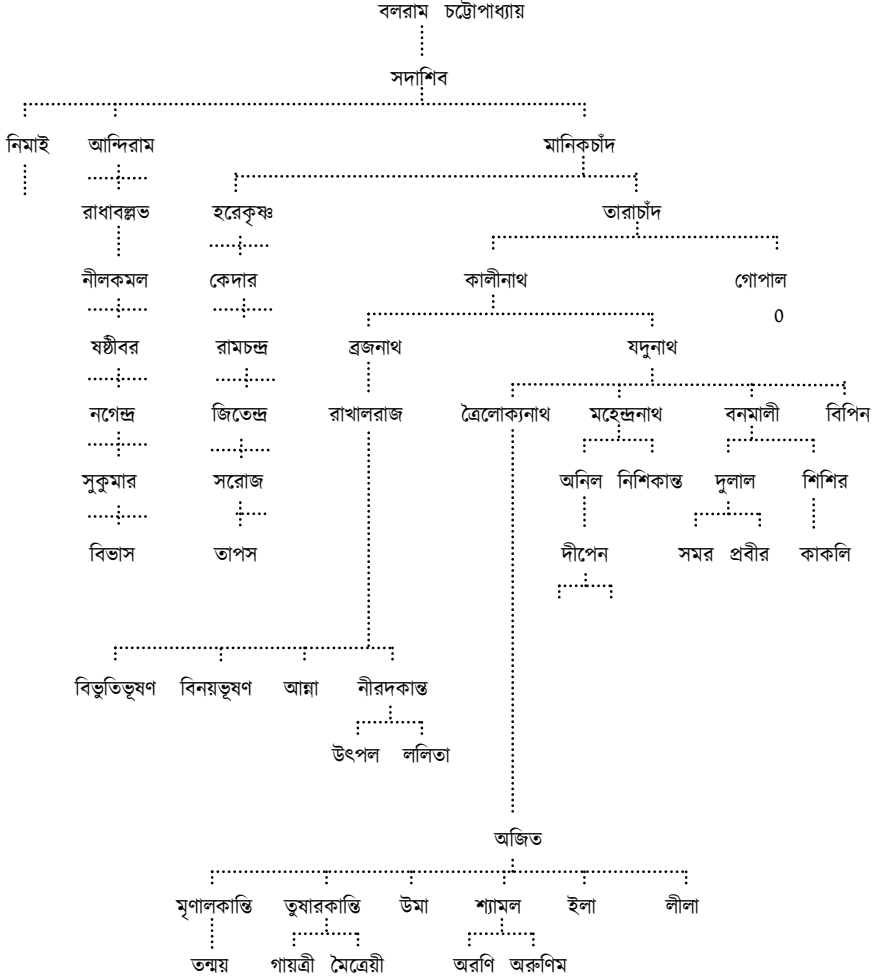
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম-পাড়া কালাচাঁদ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্ব নিবাস বেড়্গুম) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
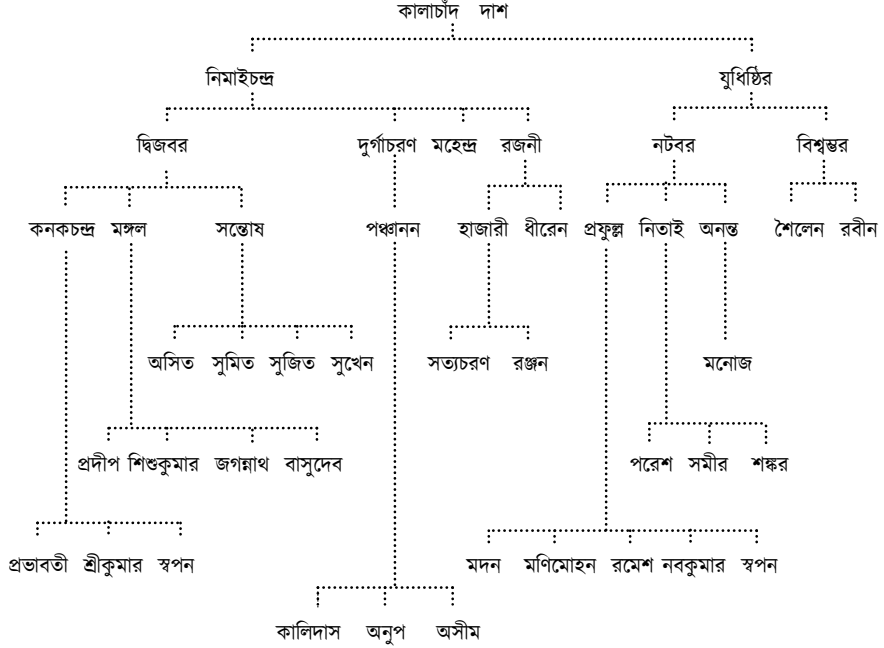
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম-পাড়া গোবিন্দচন্দ্র দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
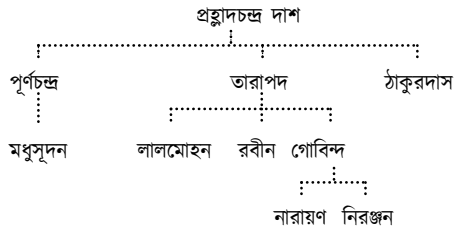
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
হরেন দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
মতিলাল দাশ
হরেন
সতীশ
প্রণব
অরুণ
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
অশোক দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
উপেন্দ্রনাথ দাশ
অশোক
চিত্তরঞ্জন
তপন
দিলীপ
উজ্জ্বল
প্রোজ্জ্বল
কন্যা
শোভন
চন্দন
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
বসন্ত দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
বসন্ত দাশ
প্রমথ
দাশরথি
স্বপন
তাপস
দীপক
প্রদীপ
মাতঙ্গিনি
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
নিমাই (তুফান) দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
কেবলরাম দাশ (গোদাঘাটা, নদিয়া জেলা)
লালচাঁদ
মহাভারত
বরদা
নিমাই (তুফান)
স্বপন
মাধব
সুনয়ন
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া ফণীভূষণ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
প্রাণনাথ দাশ
ফণীভূষণ
দেবেন
মনোরঞ্জন
হরিদাস
শংকর
দেবব্রত
সুব্রত
তুলসী
বিমান
শ্যামসুন্দর
ধীমান
গৌতম
জয়ন্ত
সুশান্ত
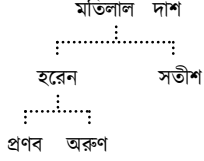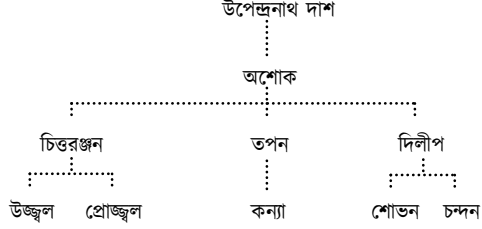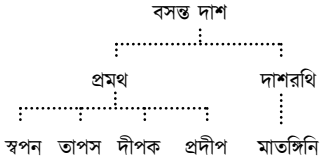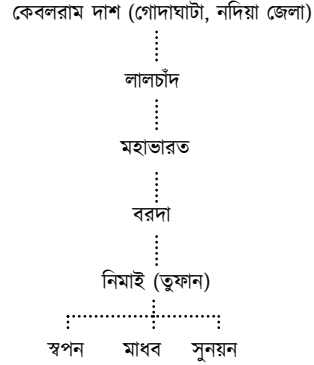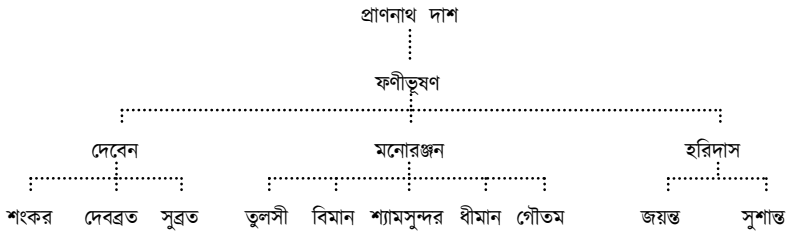
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া অন্যান্য দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া জানকী দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অ-নিবাসী পরিবার) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া ধনঞ্জয় দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

⇩
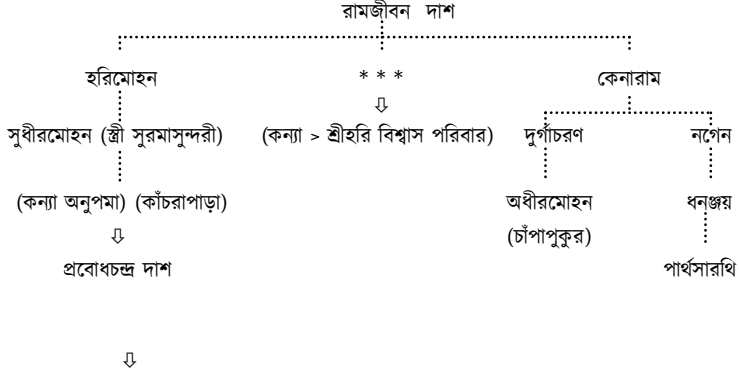
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
প্রবোধচন্দ্র দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

প্রবোধচন্দ্র দাশ

জয়দীপ প্রদীপ প্রবীর সুবীর ডালিয়া
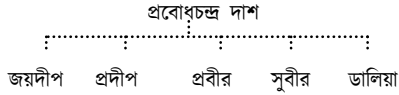
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
আশুতোষ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
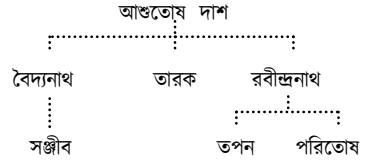
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
খগেন্দ্রনাথ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
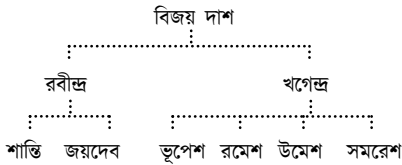
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
বামাপদ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া কালীপদ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
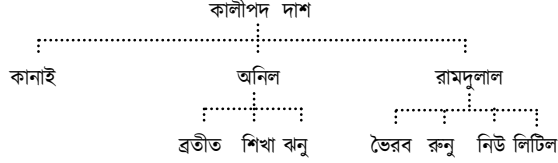
নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া গদাধর দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
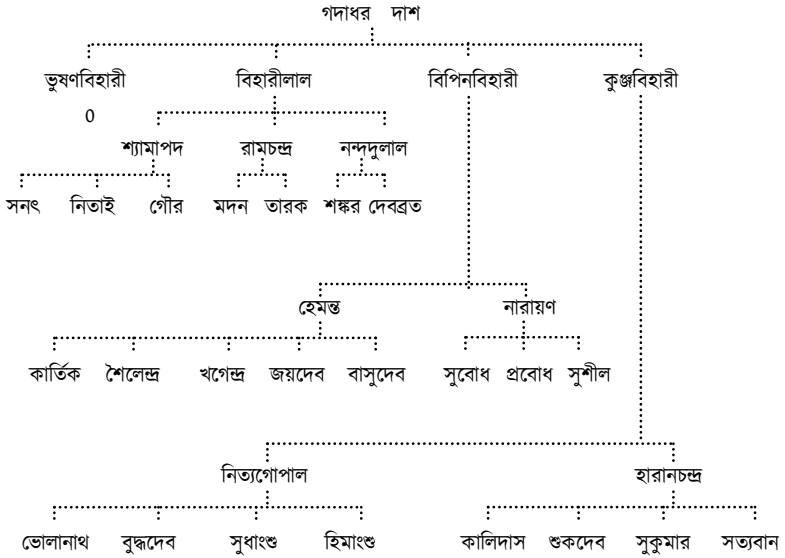
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া সত্যচরণ দাশ পরিবারের বংশতালিকা

নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া হাজারীলাল দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(কোটা মদনপুর, বনগাঁর রামসদন দাশের বংশ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
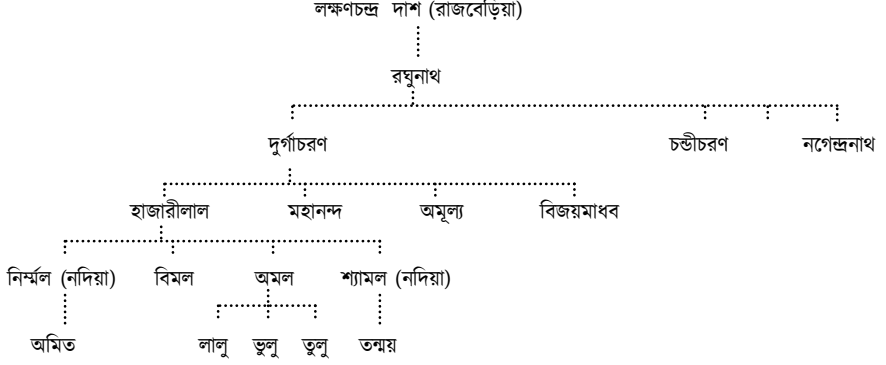
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া জগদীশ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া
নারায়ণ দাশ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত) (অ-নিবাসী পরিবার)
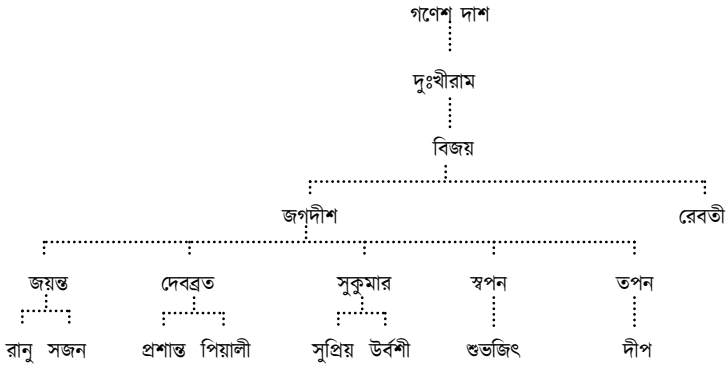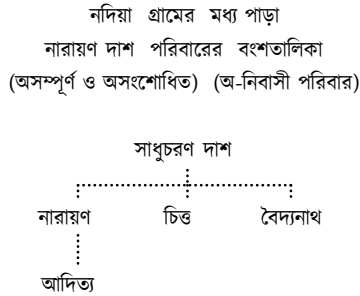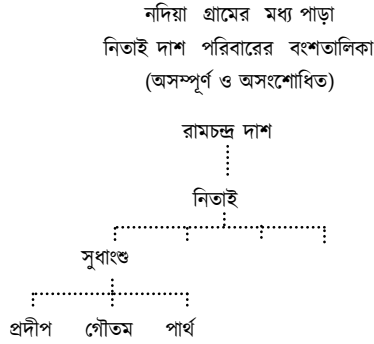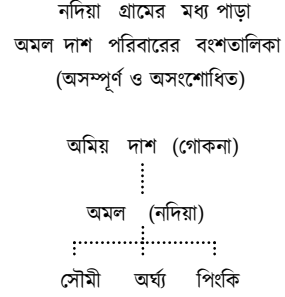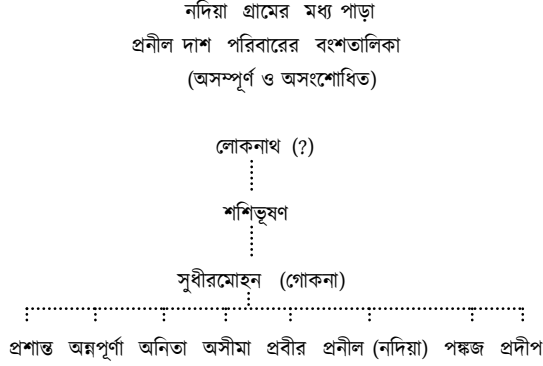
নদিয়া গ্রামের ধাড়া পরিবারের বংশতালিকা
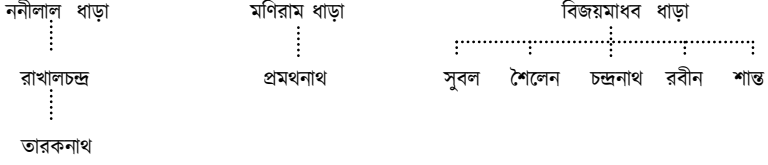
নদিয়া গ্রামের দীনবন্ধু নায়েক পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
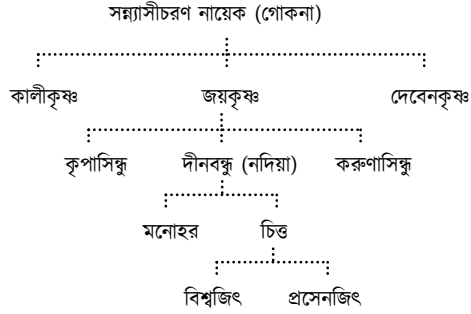
নদিয়া গ্রামের নিতাই নায়েক পরিবারের বংশতালিকা (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
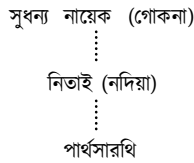
নদিয়া গ্রামের বনমালী পাল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
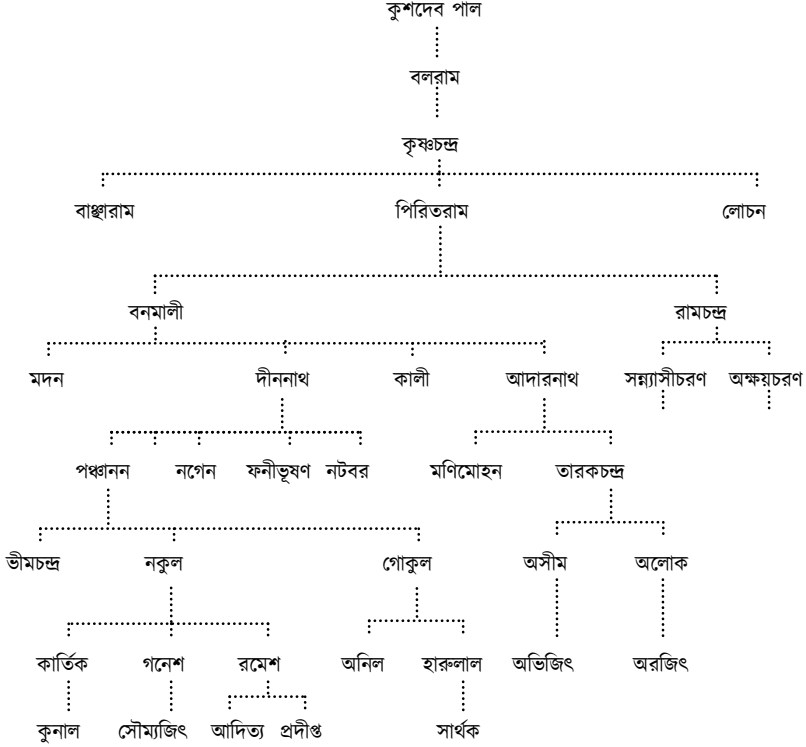
নদিয়া গ্রামের রামচন্দ্র পাল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের ঠাকুরদাস পাল পরিবারের বংশতালিকা

(পুর্বনিবাসঃ বিশ্বনাথপুর / দেগঙ্গা থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের নরেন্দ্রনাথ পাল পরিবারের বংশতালিকা

(পুর্বনিবাস গোপালপুর) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
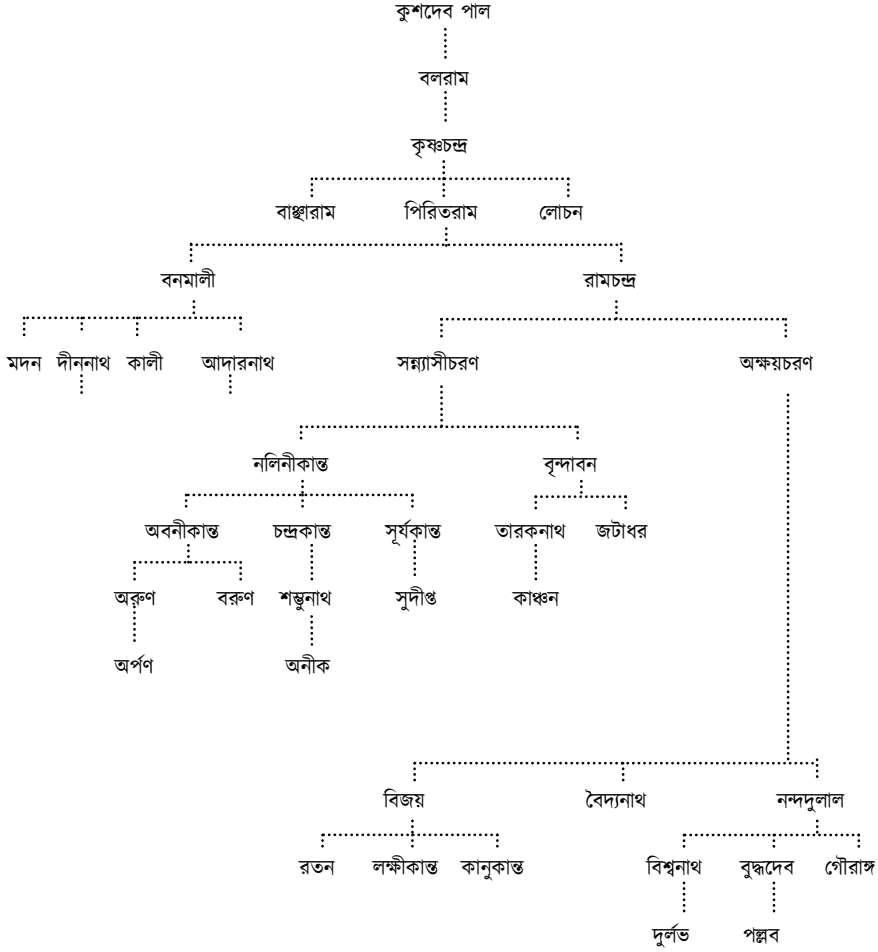
নদিয়া গ্রামের অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্বনিবাসঃ গ্রাম চন্দ্রভাগ / থানা বাগনান / জেলা হাওড়া)
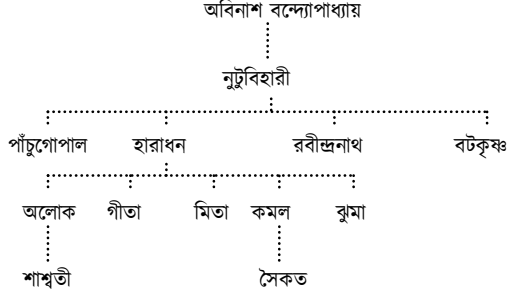
নদিয়া গ্রামের অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্বনিবাসঃ দক্ষিণ শ্রীপুর , সাতক্ষীরা) (অ-নিবাসী পরিবার)
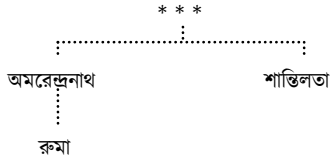
নদিয়া গ্রামের সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশতালিকা
(অ-নিবাসী পরিবার)
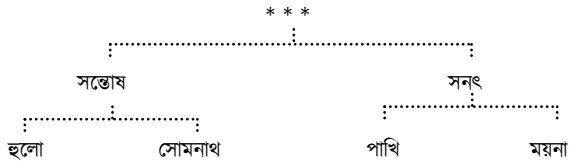
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
শ্রীহরি বিশ্বাস পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
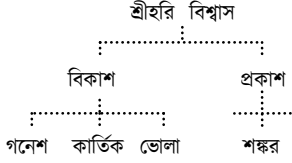
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া (রজক পাড়া)
বিশ্বাস পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
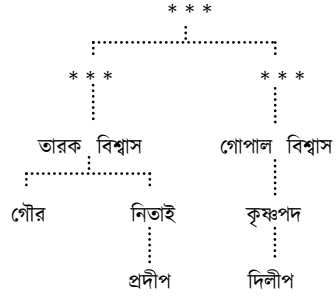
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া অন্যান্য বিশ্বাস পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া বিশ্বাস পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
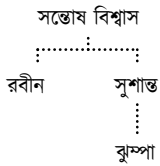
নদিয়া গ্রামের মহেশ ভট্টাচার্য পরিবারের বংশ-তালিকা
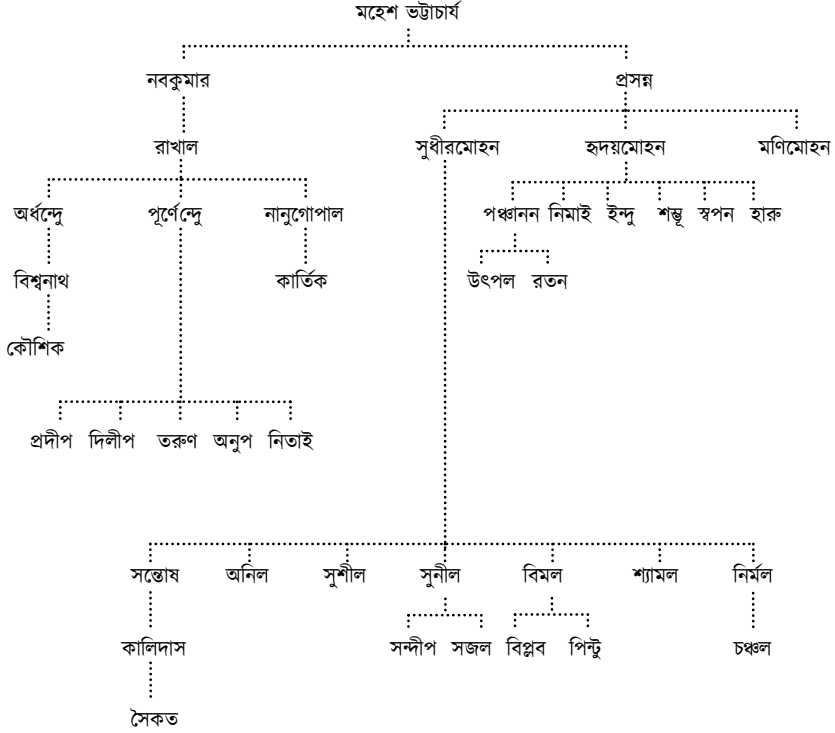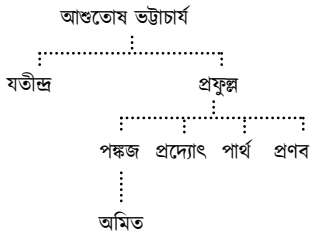
(পুর্বনিবাস গোপালপুর) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য পরিবারের বংশতালিকা
[পূর্ব নিবাস রানি ডাঙ্গা (রাঘবপুর), হাবরা থানা] (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
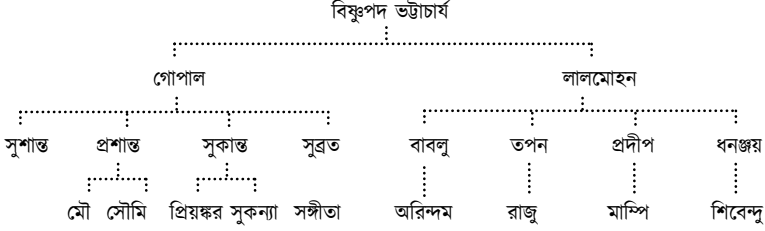
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া সুনীল মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
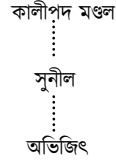
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া বিশ্বনাথ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
পূর্বনিবাসঃ টালা / কলকাতা (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
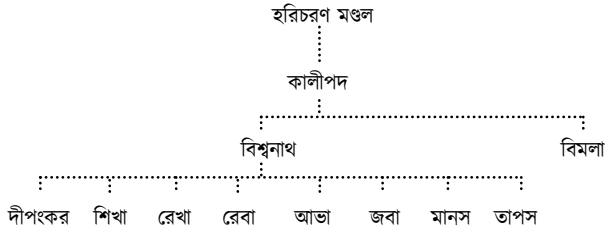
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া বৈষ্ণবচরণ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
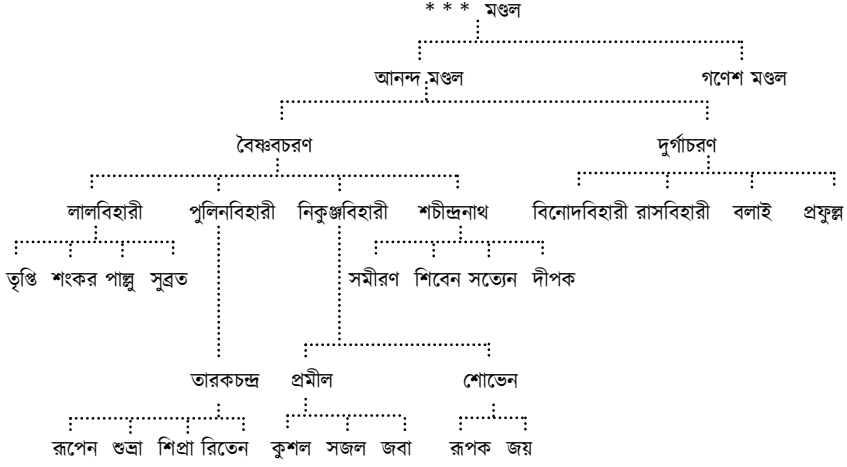
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া সুকল্যাণ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
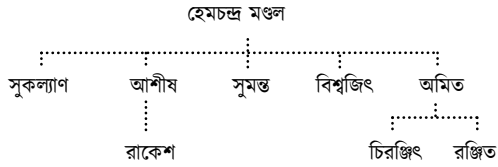
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্বনিবাসঃ উড়িষ্যা রাজ্য / অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
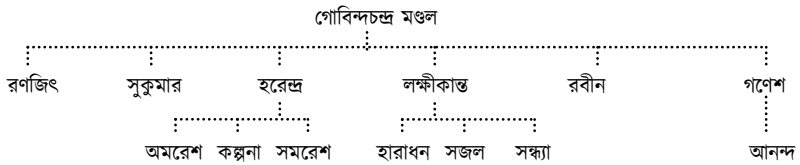
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া সীতানাথ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
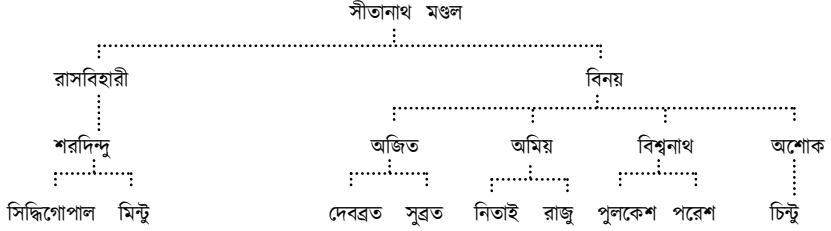
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া হলধর মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা ১/২
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
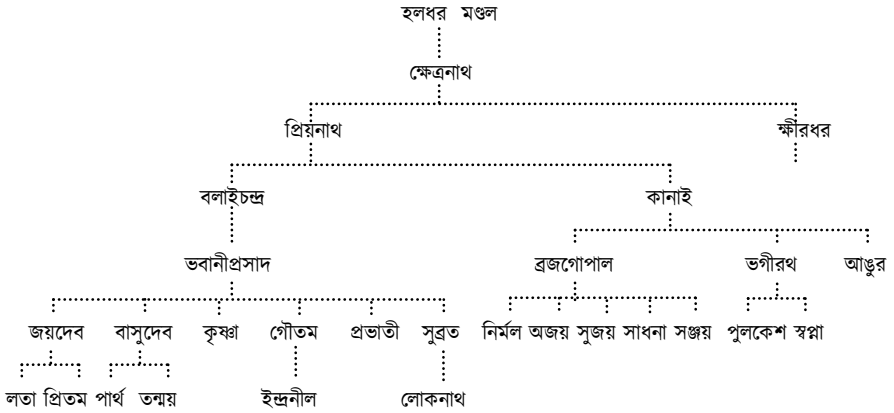
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া হলধর মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা ২/২
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
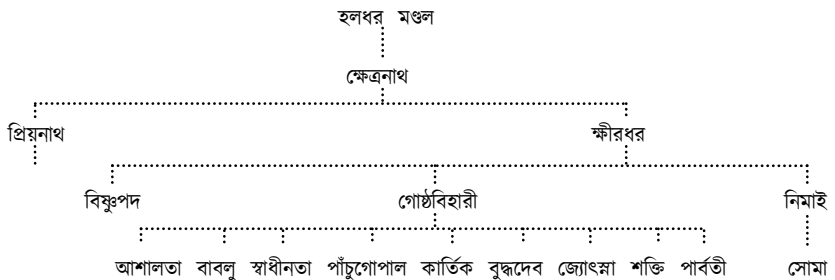
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া কুঞ্জবিহারী মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
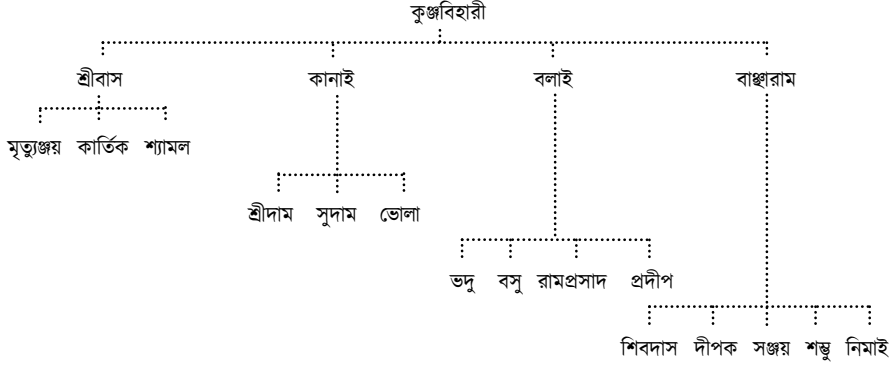
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া রাধানাথ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া সীতানাথ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
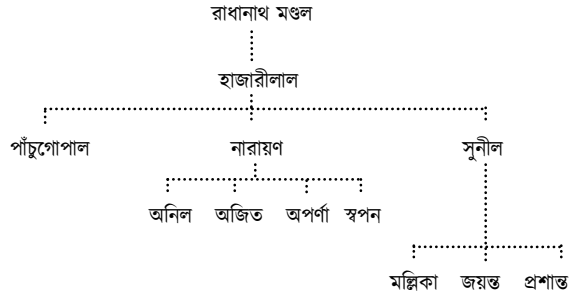
নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া
আশুতোষ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
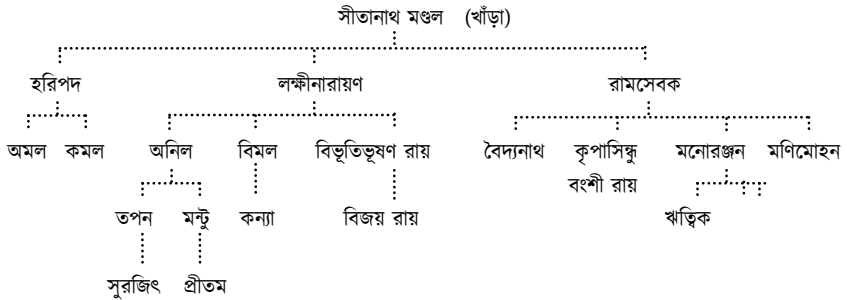
নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া
সুভাষ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া কৃষ্ণপদ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া সুশান্ত মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের টিকারী (মণ্ডল) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১/২
(আদি নিবাস বিহার রাজ্য । বিহারের (গয়া) টিকারী মহারানীর বংশ)
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
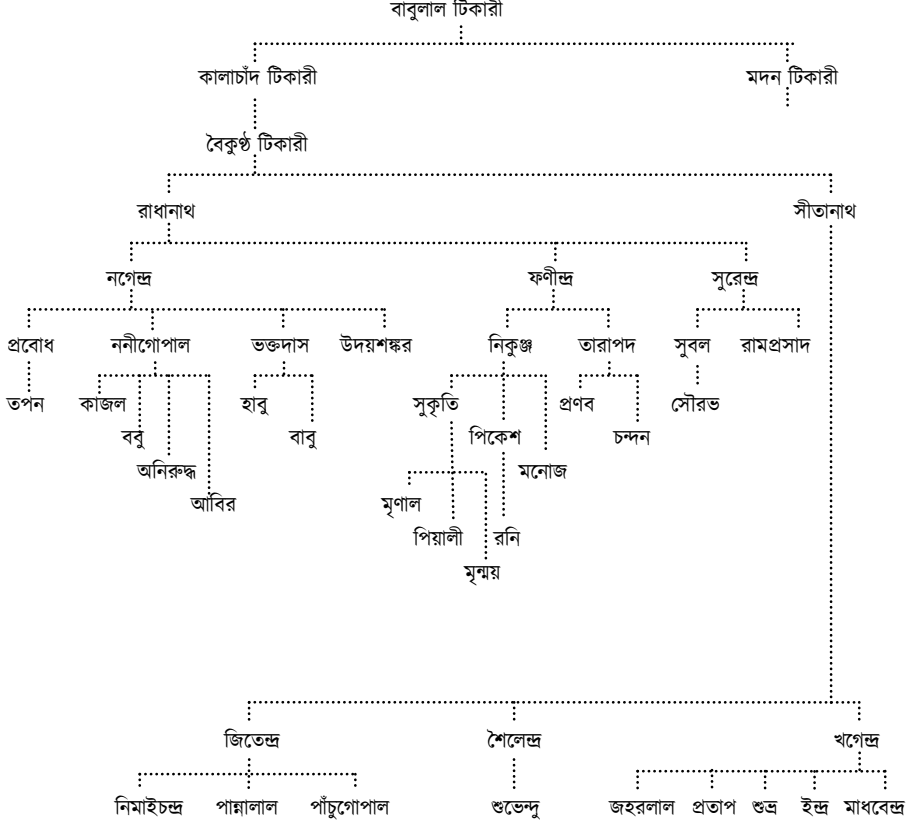
নদিয়া গ্রামের টিকারী (মণ্ডল) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ২/২
(আদি নিবাস বিহার রাজ্য। বিহারের (গয়া) টিকারী মহারানীর বংশ)
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
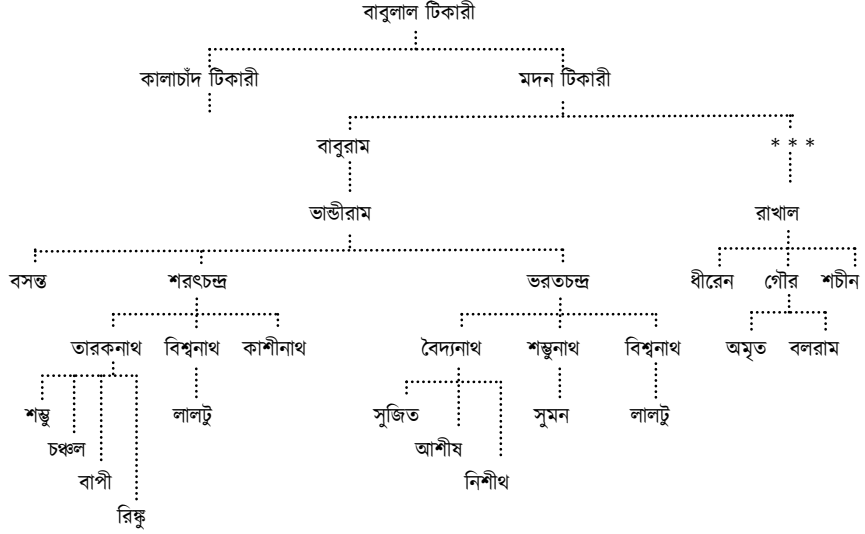
নদিয়া গ্রামের মাসচটক পরিবারের বংশতালিকা
(বারাসত প্রবাসী)

নগেন্দ্র মাসচটক (উকিল / বারাসাত)

ডাঃ দিলীপ মাসচটক

নদিয়া গ্রামের কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ পরান মণ্ডল পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১/৪
(পুর্ব নিবাস কালোপুর / বনগাঁ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
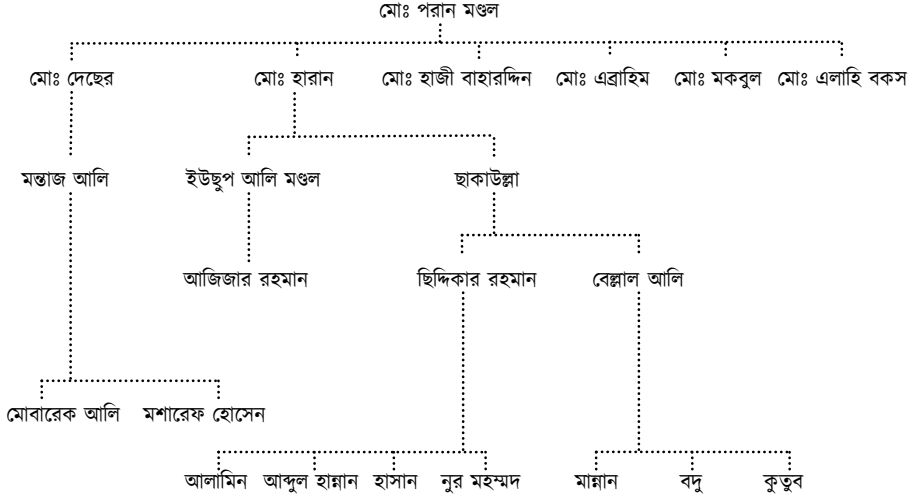
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ পরান মণ্ডল পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ২/৪
(পুর্ব নিবাস কালোপুর / বনগাঁ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
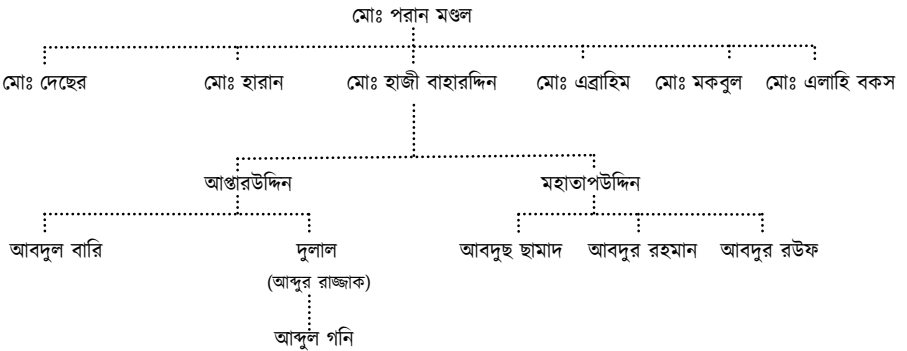
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ পরান মণ্ডল পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৩/৪
(পুর্ব নিবাস কালোপুর / বনগাঁ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
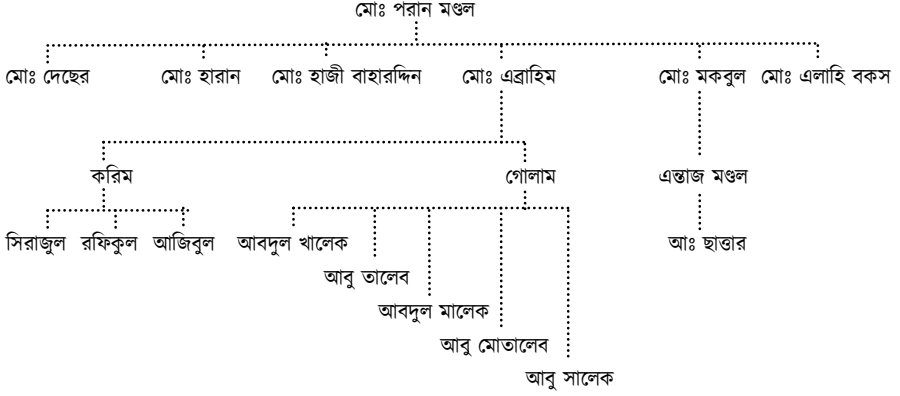
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ পরান মণ্ডল পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৪/৪
(পুর্ব নিবাস কালোপুর / বনগাঁ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
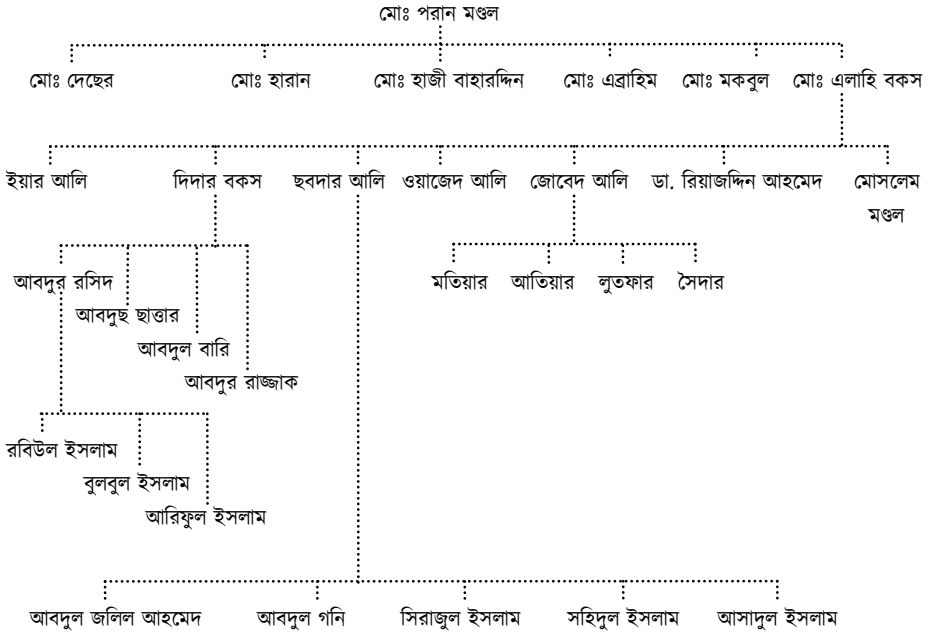
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ বনমালী মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
মোঃ বনমালী মণ্ডল
মোঃ বিশু মণ্ডল
মোঃ ভোলাই মণ্ডল
মোঃ হাজের (ছোট)
মোঃ মহম্মদ আলি
মোঃ সাহাদাত
মোঃ আহমদ আলি
মোঃ খোদা বকস
(নাতিঃ > মোঃ আলাউদ্দিন সরদার)
আনছার আলি মণ্ডল
মাওলা বকস
আয়ুব আলি (দুখে)
ছুরাত আলি
আবদুল কাসেম
আবুল হোসেন
মোস্তফা
রোস্তম
সৈয়েদ আলি
নুর ইসলাম
আবদুল আজিজ
আবদুল লতিফ
সাহাজান
হুমায়ুন
গফুর
আবদুল নঈম
সফিক
রফিক
ছাবির

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
মোঃ আলাউদ্দিন সরদার পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস নন্দীপাড়া / বেড়াচাঁপা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
মোঃ হাজের (ছোট)
জামাইঃ > মোঃ মেপতা সরদার
মোঃ আলাউদ্দিন সরদার
হাবিউল্লা
হাফিজুল
আলিমুল্লা
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
মোঃ ওমেদালি পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
মোঃ ওমেদালি
রহমতুল্যা
মোকছেদ আলি
কাছেদ আলি
আপ্তার

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ হাজের আলি (বড়) পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্বনিবাস চৌরাশি ঢালি পাড়া) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
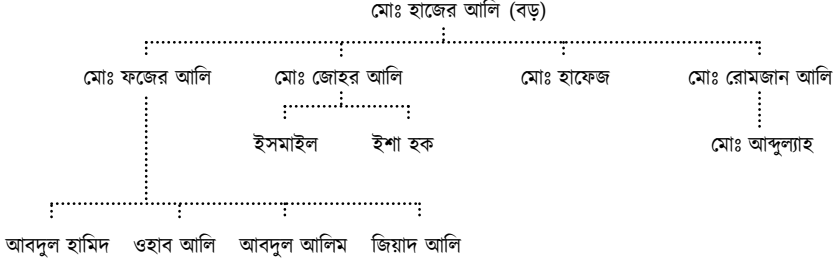
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ কেতাব আলি পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
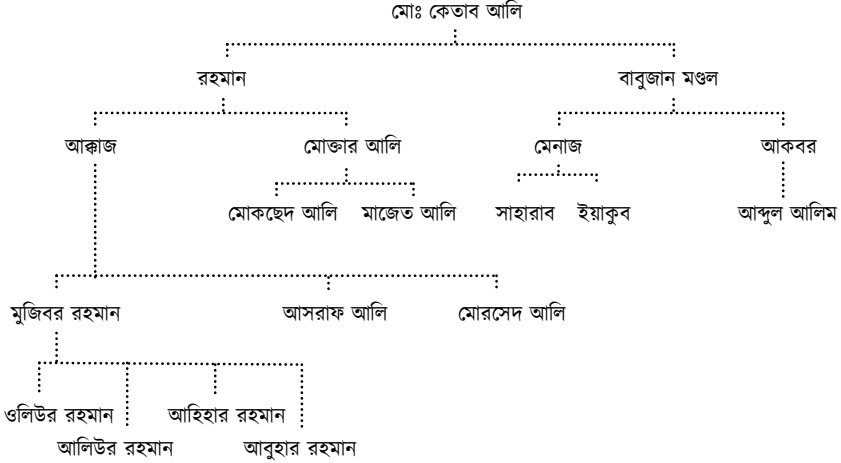
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া মোঃ কালাচাঁদ পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের উত্তর পাড়া মোঃ মেনাজদ্দিন মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের উত্তর পাড়া মোঃ ছমিরদ্দিন মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের উত্তর পাড়া
মোঃ কুদরোতুল্ল্যা মণ্ডল পরিবারের বংশ-তালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের উত্তর পাড়া
মোঃ অজেদ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাসঃ উত্তর শেরপুর / বাদুড়িয়া থানা)
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
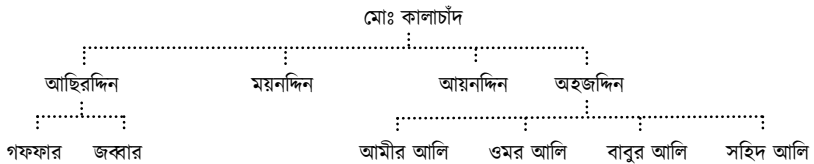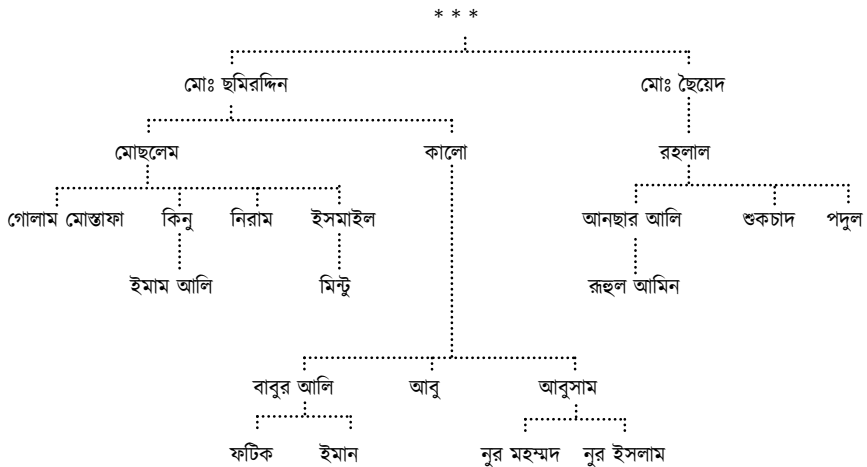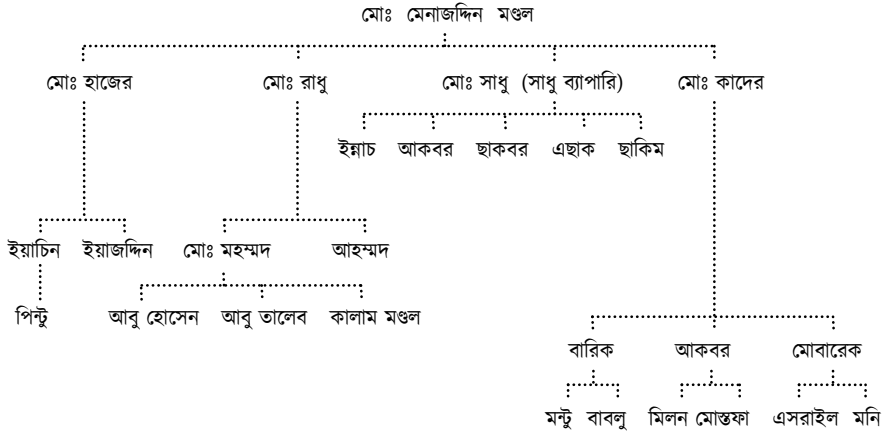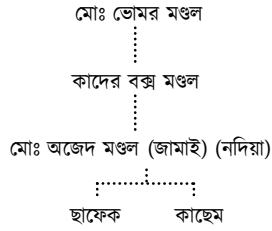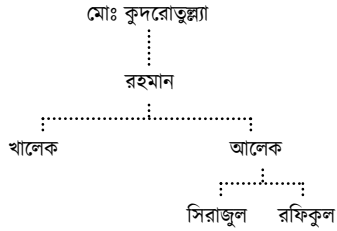
নদিয়া গ্রামের উত্তর পাড়া (তেঁতুলতলা পাড়া) বিভিন্ন পরিবারের বংশ-তালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া (কলু পাড়া) মোঃ সুলতান পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস রায়খাঁ / হাড়োয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

* * *

* * * | * * *

মোঃ কাদিম মণ্ডল (কলু) | মোঃ সৃষ্টি মণ্ডল (কলু) ⇩ (মোঃ টুকে মণ্ডল পরিবার)

ওসমান ⇩ পোষ্যপুত্র মোঃ নুর মহম্মদ (শালীর ছেলে) | আছিরন বিবি (স্বামী মোঃ সুলতান) ⇩ (মোঃ পরান মণ্ডল পরিবার)

⇩

নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া (কলু পাড়া) মোঃ নুর মহম্মদ পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস শুকপুকুরিয়া / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

* * *

* * * | * * *

মোঃ কাদিম মণ্ডল (কলু) | মোঃ সৃষ্টি মণ্ডল (কলু) ⇩ (মোঃ টুকে মণ্ডল পরিবার)

ওসমান ⇩ পোষ্যপুত্র মোঃ নুর মহম্মদ (শালীর ছেলে) | আছিরন বিবি (স্বামী মোঃ সুলতান) ⇩ (মোঃ পরান মণ্ডল পরিবার)

⇩

মোঃ নুর মহম্মদ পরিবার

মোঃ রতি মণ্ডল

মোঃ নুর মহম্মদ

এসমাইল | আবদুল | আলাউদ্দিন

শিল্পা সামিম | আশা রোহিত | রাহান রাইহান
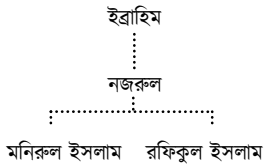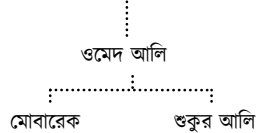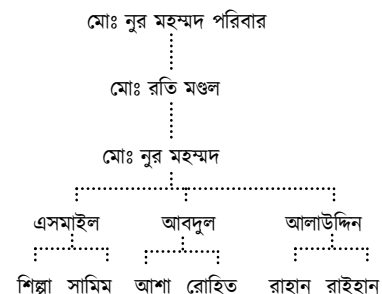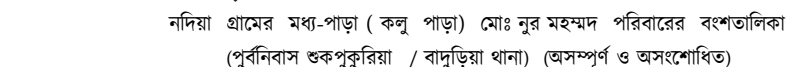
নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া মোঃ পরান মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া মোঃ দুধ মল্লিক পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
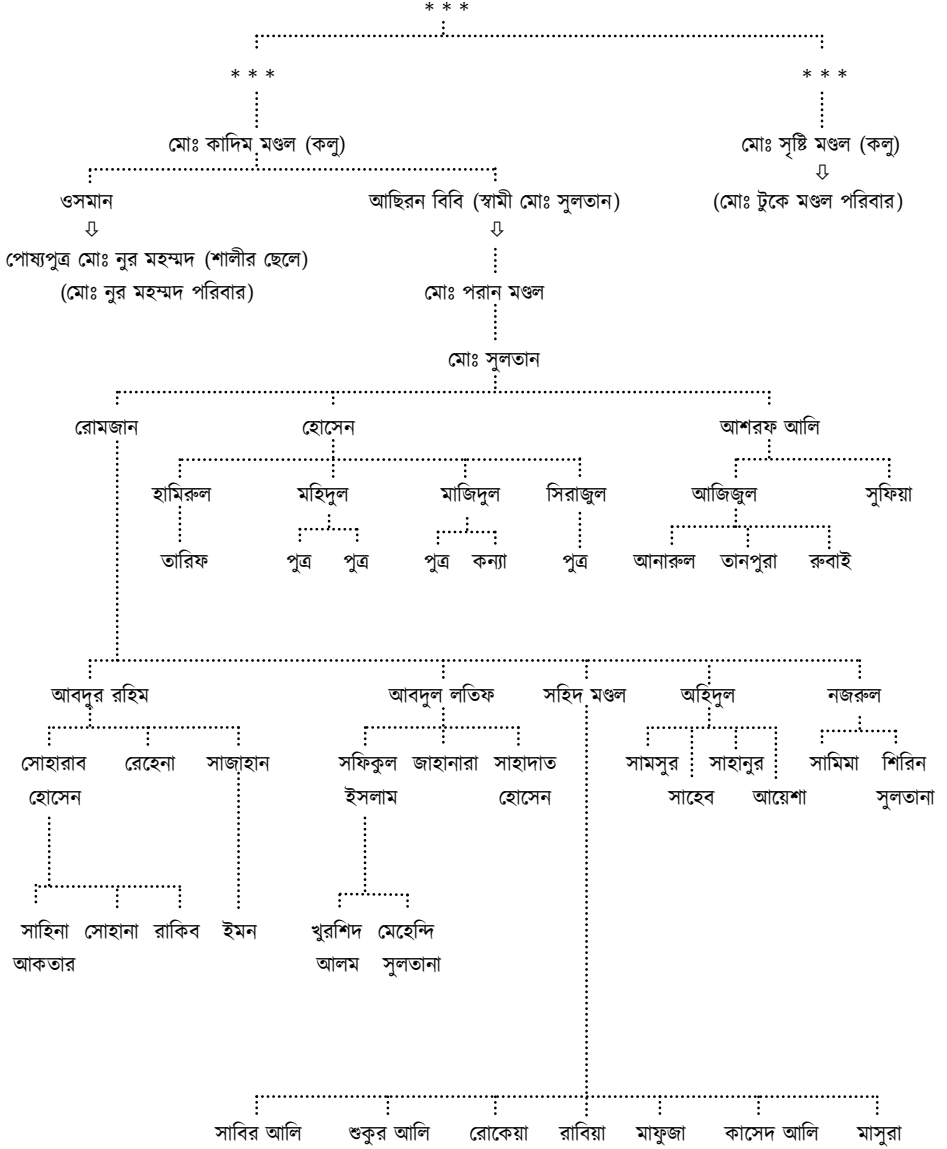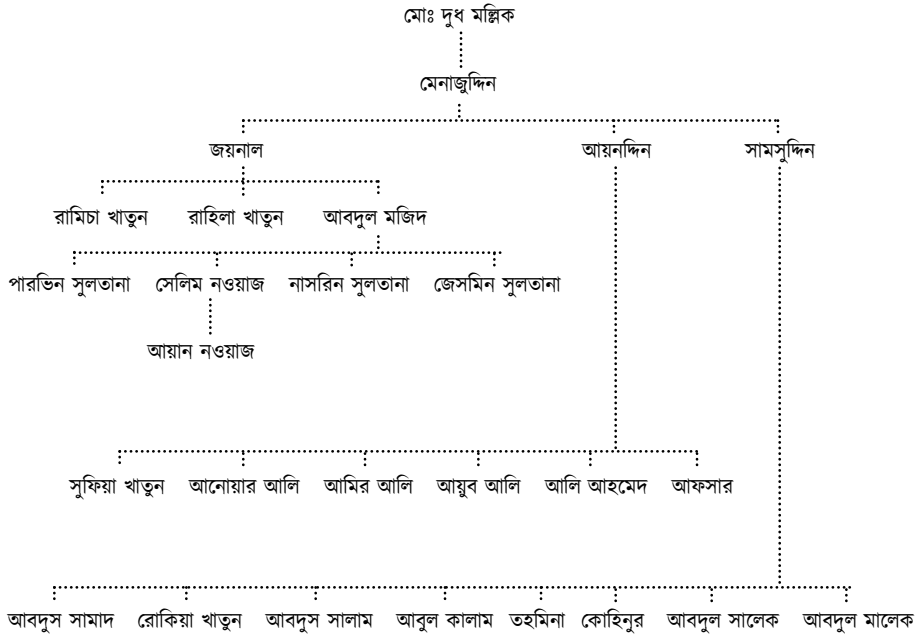
নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া মোঃ তারিফ বিশ্বাস পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস শ্রীরামপুর / (নাটুরিয়া / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের মধ্য-পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ এলাহি বকস ও মোঃ জামচুর মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ রমজান মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া
মোঃ ঠান্ডা মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া
মোঃ হাতেম মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া
মোঃ করিম মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া
মোঃ জসিমুদ্দিন মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
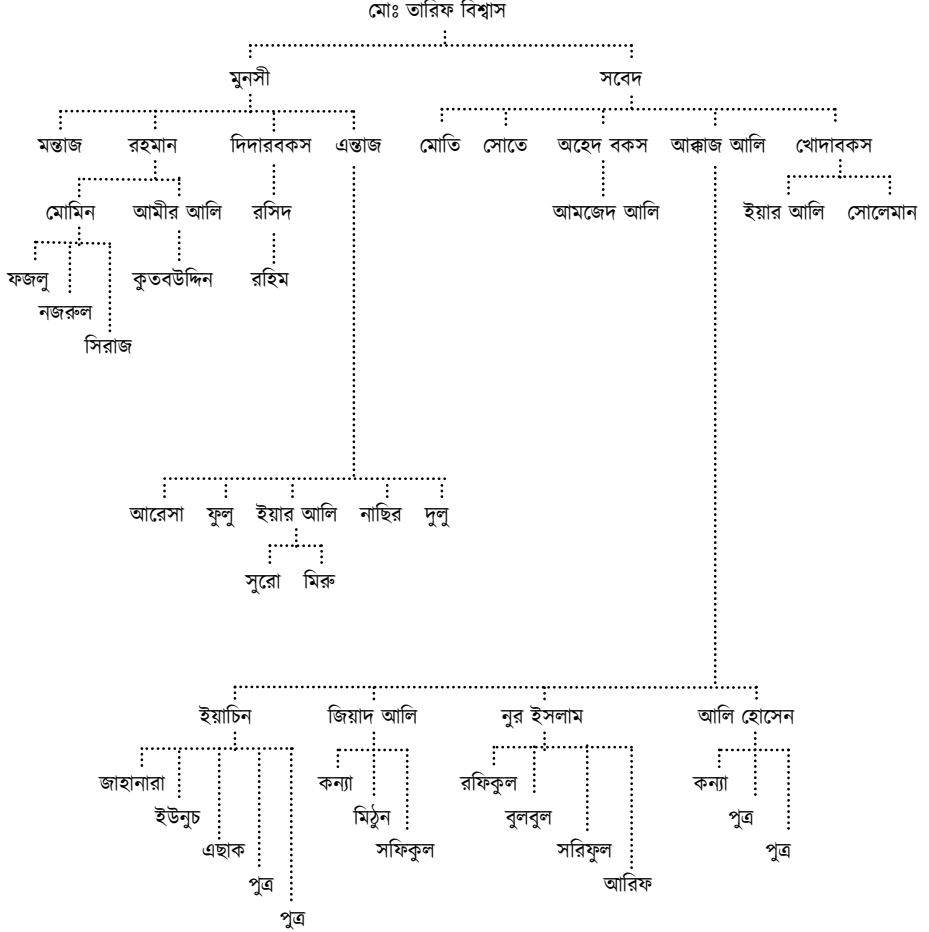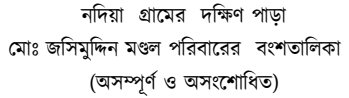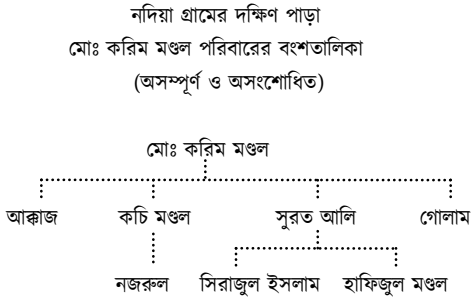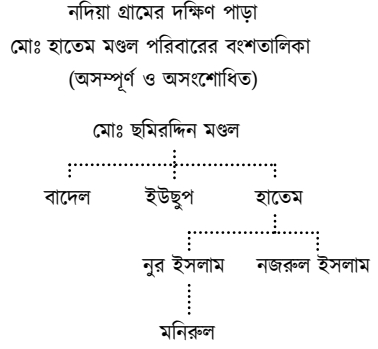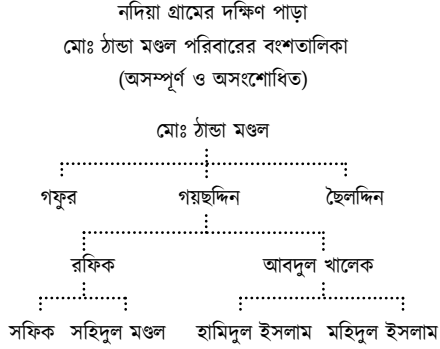
নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ রূপচাঁদ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
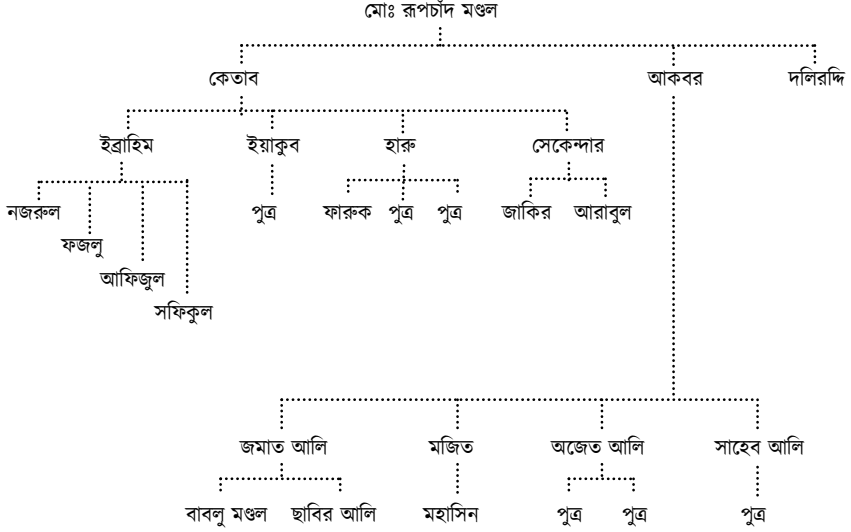
নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ মুনচুর মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস আকিপুর) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ সৃষ্টি মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ মোছলেম মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
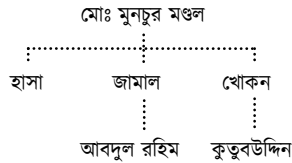
নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ হাবিল মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
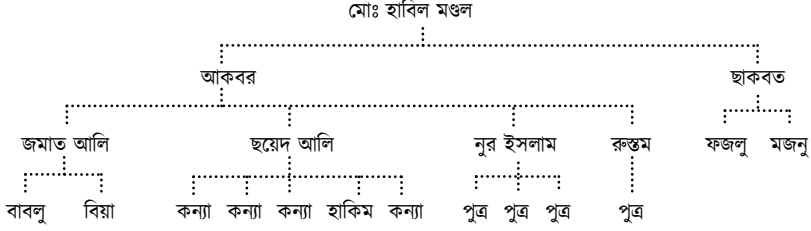
নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মোঃ পাঁচু মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
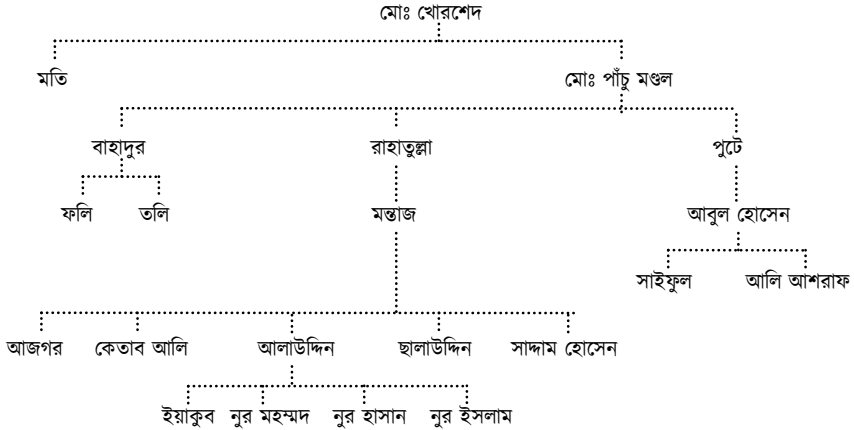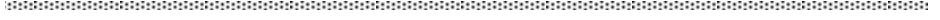
নদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ মিঞাজান পরিবারের বংশতালিকা
(পুর্বনিবাস শ্রীরামপুর / (নাটুরিয়া / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ হামিজদ্দিন মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ সন্তোষ মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
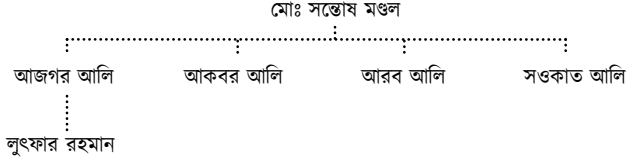
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব-পাড়া মোঃ আহাদ বকস পরিবারের বংশতালিকা

(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
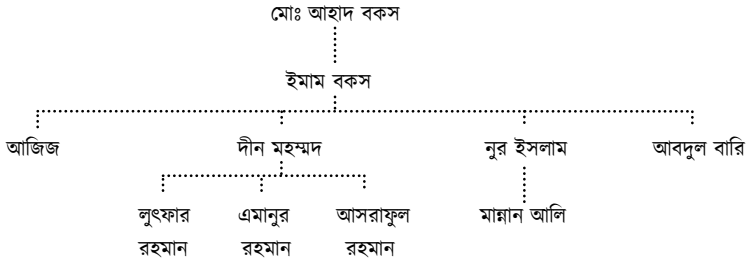
নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ এরফান আলি পরিবারের বংশতালিকা

(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
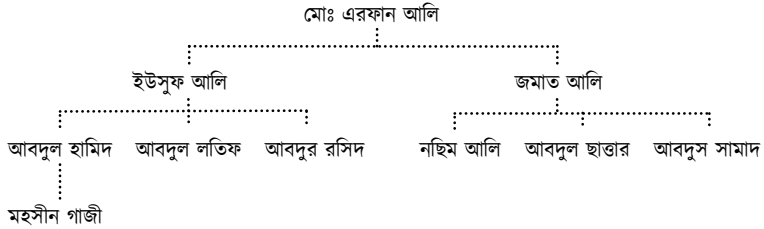
নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ হাজের আলি মণ্ডল পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

- মোঃ হরিফুল্লা মণ্ডল
  - মোঃ হাজের আলি মণ্ডল
    - আসরাফ আলি মণ্ডল
      - নজরুল ইসলাম
        - সোনিয়া ইসলাম
        - সাহানা ইসলাম
        - শাহিদ ইসলাম
      - ফতেমা
      - ফজিলা
      - রিজিয়া
      - লুৎফা
    - আকবর আলি মণ্ডল
      - সিরাজুল ইসলাম
    - সামসের আলি মণ্ডল
      - এনায়েত
        - আব্দুল কাদির
        - রুবিয়া খাতুন
      - নাসিরুদ্দিন ইসলাম
    - ইয়ার আলি
      - ইমাদুল ইসলাম
      - সফিকুল ইসলাম
      - আমিরুল ইসলাম
      - নাজিরুল ইসলাম
      - আজিরুল ইসলাম
      - এনারুল ইসলাম
    - সুরত আলি
      - নৌসাদ আসিফ
      - রেহান আসিফ
      - ওয়াসিম আসিফ
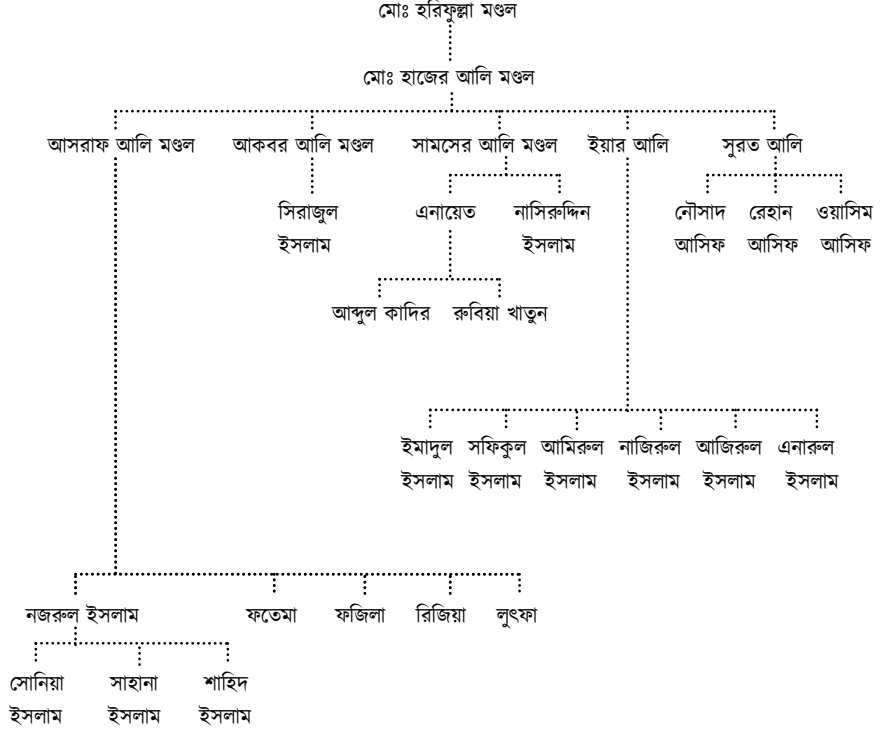
নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া মোঃ জমাত আলি পরিবারের বংশতালিকা

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া অন্যান্য পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা (মূল খণ্ড) ১/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ২/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
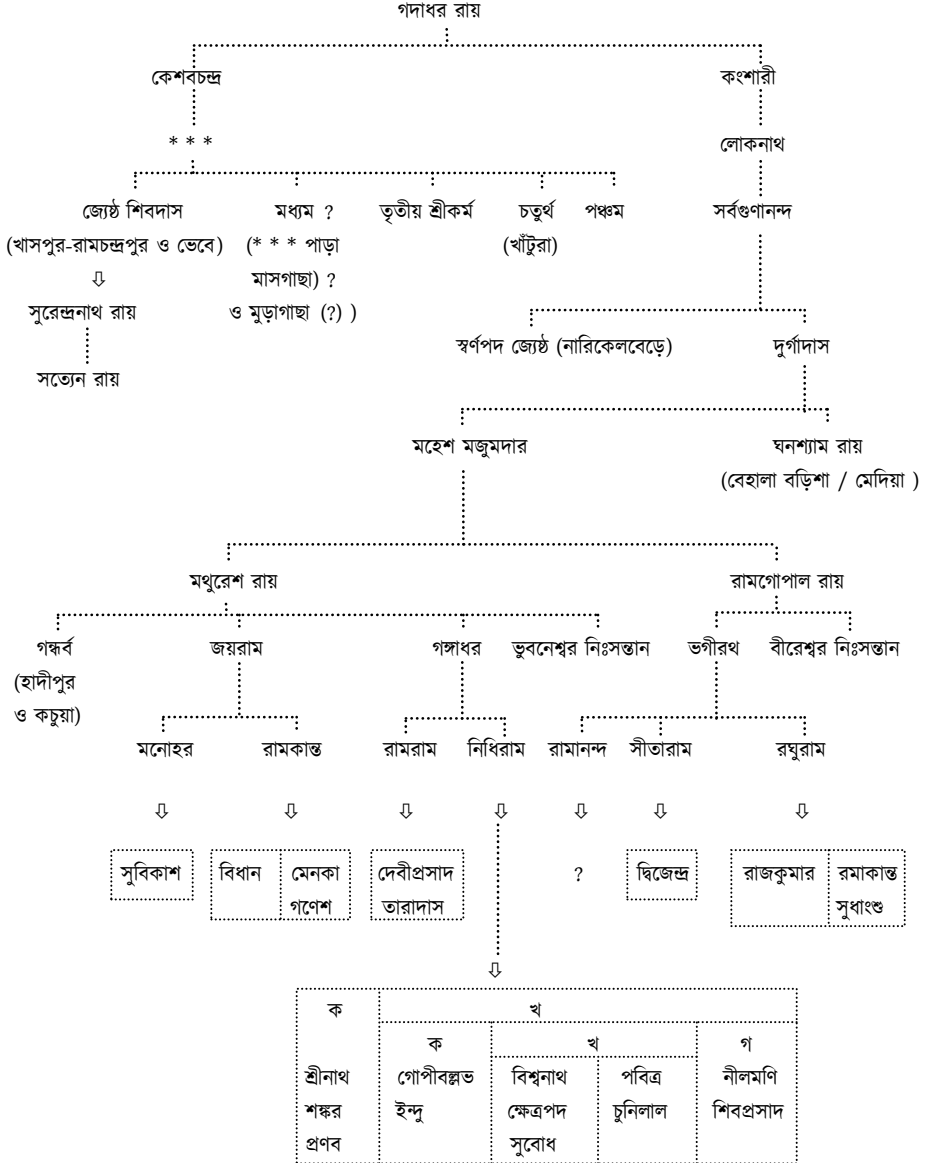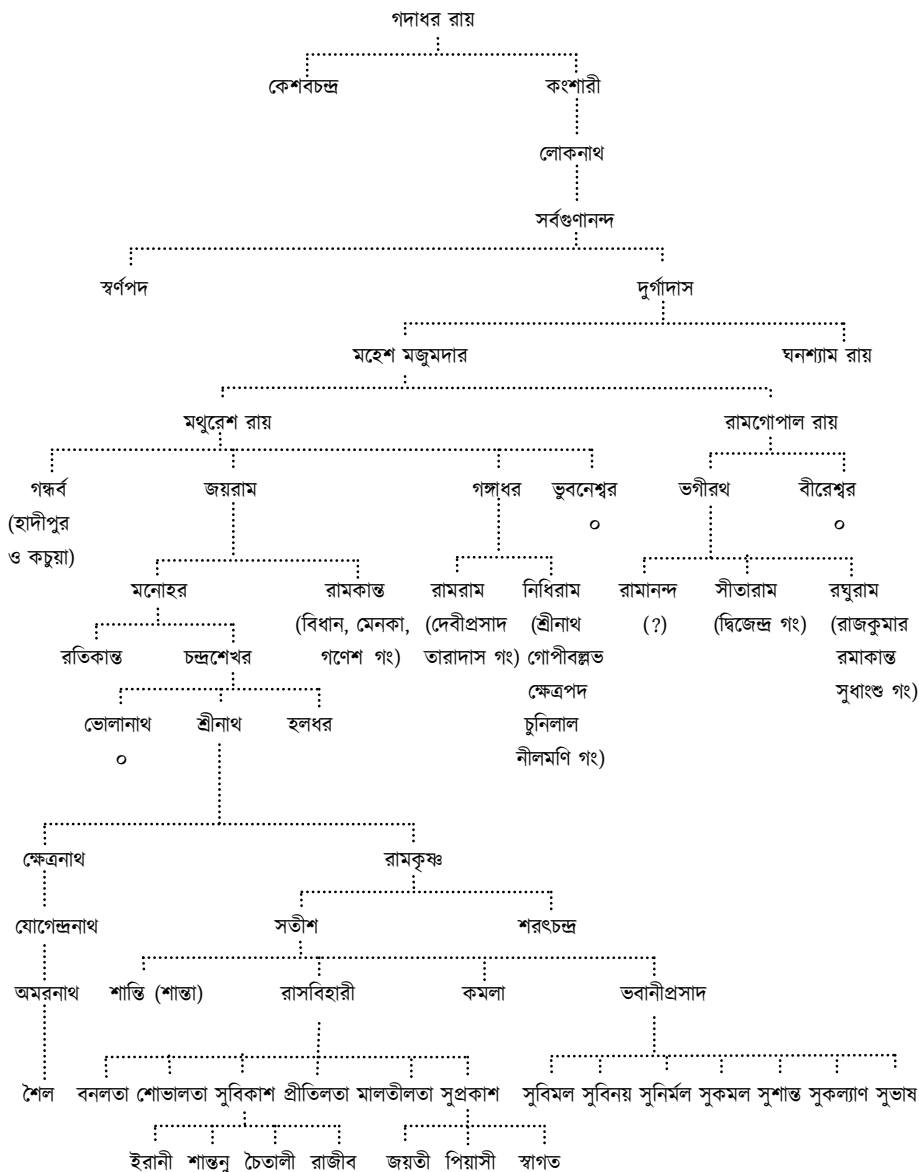
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৩/১৮

(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
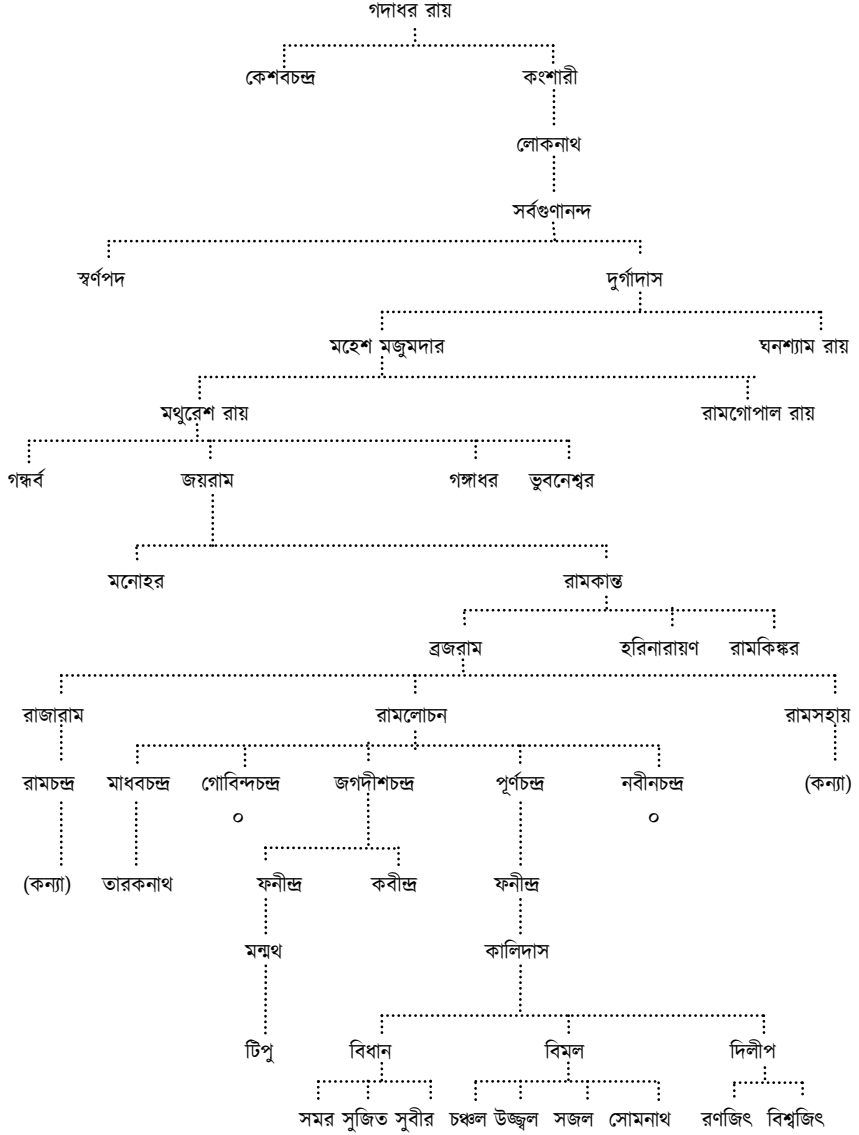
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৪/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
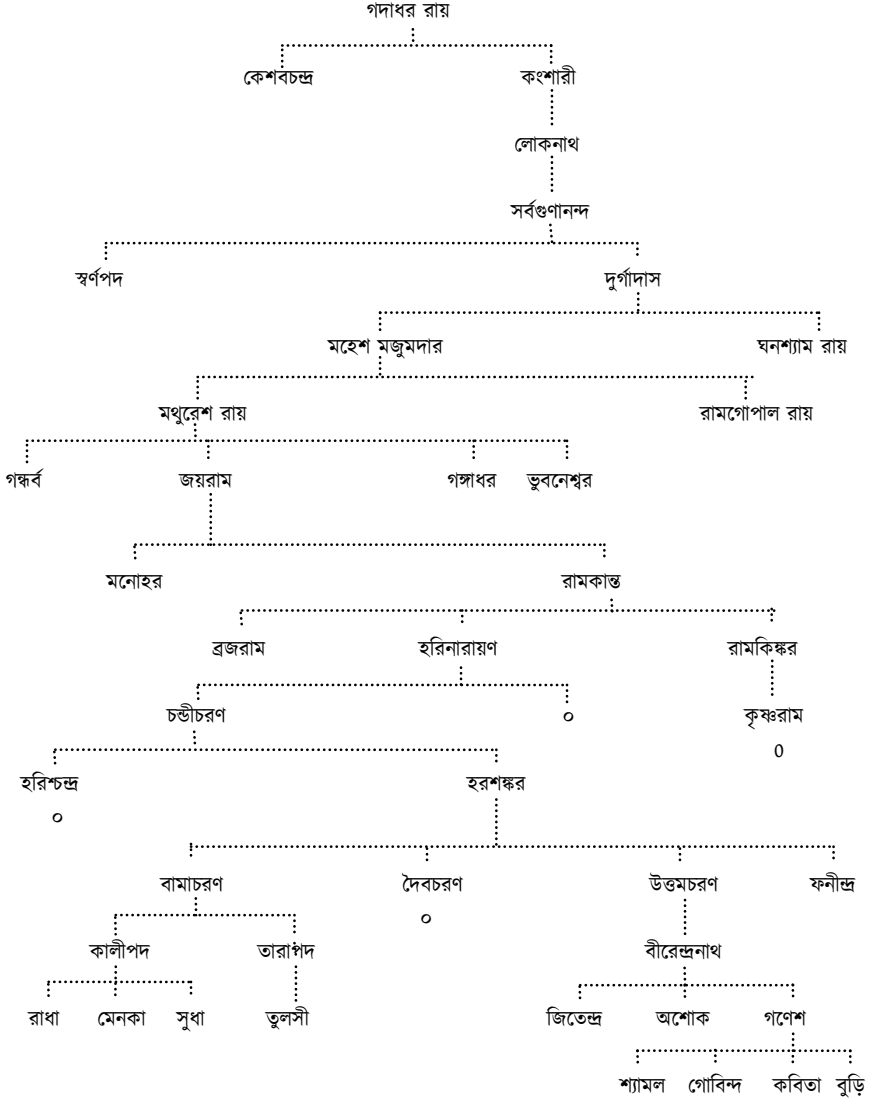
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৫/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
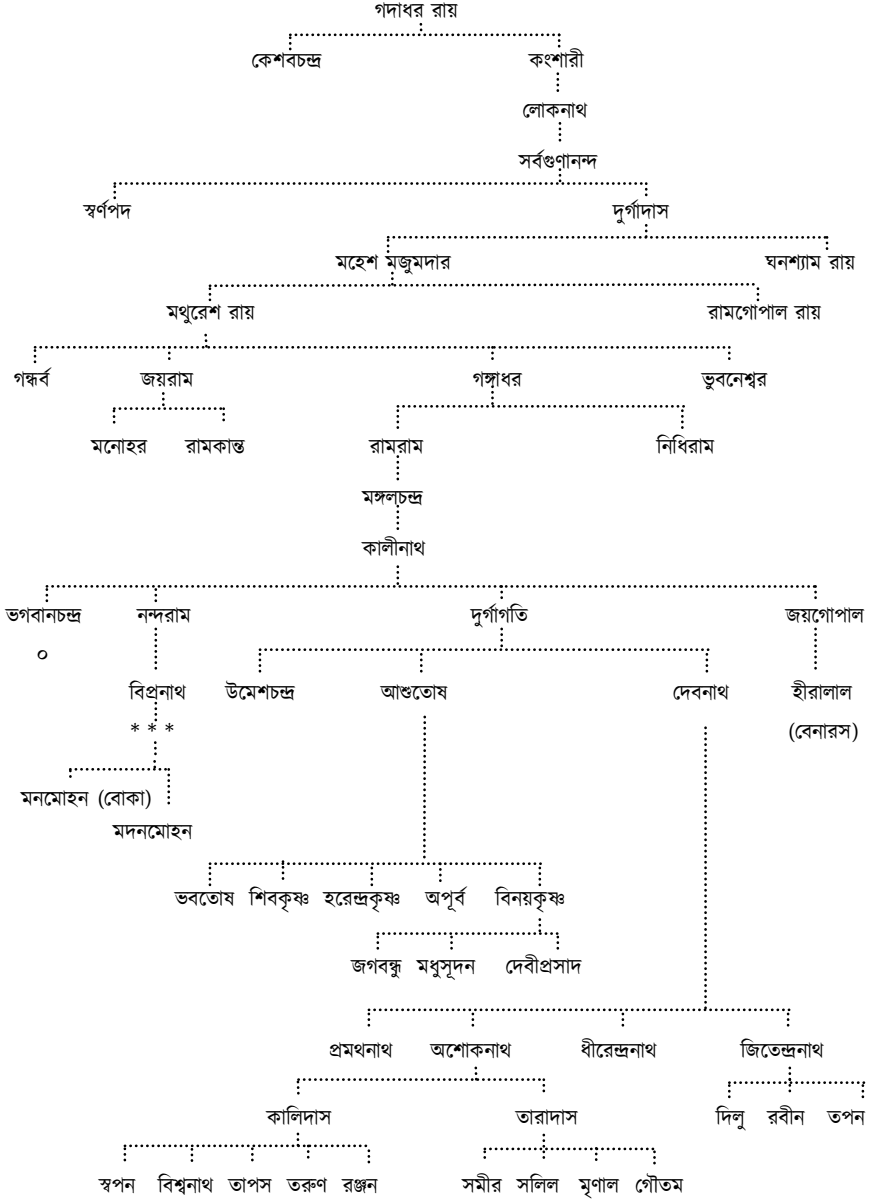
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৬/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
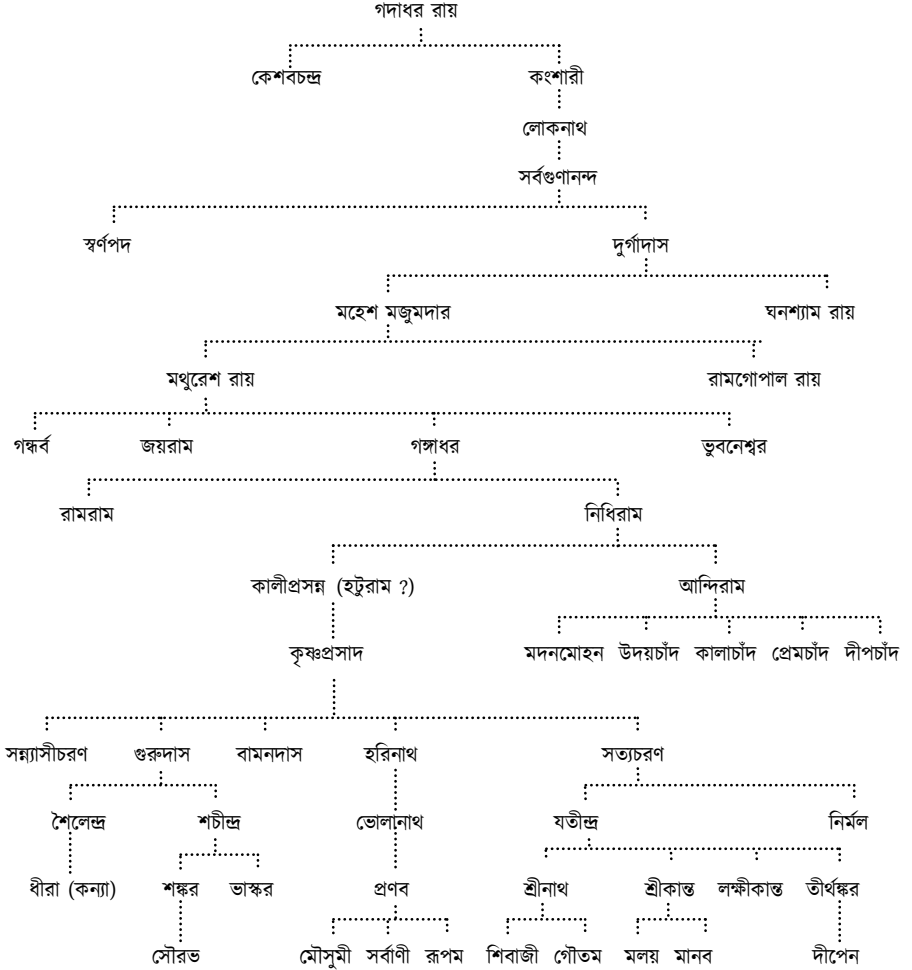
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৭/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

- গদাধর রায়
  - কেশবচন্দ্র
  - কংশারী
    - লোকনাথ
      - সর্বগুণানন্দ
        - স্বর্ণপদ
        - দুর্গাদাস
          - মহেশ মজুমদার
            - মথুরেশ রায়
              - গন্ধর্ব
              - জয়রাম
              - গঙ্গাধর
                - রামরাম
                - নিধিরাম
                  - কালীপ্রসন্ন (হটুরাম ?)
                    - কৃষ্ণপ্রসাদ
                  - আন্দিরাম
                    - মদনমোহন
                      - দীননাথ
                        - পূর্ণচন্দ্র
                      - রামগোপাল
                        - ১ কন্যা
                      - নবীনচন্দ্র
                        - ০
                      - মধুসূদন
                        - অমূল্যধন
                          - কৃষ্ণধন
                            - বাসুদেব
                            - মন্টু
                            - গোপীবল্লভ
                              - রুদ্রপ্রসাদ
                              - শর্মিষ্ঠা
                            - হারাধন
                      - কেদারনাথ
                        - আশু
                          - যামিনী
                          - ইন্দু
                        - নলিনী
                          - সয়া
                          - গোবিন্দ
                    - উদয়চাঁদ
                    - কালাচাঁদ
                    - প্রেমচাঁদ
                    - দীপচাঁদ
              - ভুবনেশ্বর
            - রামগোপাল রায়
          - ঘনশ্যাম রায়
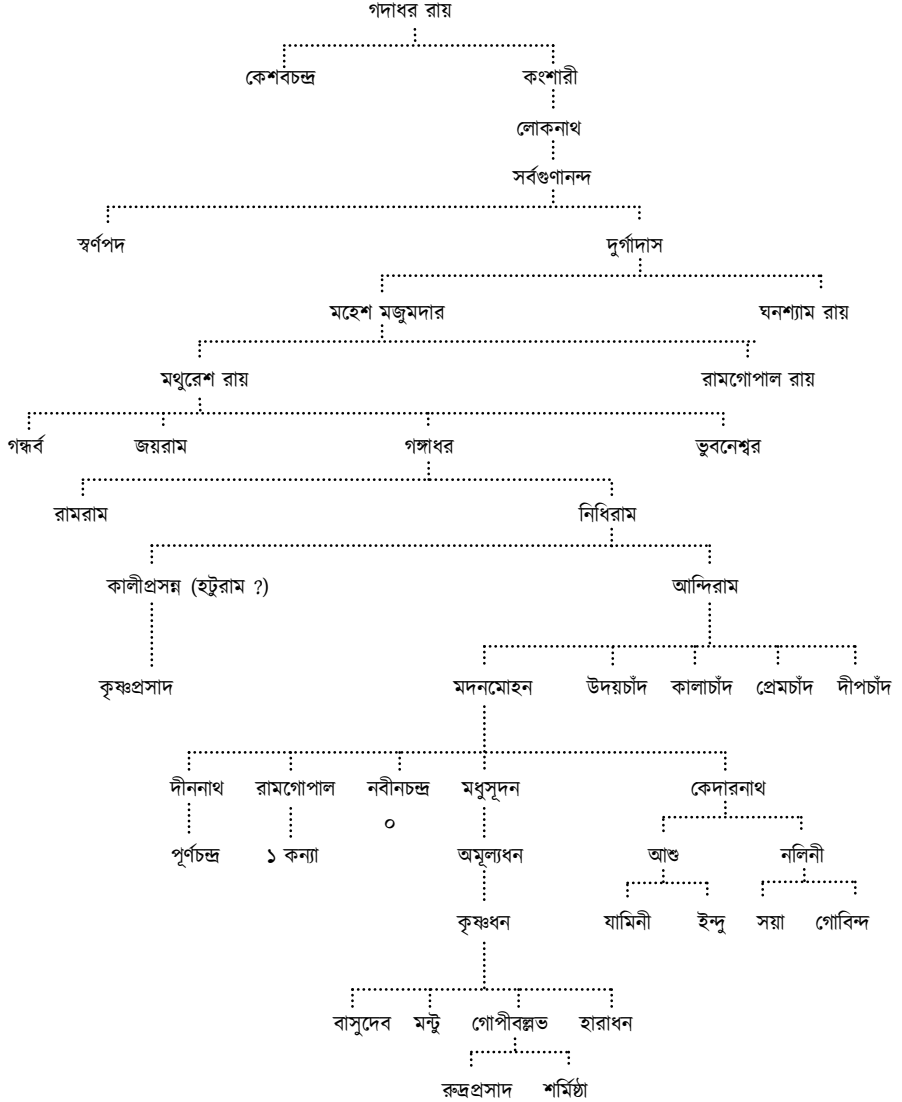
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৮/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
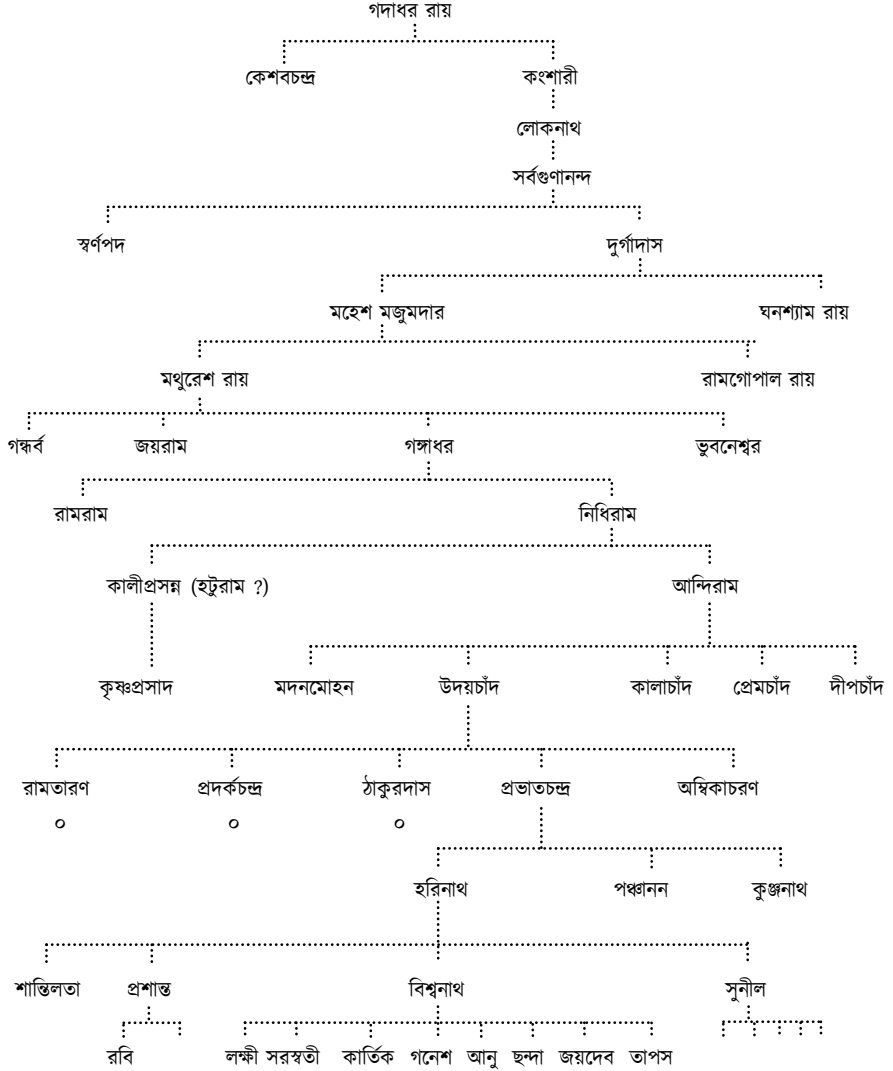
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ৯/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
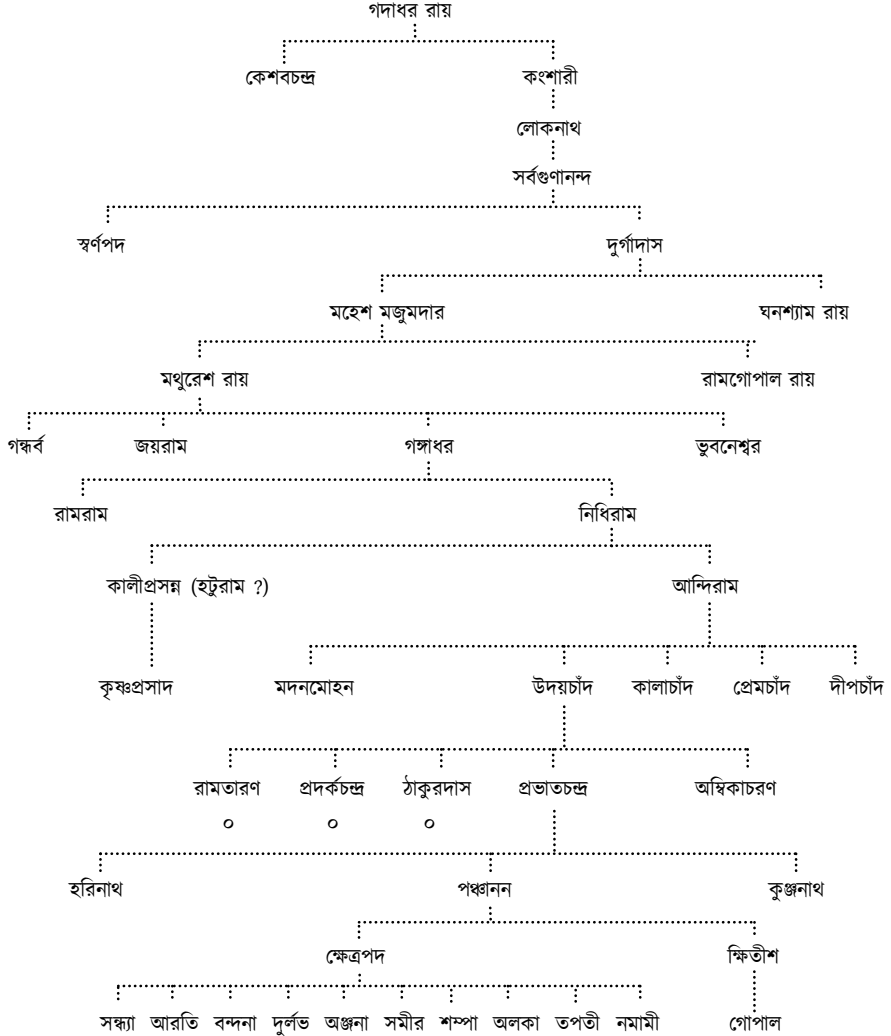
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১০/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
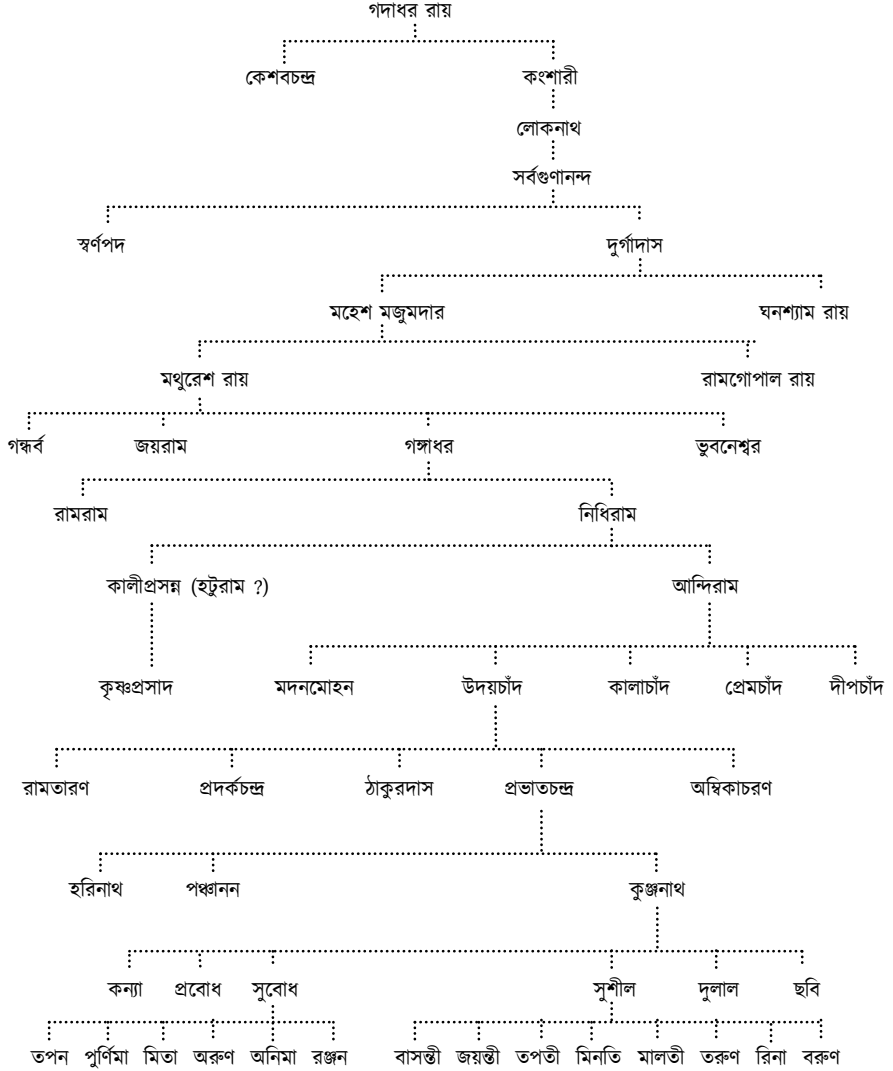
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১১/১৮

(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
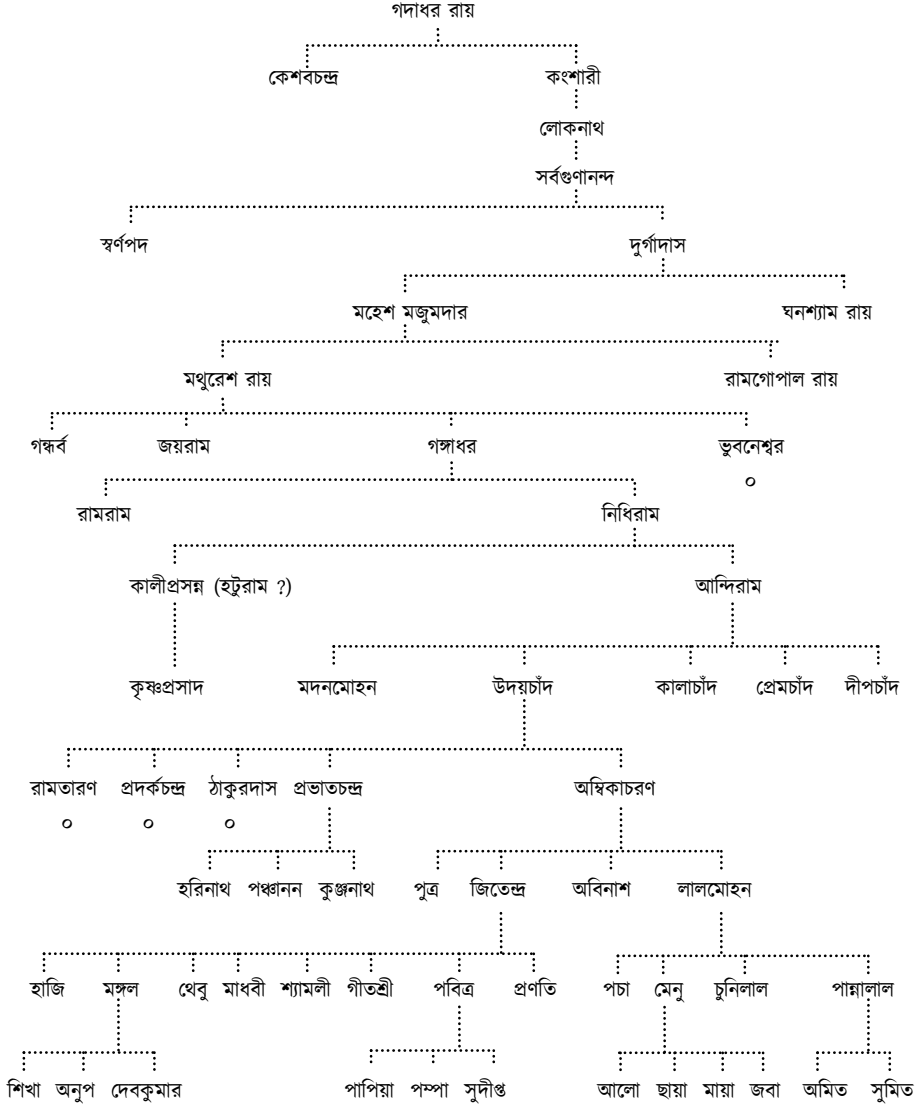
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১২/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৩/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
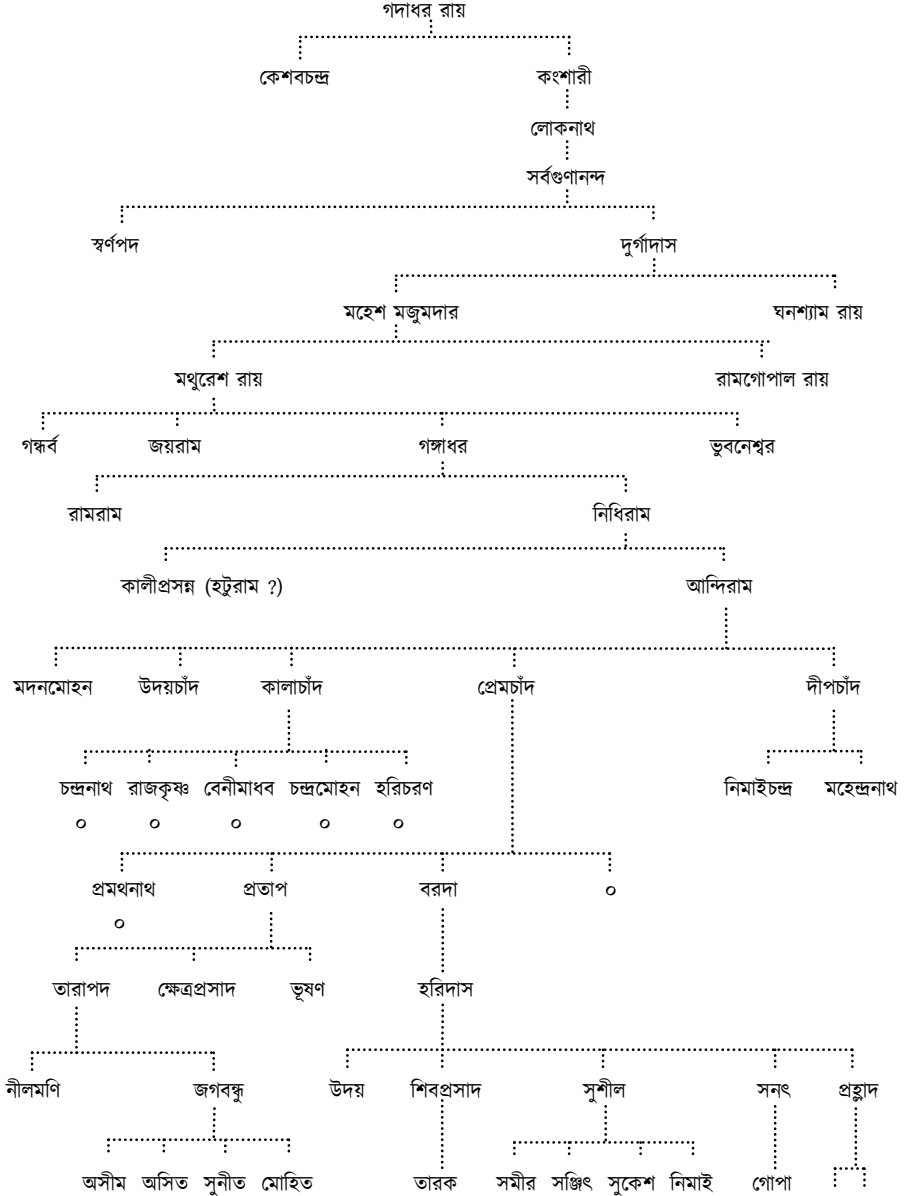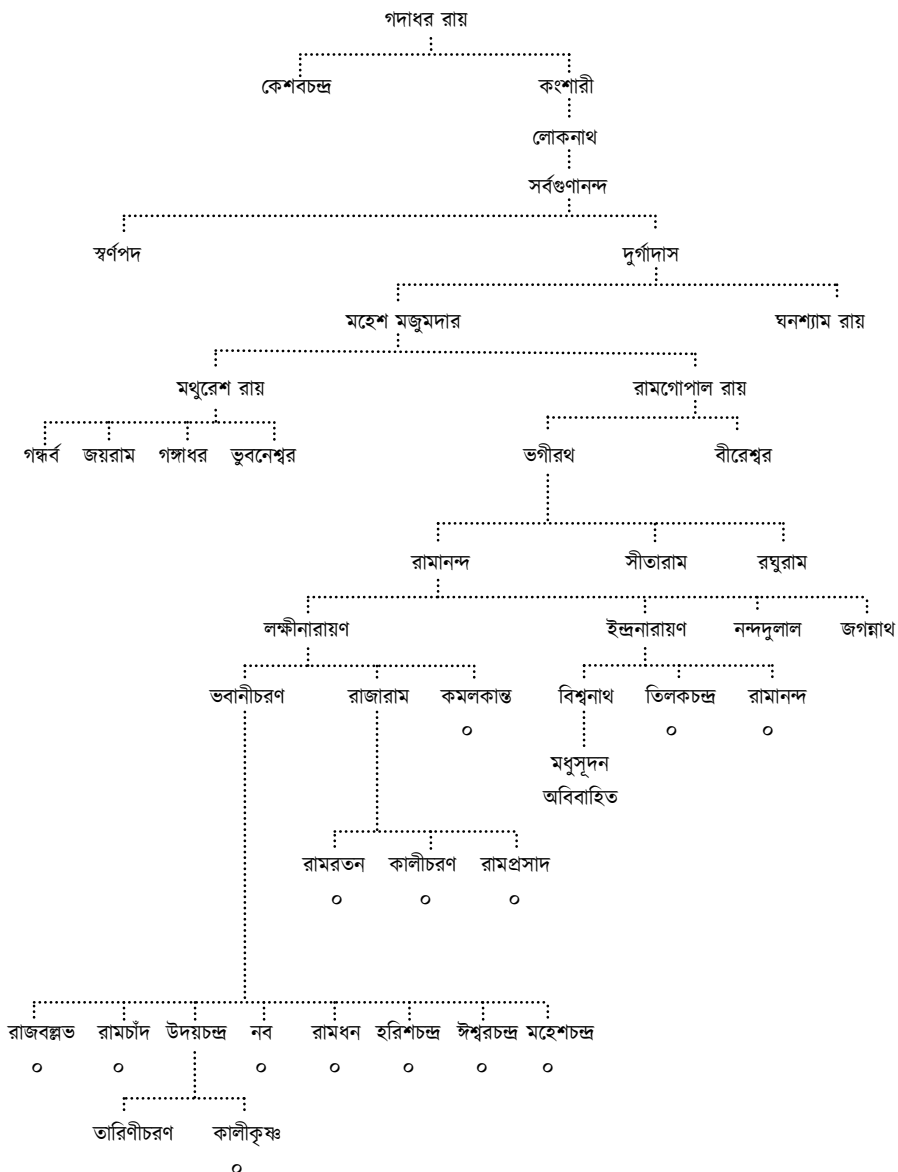
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৪/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
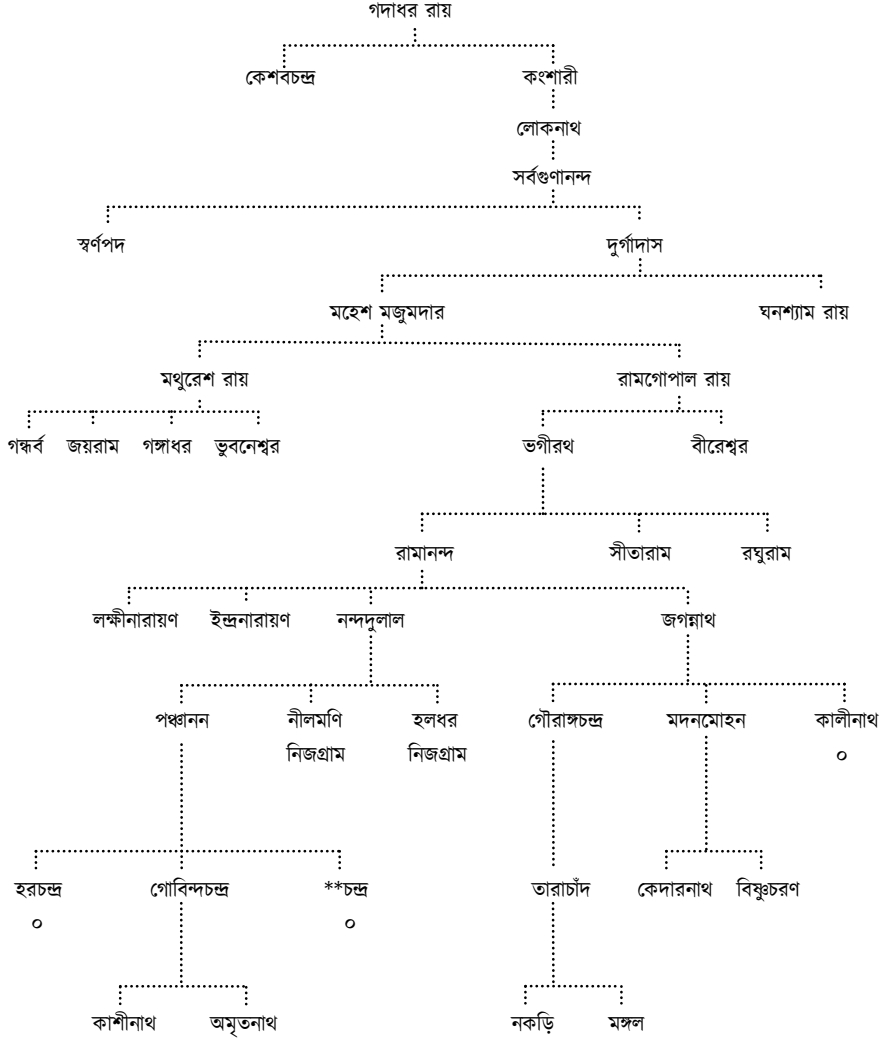
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৫/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
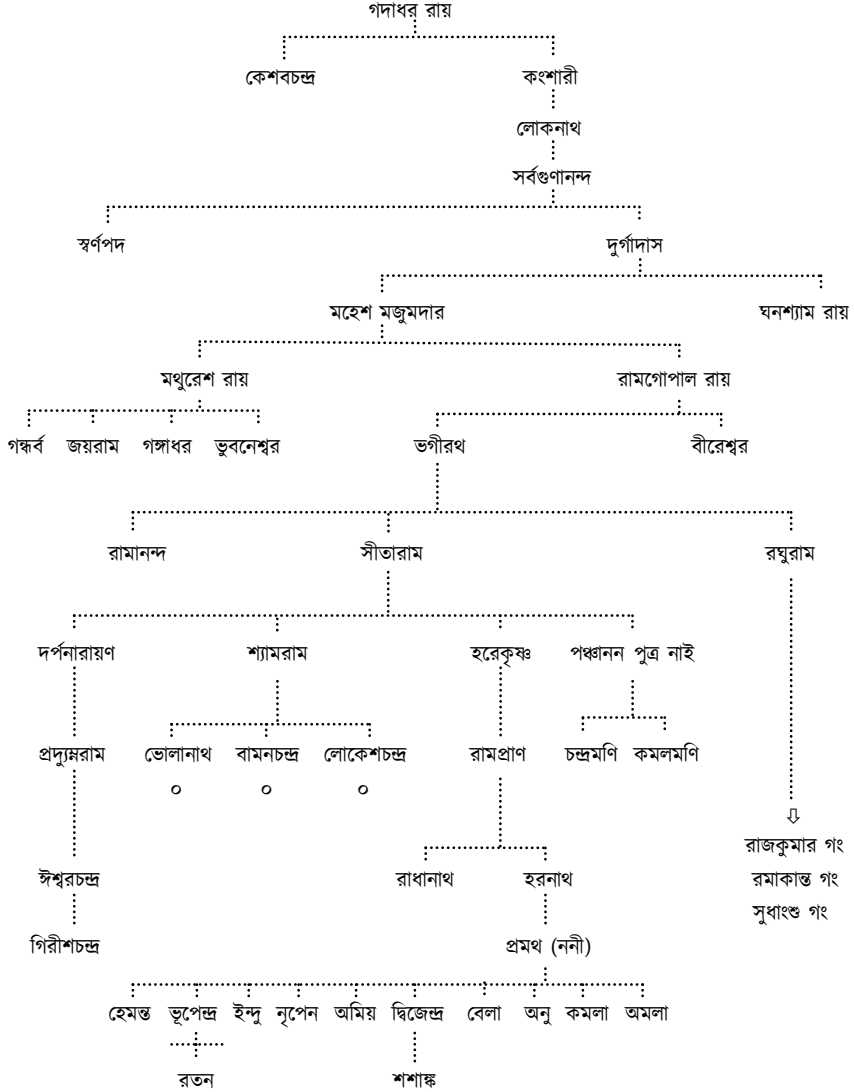
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৬/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
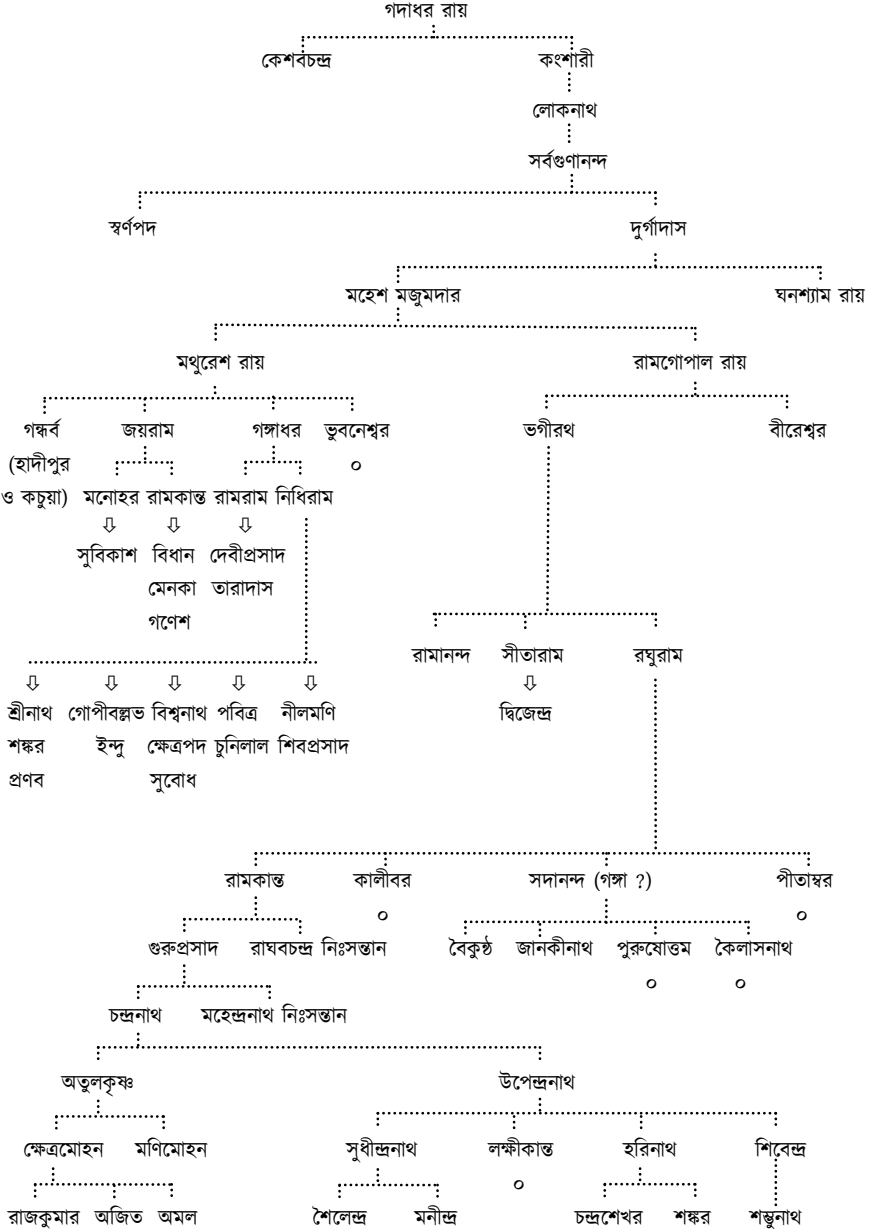
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৭/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
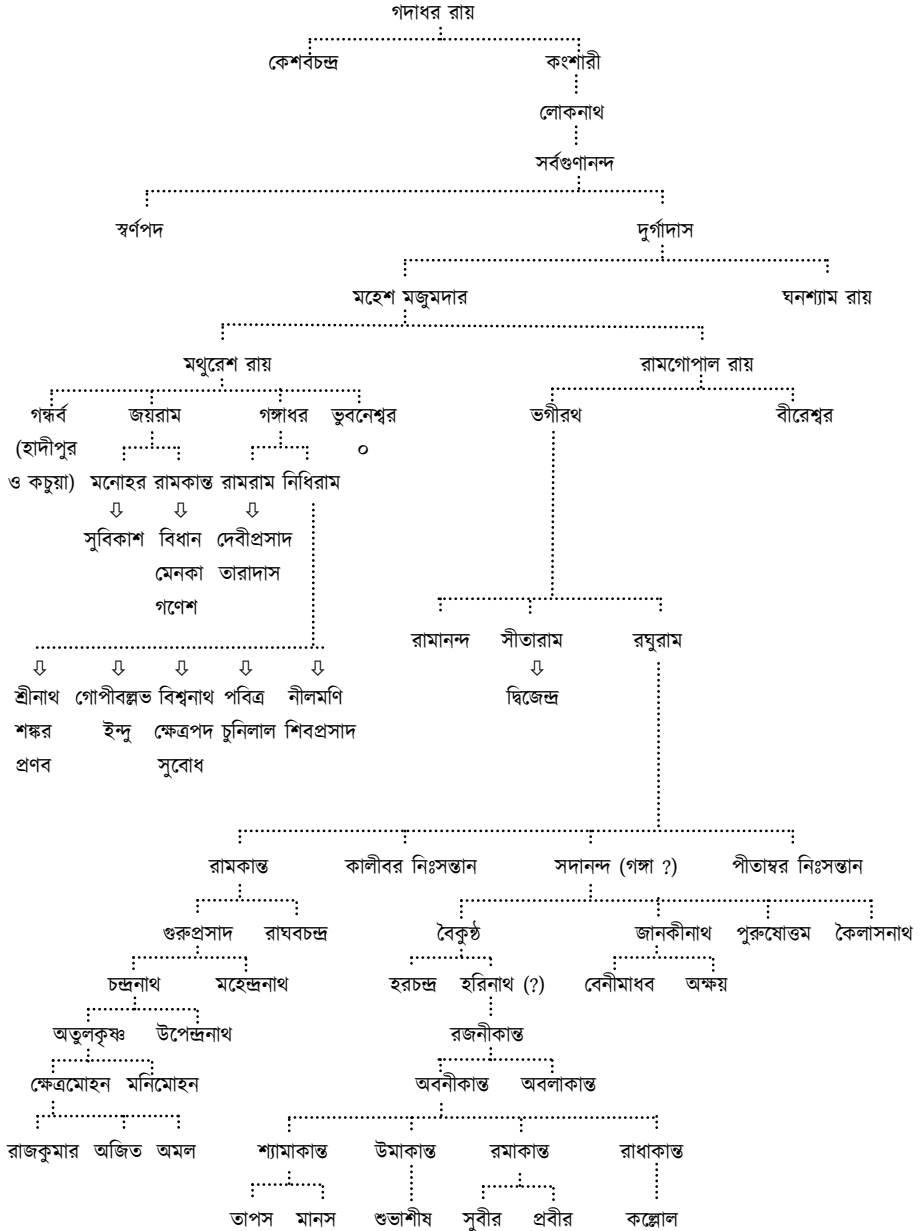
নদিয়া গ্রামের রায় (গাঙ্গুলি) পরিবারের আংশিক বংশতালিকা ১৮/১৮
(পূর্ব নিবাস হায়দারপুর / বাদুড়িয়া থানা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্ব পাড়া
হরিচরণ রায় (খাঁড়া) পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

হরিচরণ রায় (খাঁড়া)
সতীশ রায়
ক্ষিতীশ রায়
কার্তিক গনেশ সোমনাথ ত্রিনাথ
কৌশিক
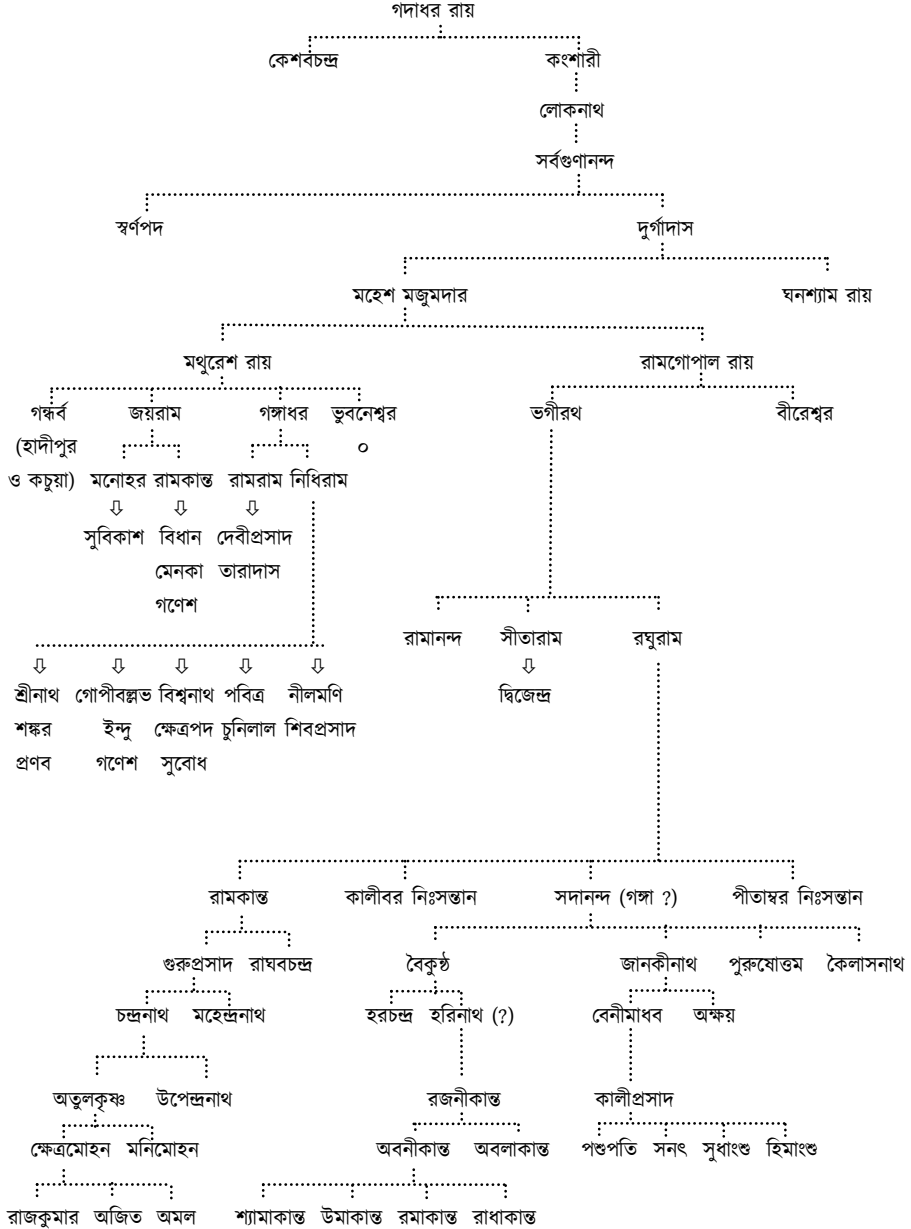
নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
গৌর রায় (লস্কর) পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্ব নিবাসঃ বরুণহাট / হাসনাবাদ) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

রাজকৃষ্ণ লস্কর
জগদীশ
গৌর রায় (লস্কর)
পিন্টু

নদিয়া গ্রামের সরকার পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পূর্বপাড়া
সরদার পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

নদিয়া গ্রামের পশ্চিম পাড়া
সরদার পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
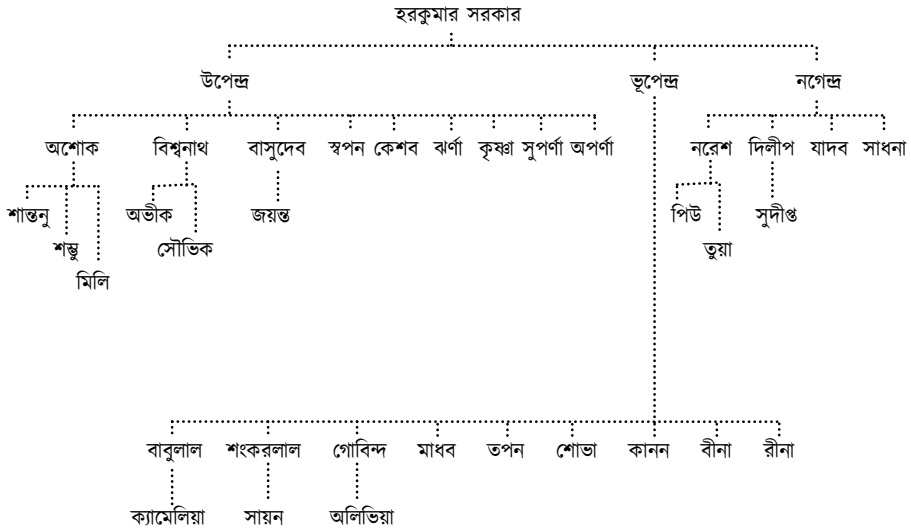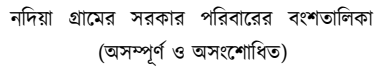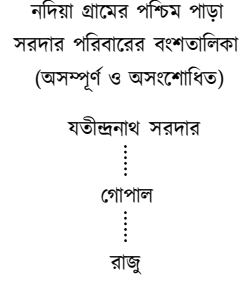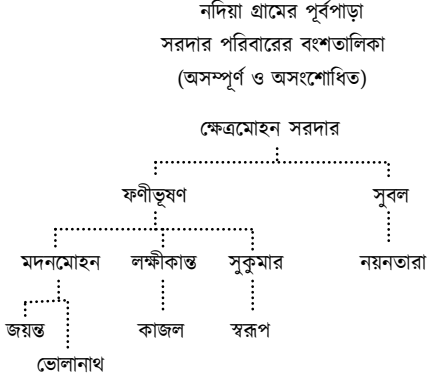
নদিয়া গ্রামের সন্তোষ সাঁপুই পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
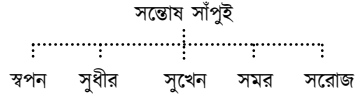
নদিয়া গ্রামের ভাণ্ডিবন সাঁপুই পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)

ভাণ্ডিবন সাঁপুই
বিষ্ণুপদ
পাঁচুগোপাল দাশুরথী হারাধন
সঞ্জয়

নদিয়া গ্রামের সেন পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্ব নিবাসঃ দেবহাটা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
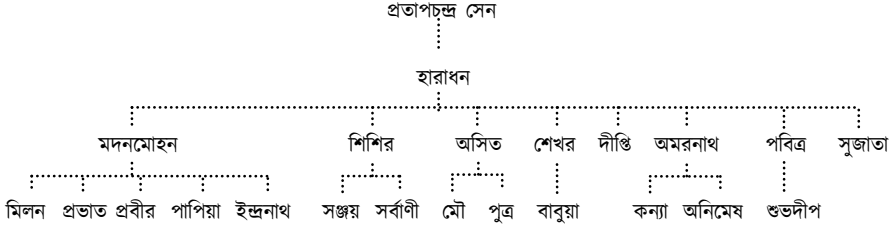
নদিয়া গ্রামের হাজরা পরিবারের বংশতালিকা
(পূর্ব নিবাস চৈতলঘাট / বসিরহাট মহকুমা) (অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
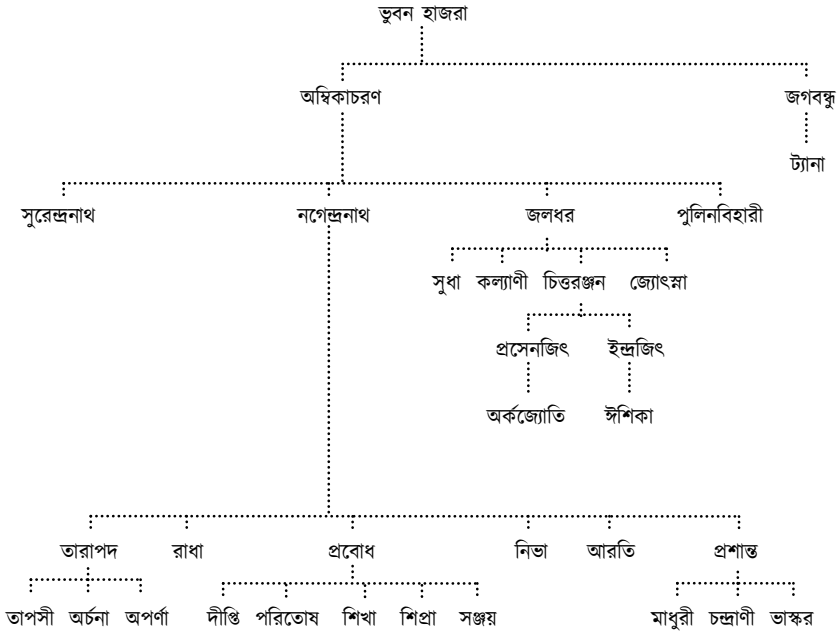
নদিয়া গ্রামের হাজারী পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
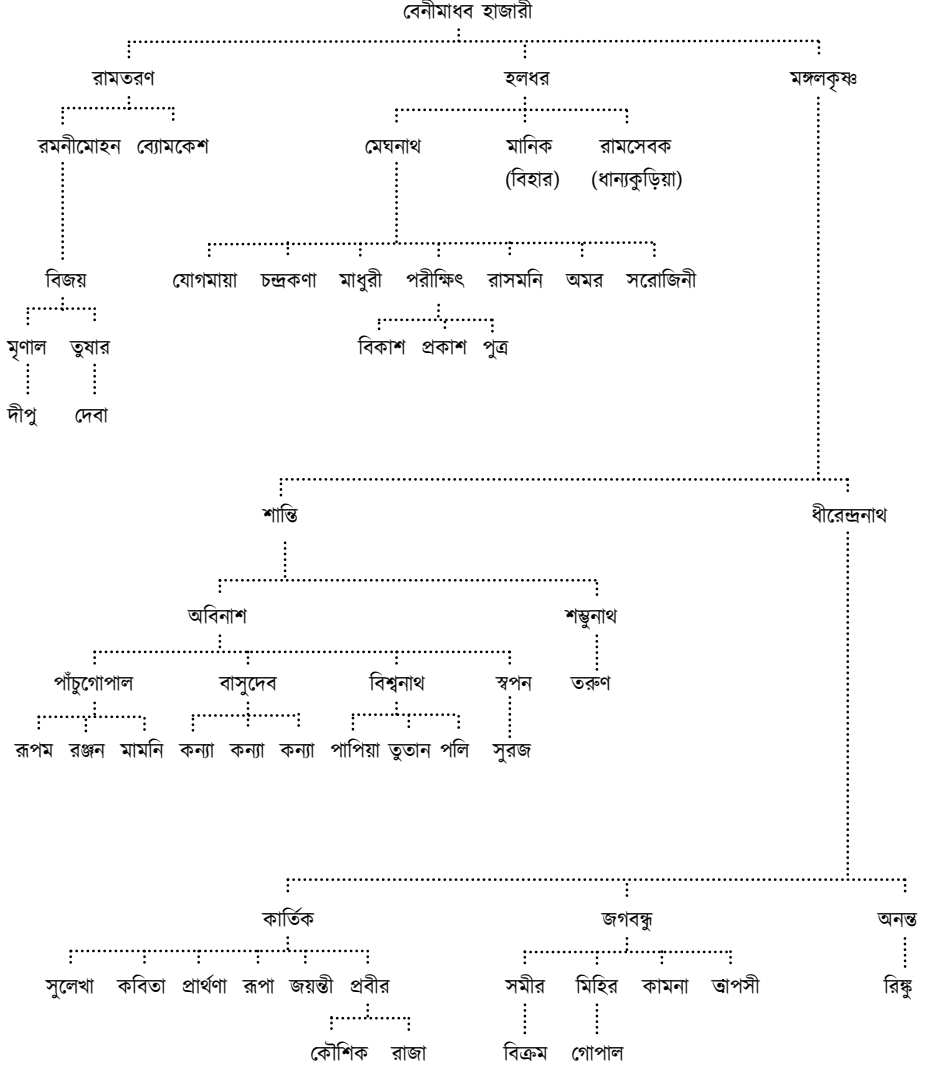
নদিয়া গ্রামের মধ্য পাড়া দেবেন্দ্রনাথ হালদার পরিবারের বংশতালিকা
(অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত)
(পূর্ব নিবাস চাঁপাপুকুর)

ইছামতী বিদ্যাধরীর দেশ

প্র স্তা ব না

নিম্নবঙ্গের ভাগীরথী-যমুনা-বিদ্যাধরী-পদ্মা-ইছামতী-বিধৌত অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টতা আছে । কোথাও সুদূর অতীতের পদচিহ্ন , আবার কোথাও নতুন ভূখণ্ডের আত্মপ্রকাশ । অসংখ্য নদীর ভাঙ্গা-গড়ার খেলা । অতীত যশোর দেশের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের খণ্ডাংশ হলেও এখানে রাঢ় ও বঙ্গের থেকে পৃথক পরিচিতি আছে । সেকালের যশোর সমাজের ব্যাপক অবস্থান বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ।

অনেক গবেষক এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে চর্চ্চা করেছেন ও করছেন । কিন্তু বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমার বিষয়ে পর্যাপ্ত কাজ হয়নি । বর্তমান নিবন্ধে কিছু ছিন্নপত্র আহরিত হল মাত্র ।

ভবিষ্যতে কোনও ইতিহাসপ্রেমী নিশ্চয়ই নির্মাণ করবেন নিবিড় তথ্যভাণ্ডার যা একই সঙ্গে ছুঁয়ে যাবে এই অঞ্চলের অতীতযুগসমূহ ও মহকুমা-থানা-গ্রাম-ভিত্তিক জনজীবনের ইতিকথা ।

ভূ-প্রকৃতি

নদ-নদী, বিল-বাদা, খাড়ি-ভেরি নিয়ে চব্বিশ পরগনার ভূ-প্রকৃতি। দক্ষিণে সুন্দরবন আর সাগর। ভাটির দেশ। শতমুখী গঙ্গা ভুমি গঠন করতে করতে বেলাভুমি আর সুন্দরবনকে ক্রমাগত দক্ষিণে সরিয়েছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবন বিধ্বস্ত হয়েছে, জমি বসে গিয়েছে। আবার অনেক শতাব্দী পরে মাথা তুলেছে ভুমি।

অতীতে ত্রিবেণীর কাছে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনা তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। ভাগীরথীর তিন ধারার মধ্যে যমুনা-বিদ্যাধরীই প্রাচীনতম। যমুনা নদী কাঁচরাপাড়ার কাছে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। মূল যমুনা পুবদিকে প্রবাহিত হয়ে চারঘাটের কাছে ইছামতীতে মিশেছে আর বিদ্যাধরী দক্ষিণ-পুব দিকে প্রবাহিত হয়ে একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে মাতলা নদী দিয়ে সাগরে মিশেছে। ভাগীরথীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে যমুনাও বিদ্যাধরীর মত ক্ষীণ হয়ে পরে।

বিদ্যাধরী খুবই প্রাচীন নদী। ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিদ্যাধরী নদী ছিল ভাগীরথীর শাখা নদী। খ্রিস্টপুর্ব ৩০০ অব্দের 'গঙ্গে' বন্দর-নগরী তথা 'চন্দ্রকেতুগড়' এই নদীর তীরেই ছিল। বিদ্যাধরী নদী ভাগীরথীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার দ্বারা নদীর বুকে মগু-পলির অবক্ষেপনের ফলে এই বন্দর পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিদ্যাধরীর উপনদী ছিল নোয়াই, সুঁতি (সুঁটি), সোনাই (সাতক্ষীরা), সোনাই(সোদপুর) প্রভৃতি।

ভাগীরথীর জন্মেরও আগে দামোদর নদ সাগরে বয়ে যেত নিম্নবঙ্গের যমুনা নদীর খাতে। যমুনাকে বিশাল বলে লিখেছেন বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে। ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে পূর্ব-দক্ষিণ অভিমুখে যমুনা-ইছামতী-রায়মঙ্গল নদীপথে সাগর-সঙ্গম।

নদী যতই মোহনার নিকটে আসে তার দু-পাশের তীরভূমি উচু হতে থাকে। ফলে দুটি নদীর মাঝের নীচু ভূমি বিলের আকার নেয়। এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল হুগলি ও বিদ্যাধরীর মাঝে লবণ হ্রদ, বালান্ডা পরগনার পশ্চিমে কুলগাছি বিল, যমুনা ও বিদ্যাধরীর মাঝে বালান্ডা ও বালিয়ার (বসিরহাট) মধ্যস্থলে বরিতি বিল, যমুনার উত্তরে বিশাল বয়রা বিল, বয়রা বিলের উত্তরে বল্লি ও দাঁতভাঙা বিল, বয়রা বিলের পূর্বে নগরঘাটা ও খলিসখালি বিল, শ্যামনগর অঞ্চলে বরতি বিল, বারাসতের দক্ষিণ-পূর্বে ঢোলখেরা বিল ইত্যাদি।

গঙ্গা-যমুনা-বিদ্যাধরী-পদ্মা-ইছামতীর ভাঙা-গড়ার খেলায় আবর্তিত হয়েছে জানা-অজানা বিভিন্ন জনপদের উত্থান ও পতন। কয়েক হাজার বৎসর আগের নদীপথের ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল যেসব জনবসতি এখন তা প্রত্নতত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে। অপরদিকে নবগঠিত চরভূমিতে যেসব জনবসতি গড়ে উঠেছে সেগুলির ইতিহাস মাত্র কয়েক শতাব্দীর।

চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নাঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। ত্রয়োদশ শতকের পরে চব্বিশ পরগনার নিম্নভূমি কোনও কারণে পরিত্যক্ত হয়। যে সব কারণে বসতি লোপ পেয়েছিল তার মধ্যে একটি হল অকস্মাৎ ভূমির অবনমন বা ধসে যাওয়া। পরে আবার ভূমির উত্থান ও সুন্দরবনের সৃষ্টি।

হাদিপুরে পাওয়া গেছে নিম্ন বাম চোয়ালের প্রস্তরীভূত পাঁচটি দাঁত, যা ভূতত্ত্ব মতে দশ হাজার বছর পূর্বেকার।

বাংলায় পূর্ণ নগরায়ণের যুগের প্রথম পর্ব প্রাক্-মৌর্য কালের অবস্থায়। এর আগে থেকেই অপেক্ষাকৃত দূর অঞ্চল থেকে বহু মানুষ চলে আসছিল ভাগীরথী ও তার দুটি শাখা সরস্বতী ও যমুনা নদী এবং এগুলির সাথে যুক্ত অন্যান্য উপনদীর তীরবর্তী ভূমিতে। এই সব নদীর নাব্যতা, কৃষিকাজের ও যোগাযোগের সুবিধা সেই প্রাচীন কাল থেকে মানুষদের আকৃষ্ট করেছিল।

অতীতে দক্ষিণবঙ্গে বিচিত্র নদীর জালে বেষ্টিত ছিল অসংখ্য ভূখণ্ড। নবোত্থিত ভূমি ছিল অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। বারোটি প্রধান দ্বীপ ছিল। তার মধ্যে একটি কুশদ্বীপ। এই দ্বীপের মধ্যে ছিল চব্বিশ পরগনার বসিরহাট, খুলনার সাতক্ষীরা ও যশোরের বনগাঁর অংশ। তার সংলগ্ন চক্রদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ (বুড়ন), চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি। এ অঞ্চল উপবঙ্গ নামেও পরিচিত ছিল।

তথ্যঋণ :

১. বালান্দা-চন্দ্রকেতু ইতিকথা : বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী : এম.এ.জব্বার

২. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

গঙ্গারিডি ও চন্দ্রকেতুগড়

অতীতে গঙ্গা নদীর ও উভয় দিকের বিভিন্ন নদ-নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডই ছিল 'গঙ্গারিডি' জাতির 'গঙ্গে' বা 'গাঙ্গে' রাজ্য এবং বর্তমান বেড়াচাঁপা-হাড়োয়ায় ছিল খ্রিস্টপুর্ব ৩০০ অব্দের 'গঙ্গে' বন্দর-নগরী যা এখন 'চন্দ্রকেতুগড়' এই আধুনিক নামে প্রসিদ্ধ। 'গঙ্গে' বন্দর-নগরী যে এখনকার 'চন্দ্রকেতুগড়' তার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন নীহাররঞ্জন রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতুল সুর, অলোকশংকর মৈত্র প্রমুখ। ভারতের প্রাচীনতম প্রত্নস্থানগুলির অন্যতম এই অঞ্চল| এটাই বাংলার প্রাচীনতম নগরের নিদর্শন।

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্ন-সম্ভাবনার বিষয়টিতে প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন চৌরাশি গ্রামের ডাঃ তারকনাথ ঘোষ। তাঁর উদ্যোগের ফলেই ১৯০৭ সালে এসেছিলেন এ এইচ লংহার্স্ট সাহেব ও ১৯০৯ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন গ্রিক রচনায় দক্ষিণ বঙ্গে তাম্রলিপ্ত ছাড়াও গঙ্গে বন্দর-নগরীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন চিনা রচনাতেও 'গঙ্গে'র উল্লেখ আছে। চন্দ্রকেতুগড় পরবর্তী যুগগুলিতে কী নামে পরিচিত ছিল তা আজও অজানা। গঙ্গারিডির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ভূমিতে এখন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

এই গঙ্গারিডিরাই বাঙালি জাতির আদি পুরুষ এবং প্রাগার্য জাতি। প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই এই সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। বাঙালির জাতি-বিন্যাসে তার ধারার এখনও ব্যাপক উপস্থিতি। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুনীল কুমার রায়। মনে করা হয়, দক্ষিণের সাগরদ্বীপ থেকে উত্তরের সমগ্র চব্বিশ পরগনা এলাকা জুড়ে গঙ্গার প্রবাহপথে এই প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং চন্দ্রকেতুগড় ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

সতীশচন্দ্র মিত্র, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ চন্দ্রকেতুগড়কেই 'গাঙ্গে' বন্দর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শত্রুর আক্রমণ, ঝড়ের প্রকোপ থেকে জলযান, পোতাশ্রয় ও পণ্যদ্রব্য বাঁচাতে প্রাচীন ভারতের বন্দরগুলির অবস্থান ছিল নদীর মোহনায় বা বদ্বীপ অঞ্চলে – যা ছিল নদীপথে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে, পদ্মা-বিধ্যাধরী-যমুনা নদী হয়ে রায়মঙ্গল নদীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর-এর সাথে সংযুক্ত চন্দ্রকেতুগড় ছিল আদর্শ স্থান। এই সভ্যতাকেন্দ্রের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বিশেষত রোমের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

সুদূর অতীতে খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের মানুষ বাণিজ্যসূত্রে এসে চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে 'কলোনি' স্থাপন করে বসতি করেছিলেন। এরা তমলুক অঞ্চলেও বসতি করেছিলেন। প্রাপ্ত লিপিগুলি সাক্ষ্য দেয়, এই অভিবাসীরা ব্যবসার কারণে এসে ক্রমশ হলেন জমিদার ও আঞ্চলিক শাসক - ঠিক যেন বাংলায় ইংরেজদের বহু যুগ আগেকার পূর্বসূরী।

ব্যবসায়িক সামগ্রীর মধ্যে প্রধান ছিল মশলা, সুতিবস্ত্র, হাতির দাঁত, সোনা, রুপো, তামা আর ছিল ঘোড়ার ব্যবসা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা বারানসী হয়ে 'চন্দ্রকেতুগড়' বন্দর-নগরী দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যেত পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে। সেই সময় ক্রিটবাসীদের সঙ্গে বঙ্গবাসীরা যে প্রচুর বাণিজ্য করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও নদীসঙ্কুল বঙ্গের অন্যত্র আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্য থেকে। ক্রিট ও মিশরীয়দের উপনিবেশ শুধুমাত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেই ছিল না, চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলাতেও ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে ও হরিনারায়ণপুরে সিলমোহর ও মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাতেও ক্রিট ও মিশরীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রেও দেখা যায় যবুনা (যমুনা) নদীর ধারা ভাগীরথীর পুব দিক থেকে বেরিয়ে ইছামতীতে পড়েছে। পরে নীচের দিকে ঐ নদী যবুনা নামে প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গল দিয়ে শেষে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

বেড়াচাঁপা-হাড়োয়া অঞ্চলে যেসব প্রাচীন প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে মাটির ফলকে গণ-রাজ্যের নামমুদ্রা, রাজার নামমুদ্রা, ধনী চাষির নামমুদ্রা, ধান চালান দেবার জন্য অনুমতিপত্র, রক্ষাকবচের ছাপ, ধনী চালের কারবারির নামমুদ্রা, 'দ্বিজন্ম' নামের এক বঙ্গসন্তানের(?) নামমুদ্রার ছাপ, হাড়ের তৈরি ভাস্কর্য, হাড়ের তৈরি উৎসৃত বা ব্রতমূলক স্তুপ, অনেক বৌদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন বৌদ্ধদেবীর মূর্তি, বিষ্ণমূর্তি, মাটির ফলকে 'ধন্যেজয়ী' দেবীর, যক্ষীর, মৎসদেবীর প্রতিমূর্তি।

শিল্পরুচির আভাস পাওয়া যায় নানা মাপের ও আকারের মাটির তৈজসপত্রে, পাথর, কাঁচ ও বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারে। প্রাপ্ত মূর্তিগুলি তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে প্রাক্-মৌর্য যুগ অবধি আদিম লোকশিল্পের পরিচয় দেয়। পরে মথুরা ও গন্ধার শৈলীর প্রভাব আসে।

মাটির তৈরি দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরেই চন্দ্রকেতুগড়, খনা মিহিরের ঢিবি, ইটাখোলা এবং নুনগোলা ইত্যাদি স্থানে খননের মাধ্যমে সাতটি (মতান্তরে পাঁচটি) পৃথক সাংস্কৃতিক স্তর বা পর্বের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(১) প্রথম পর্বটি (প্রাক্-মৌর্য) ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পর্যায়ের স্তরকে নির্দেশ করে।

(২) দ্বিতীয় স্তর (মৌর্য) ৩০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ঘোষণা করে দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিদর্শনাবলির মধ্যে লম্বা গলার লাল মৃৎপাত্র ; কানাবিহীন বড় গোলাকার পেয়ালা ও বাটিকা; কালো, সোনালি এবং বেগুনী রং-এর উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র; ধূসর রং-এর সাধারণ মৃৎপাত্রের টুকরা; তামার তৈরি চোখে সুরমা লাগাবার দণ্ড (Antimony rod); ও হাতির দাঁতের সামগ্রীর খণ্ড ; ছাপাঙ্কিত তাম্র মুদ্রা ; লিপিবিহীন ছাঁচে ঢালা তাম্র মুদ্রা ; এবং বেশ কিছু পোড়ামাটির সামগ্রী যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুঁতি, নামাঙ্কিত সীল ও সীলমোহর রয়েছে।

(৩) তৃতীয় স্তর (শুঙ্গ) ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

(৪) চতুর্থ স্তরটি (কুষাণ) ৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ। চতুর্থ স্তরটি কুষাণ যুগের সমসাময়িক এবং স্তরটি আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। এ স্তর হতে রোমক 'রুলেটেড' (নকশা করা) পাত্রের অংশ বিশেষ; কালো অথবা অনুজ্জল লাল (mat-red) রং-এর 'অ্যামফোরা' (amphorae) বা গ্রিস দেশীয় মৃৎপাত্রের বেশ কিছু ভাঙ্গা অংশ; ছাপাঙ্কিত নকশাযুক্ত মনোরম লোহিত মৃন্ময়; ধূসর মৃৎপাত্র; এবং নিখুঁতভাবে ছাঁচে তৈরি পোড়ামাটির ক্ষুদ্র মূর্তি পাওয়া গেছে।

(৫) পঞ্চম স্তরটিকে (৩০০-৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) গুপ্ত যুগের বলে চিহ্নিত করা হয়।

(৬) ষষ্ঠ স্তরটিকে (৫০০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) গুপ্তোত্তর যুগের বলে চিহ্নিত করা হয়।

(৭) সপ্তম স্তরটিকে(৭৫০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ) পাল-চন্দ্র-সেন যুগের বলে চিহ্নিত করা হয়।

পঞ্চম থেকে সপ্তম স্তরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সীল ও সীলমোহর; পোড়া মাটির সামগ্রী ; ছাপাঙ্কিত নকশাযুক্ত ও ছাঁচে নির্মিত মৃৎপাত্র। এ স্তরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে ১৪ ফুটের বেশি উচুঁ 'সর্বত-ভদ্র' রীতির ইট নির্মিত বিশাল একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কোন বিশেষ দেব-দেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় ধর্মীয় এমন কোন নমুনা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে, গুপ্ত স্তর থেকে সূর্য্য দেবতার প্রতিকৃতি একটি বেলে পাথর ফলকের নিম্নাংশে পাওয়া গেছে । পঞ্চম স্তরের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই কম , এগুলি সম্ভবত পাল পর্যায়ের বলে ধরে নেওয়া হয়।

এখানে ধর্মীয় ও আচার সংক্রান্ত নিদর্শনাবলি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে আদিম ধরিত্রি-দেবী, মাতৃকা মূর্তি, যক্ষ, যক্ষিণী, নাগ, পুরুষ বা নারী মুর্তি, কখনও পশুচালিত যানে দণ্ডায়মান এবং পাখাযুক্ত দেব-দেবী রয়েছে। আবার ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন বস্তুও পাওয়া গেছে । পোড়ামাটির সামগ্রীতে বিশেষ করে পোশাক অথবা শারিরীক সাধারণ বৈশিষ্ট খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর গ্রেকো-রোমান যোগাযোগের গভীর প্রভাব দেখা যায় । চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গেছে প্রেমবিলাসী যুগলের অগণিত পোড়া মাটির মূর্তি।

অলঙ্কারযুক্ত পুরুষ ও নারী মূর্তিসমূহ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে স্বর্ণকারের শিল্পের অনুকরণ করা হতো । পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের অতি মসৃন প্রস্তর স্তম্ভ, ব্রাহ্মী লিপির সিলমোহর, রৌপ্য মূদ্রা; শুঙ্গ যুগের টেরাকোটা ফলক; কুষাণ যুগের শিলমোহর, বুদ্ধ মূর্তি, নারী মূর্তি, কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের স্বর্ণ মূদ্রা, বিভিন্ন খেলনা; গুপ্ত যুগের জৈন মূর্তি, স্বর্ণ মূদ্রা। এখানকার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাক-মৌর্য যুগের পয়ঃপ্রণালী।

হাদিপুরে এক পুকুর খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে ব্রাহ্মী ও লিপির নামমুদ্রালেখ ও মাটির পাত্র। সন্নিহিত অঞ্চলে এরূপ নব্বুইটিরও বেশি লেখ মিলেছে। এগুলি প্রথম শতকের শেষ পাদ থেকে পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকের। লেখগুলির ভাষা উত্তর-পশ্চিমী অথবা গন্ধারী প্রাকৃত, স্থানীয় প্রাকৃত নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে খনামিহিরের ঢিবিতে মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে । কেউ কেউ মনে করেন, এই মন্দির সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মন্দিরের নিদর্শন।

'চন্দ্রকেতুগড়' নামটি নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। চন্দ্রকেতুগড় নামে এই অঞ্চল অভিহিত হলেও পির গোরাচাঁদের কিংবদন্তির সমসাময়িক রাজা চন্দ্রকেতুর রাজত্বকাল ইসলামি অভিযানের পূর্বের নয়। অথচ চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীনতম বসতির পর্বটি প্রাক-মৌর্য যুগের প্রথম স্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ের। আবার বসতির শেষ তথা সপ্তম পর্বের কালসীমা পাল-সেন যুগ পর্যন্ত।

চন্দ্রকেতুগড়ে পাঠান যুগের প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পির গোরাচাঁদ ও রাজা চন্দ্রকেতুর কিংবদন্তি ও পুঁথি সাহিত্যের রচনাকাল প্রাচীন নয়।

গবেষক এম. এ. জব্বারের অভিমত, গাঙ্গেয় উপত্যকায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে নয় জন রাজা ছিলেন। শুশুনিয়া শিলালিপিতে উল্লেখিত রাজা চন্দ্রবর্মা তাঁদের একজন। আর তাঁরই অপর নাম চন্দ্রকেতু।

গুপ্ত যুগের সময় থেকে বিশেষ করে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সুন্দরবন সন্নিহিত দক্ষিণাঞ্চলের উর্বরভূমিতে বসতি সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু নদীখাতসমূহের স্থানান্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মহামারীর কারণে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে অনেক বসতি পরিত্যক্ত হয়। পাঠান-মোগল শাসকদের ও বসন্ত রায়-প্রতাপাদিত্যের উদ্যোগে আবার আবাদ ও বসতি হয়।

বিশালাকার নদীর গতিপথের ধারে আড়াই হাজার বছর আগে যে প্রাণবন্ত বন্দর-নগরী ও বিস্তীর্ণ জনপদগুলি বিরাজমান ছিল তার প্রত্ন-উদ্ধার, লোক-ইতিহাস নির্মিতি ও বৈজ্ঞানিক চর্চা দরকার - অবশ্যই পির গোরাচাঁদ ও রাজা চন্দ্রকেতুর কিংবদন্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে।

এখানকার অমূল্য প্রত্নবস্তু পাচার হয়ে চলেছে বিদেশে। এর প্রতিরোধের অনেক চেষ্টা করেছিলেন এম. এ. জব্বার, দিলীপ কুমার মৈতে, গৌরীশঙ্কর দে, মোঃ আসাদ-উজজামান প্রমুখ।

চন্দ্রকেতুগড়ে ২০০৫ সালে এসেছিলেন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি ও অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, চন্দ্রকেতুগড়কে নিছক একটা গড় হিসেবে দেখলে চলবে না । চন্দ্রকেতুগড় ঘিরে একটা বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখানে নতুন করে উৎখনন হলে বাংলার ইতিহাস পুনর্নির্মাণের বহু মূল্যবান উপাদান মিলতে পারে।

এখানকার নিদর্শনগুলির প্রধান অংশ কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম ও প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু নিদর্শন শহর এবং শহরের বাইরে ব্যক্তিগত সংগ্রহেও রয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ের বিষয়ে দিলীপ কুমার মৈতের সংগ্রহশালা আছে বেড়াচাঁপাতে ও এম. এ. জব্বার সাহেবের সংগ্রহশালা আছে হাড়োয়াতে। বেড়াচাঁপাতে রাজ্য সরকারের সংগ্রহশালা খোলা হয়েছে।

তথ্যঋণ :

১. বালান্দা-চন্দ্রকেতু ইতিকথা : বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী : এম.এ.জব্বার
২. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে
৩. বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪. বঙ্গজন সভ্যতা নমোজাতির আত্মপরিচয় : সুনীল কুমার রায়
৫. চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ সমৃতি মহাবিদ্যালয় মুখপত্র 'চেতনা' - প্রথম প্রকাশন ২০০৪
৬. চন্দ্রকেতুগড় : প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি : অলোকশংকর মৈত্র : 'দেশ' ১১ মার্চ ১৯৯৫
৭. Treasures of the State Archaeological Museum West Bengal Vol.1, Vol.2
৮. Chandraketugarh : A Lost Civilization : Gourishankar De and Shubhradip De
৯. Chandraketugarh : A Treasure House of Bengal Terracottas by Enamul Haque, Dhaka, The International Centre for Study of Bengal Art, 2001
১০. আনন্দবাজার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১১. https://bn.wikipedia.org
১২. http://www.historyofbengal.com

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ পাল-সেন যুগ ও পাঠান যুগ

পাল-সেন যুগে দক্ষিণ বঙ্গে বকদ্বীপ বা বাগড়ি নামে অভিহিত হত। প্রাচীন বাগড়ির পাঁচটি ভুক্তির মধ্যে একটি ছিল বালান্দা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালান্দায় একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। বালান্দা (লাল মসজিদ) এবং বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের সঙ্গে বৌদ্ধ সংযোগ ছিল। বালান্দা নামক স্থানে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় দরবারে এখনও রক্ষিত। বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য সিদ্ধেশ্বর ধনরত্ন ১৩৮৪ থেকে ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন।

বালান্দার প্রাচীন ভাঙ্গা ইমারতের কারুকার্য দেখে বোঝা যায় যে এটি বৌদ্ধবিহারের অবশেষ। ভাঙড়ে প্রাপ্ত ১০/১২ শতকের মঞ্জুশ্রী মূর্তি সম্ভবত আদিতে বালান্দা বৌদ্ধবিহারেই রক্ষিত ছিল।

সুন্দরবনে প্রাপ্ত ১১১৮ শকের একটি তাম্রলিপিতে ‘ধামহিতা’ গ্রামে বৌদ্ধবিহারের জন্য দানপত্রের উল্লেখ আছে। শূন্যপুরাণে নদিয়া জেলায় ‘কনক’ (সুবর্ণ) বিহারের উল্লেখ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল।

পিলখানায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বৌদ্ধ মঠের উপর নির্মিত হয়েছে। মুসলমান অধিকারের পূর্বে বালান্দা নিম্নবঙ্গের ‘বালবল্লভী’ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট বালান্দার শাসনকর্তা ছিলেন। অতীতে বালান্দা অতি উৎকৃষ্ট মছলন্দ বা মাদুরের জন্য বিখ্যাত ছিল।

একটি শিলালিপি সাক্ষ্য দেয় যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে ধমনপাল নামে একজন ভূস্বামী সুন্দরবনের পশ্চিমদিকে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

হাবড়া-সন্নিহিত এলাকায় অনেক প্রাচীন জনপদ ছিল। হাবড়ায় উপর দিয়ে বহে যেত পদ্মা নদী বিদ্যাধরীর অভিমুখে। এই এলাকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনেক প্রত্ননিদর্শন মিলেছে।

গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে যমুনা-গর্ভে সুন্দর ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। গাইঘাটার শিমুলিয়া গ্রামের মঙ্গলপোতায় প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন মিলেছে। বৌদ্ধ ‘স্তূপ’-এর অপভ্রংশ ‘থুবা’ নামের চিহ্ন নিয়ে আছে কামারথুবা, ডহরথুবা, নগরথুবা ইত্যাদি। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন মিলেছে নীলগঞ্জের কাছে মাধবপুরে।

নাথ-যোগীদের প্রাচীন সাধনপীঠ তথা সিদ্ধাচার্য নাথ-যোগী গোরক্ষনাথের মন্দির ছিল তেঘড়িয়াতে। প্রাচীন কলকাতার চৌরঙ্গির জঙ্গলে নাথ-যোগী চৌরঙ্গিনাথের মন্দির ছিল।

সেন রাজত্বে, মতান্তরে শশাঙ্কের রাজত্বকালে, সমতটের নানাস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - হাতিয়াগড়ে অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দেগঙ্গায় (জামালপুরে?) গঙ্গেশ্বর শিব, গোবরডাঙ্গার নিকট লাউপালাতে পোড়া মহেশ্বর শিব, জলেশ্বরে জলেশ্বর শিব।

জাফর খাঁর দ্বারা ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সপ্তগ্রাম তথা হুগলি গৌড়ের সুলতানের অধিকারে আসার ফলে নদিয়া ও চব্বিশ পরগনার উত্তরাংশ সপ্তগ্রামের অর্ন্তভুক্ত হয় । চব্বিশ পরগনা, যশোর ও খুলনার সুন্দরবনের এলাকা পরে খান জাহান গৌড়ের অধিকারে আনেন ।

বাংলার ইতিহাস বেশ কিছুকাল ধরে মোগল ও পাঠানের ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । বেশিরভাগ সময়েই পাঠান প্রধানগণ এবং হিন্দু জমিদাররা মোগলদের বিরুদ্ধে একত্রিত হত । উভয়েই মোগলদের বহিরাগত আক্রমণকারী মনে করত । পাঠানরা হিন্দু প্রভুদের অধীনে দুঃসাহসিক লড়াই করত আবার সেরূপভাবে হিন্দুরাও সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, পাঠান প্রধানদের অধীনে যুদ্ধ করত ।

পরবর্তীকালের ইসলামি প্রশাসন এখানে দেরিতে প্রবেশ করলেও আরবের বাইশ আউলিয়ার অন্যতম পির গোরাচাঁদ (সৈয়দ আব্বাস আলি) উত্তর চব্বিশ পরগনায় এবং পির বড়খাঁ গাজি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আপামর মানুষের সান্নিধ্যে আসেন ।

পাঠান রাজত্বে সমগ্র বাংলায় ছোট-বড় অনেক সামন্ত বা ভুঁইয়া ছিলেন । পাঠান প্রশাসক খাঁ জাহান আলি প্রথম পরিকল্পিতভাবে সুন্দরবনের উত্তরাংশে নদী-বিল-বাওড়-বেষ্টিত অনাবাদি ভুমিকে আবাদযোগ্য করেন । পরে এই অঞ্চল যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের অধীনে আসে ।

বর্ধমান অঞ্চলে ১৫৭৫-১৬২৫ সালে পাঠান বিদ্রোহ ও ১৭০০-১৭৫০ সালে বঙ্গে বর্গী হাঙ্গামার জন্য উচ্চ সমাজের বহু মানুষ রাঢ় ত্যাগ করে নিম্নবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বসতি করেন ।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে
২. নবীন জেলা পুরাতন ঐতিহ্য : কৃষ্ণ দেবনাথ
৩. বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র
৫. A Statistical Account of Bengal : Sundarbans : W.W.Hunter

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◇ রাজা চন্দ্রকেতু ও পির গোরাচাঁদ

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি বিপ্রদাসের রচনায় বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা বিষয়ে এক চন্দ্রকেতু রাজার উল্লেখ আছে। রাজা চন্দ্রকেতু ও পির গোরাচাঁদের বিবরণ আছে অনেক ইসলামি বাংলা সাহিত্যে। 'বাংলায় ভ্রমণ' বইতে চন্দ্রকেতুকে বালান্ডা পরগনার রাজা বলা হয়েছে।

লোকশ্রুতি আছে, রাজা চন্দ্রকেতুর প্রতিষ্ঠিত ভবানীদেবীকে তাঁরই এক পুরোহিত মুসলমান আক্রমণের ভয়ে পানিহাটি গ্রামের নির্জন গঙ্গাতীরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা চন্দ্রকেতুর এক বংশধর রাজা রামচাঁদ পরে দেবী ভবানীর মন্দির করে দেন। পানিহাটিতে রাজা চন্দ্রকেতুর নির্মিত গড়, ঝিল ও পুষ্করিণীর নিদর্শন আছে।

ইতিহাস গবেষক কমল চৌধুরির মতে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের শেষে সপ্তগ্রামের মহারাজা চন্দ্রকেতু পানিহাটিতে গড় নির্মাণ করেছিলেন ও কুতব মিনারের পাশের লৌহস্তম্ভে তাঁর নামের উল্লেখ আছে।

বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, চন্দ্রকেতু হয়তো লোককথারই ভ্রাম্যম্যন নায়ক। আর সত্যিই যদি দেউলিয়ায় কোন রাজার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব থাকে তবে তিনি 'রাজা উপাধিধারী চন্দ্রকেতু নামক সমৃদ্ধিশালী একজন গোঁড়া হিন্দু জমিদার' (শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'মিহির' মার্চ ১৮৯২)।

রাজা চন্দ্রকেতুর ও পির গোরাচাঁদের বিষয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তির পক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত তথ্য, মুদ্রা, লিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি পাওয়া যায় না।

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে পির হজরত শাহ সৈয়দ আব্বাস আলি গাজির নেতৃত্বে বাইশ জন আউলিয়া মক্কা থেকে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে অবস্থিতি করেন। তাঁদের আস্তানাগুলির মধ্যে ছিল রায়কোলা, কাজিপাড়া, ক্যানিং, ঘুটিয়ারি, দেগঙ্গা, সোহাই, হাড়োয়া, খামারপাড়া, আঁধারমানিক, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সালতিয়া (নৈহাটি), শ্যামনগর ইত্যাদি।

মূলত ইসলাম ধর্মের হয়েও পির গোরাচাঁদ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের লোকদেবতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হাড়োয়ায় পির সাহেবের পবিত্র মাজার ছাড়াও বাংলার নানা প্রান্তে তাঁর অজস্র প্রতীকী মাজার ছড়িয়ে আছে - সেখানে আছে দরগা বা নজরাহ। বসিরহাট ও বারাসত মহকুমার মধ্যে পির সাহেবের প্রতীকী মাজার আছে বামনপুকুর, কামদেবপুর, এয়াজপুর, ভাসিলা, গাঙধুলোট, গোঁসাইপুর, সোহাই, নেহালপুর ইত্যাদি স্থানে।

পির একদিল শাহ রাজি-র কর্মক্ষেত্র বারাসতের কাজিপাড়াতে। সেই মধ্যযুগে পাশের সুঁটি (সুবর্ণবতী) নদী বেগবান ছিল। কাজিপাড়ায় তাঁর সমাধি আছে।

পির গোরাচাঁদের বোন ছিলেন পিরানি সৈয়দ জয়নাব খাতুন (রওশান বিবি) । তারাগুনিয়া গ্রামে ইছামতীর তীরে তাঁর সমাধি আছে । বাদুড়িয়ার আঁধারমানিকে পির শাহ চাঁদের সমাধি, হিঙ্গলগঞ্জে সাভরন পিরের সমাধি ও চারঘাটে ঠাকুরবর পিরের সমাধি আছে ।

বসিরহাটের শাহি মসজিদ (শালিক মসজিদ) বাংলার দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদ (১৪৬৬ খ্রি.) । এই মসজিদের স্থানেই তার আগে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মোঃ আলাউদ্দিন একটি মসজিদ করেছিলেন ।

তথ্যঋণ :

১. পরিপার্শ্ব পার্ষদ পীর গোরাচাঁদ : বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

৪. চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন : কমল চৌধুরী

৪. চন্দ্রকেতু (বাং ১২৮৫) : ঐতিহাসিক উপন্যাস। চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের যুদ্ধ : কেদারনাথ চক্রবর্তী

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ মোগল যুগ ও রাজা প্রতাপাদিত্য

সম্রাট আকবরের রাজত্বে বাংলা সুবার অর্ন্তগত সরকার সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম)-র অধীন ভাগীরথীর পূর্ব দিকের ভূখণ্ড রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্য ছিল । পরে তার অধিকাংশ নদিয়া রাজের অধীন হয় । ইংরেজ রাজত্বে আবার তা জেলা নদিয়া, চব্বিশ পরগনা, যশোর ও খুলনার মধ্যে ভুক্ত হয় ।

মোগল যুগে সরকার সপ্তগ্রামের অধীন এ অঞ্চলে রাজস্ব তথা জমিদারি হিসেবে অনেকগুলি পরগনা ছিল । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আনওয়ারপুর (বারাসত), বুড়ন (সাতক্ষীরা), পুঁড়া (বাদুড়িয়া থানা), বালিন্দা (হাড়োয়া), বালিয়া (বসিরহাট), হাবেলি শহর (হালিশহর), হোসেনপুর (কলরোয়া), ধুলিয়াপুর (ঈশ্বরীপুর), শ্রীরাজপুর (সিরাজপুর ? / সরফরাজপুর ?), কলরোয়া, মাইয়েহাটি (বয়রা বিলের পূর্বে), হিলকি (সাতক্ষীরা), হাতিয়াগড় (ডায়মন্ড হারবার) কলিকাতা, মাগুরা (কলকাতার দক্ষিণ), মেদিনীমল (ক্যানিং), মুড়াগাছা (ডায়মন্ড হারবার), সরকার সুলাইমানাবাদের অধীন পরগনা কুশদহ (গোবরডাঙ্গা), মুলঘর (কোবতকের দক্ষিণে) ।

আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ঘুর্ণিঝড়ে দু লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিশাল অঞ্চলকে জলমগ্ন করে ফেলেছিল । পরে সামুদ্রিক ঝড় হয়েছিল ১৬৮৮ সালে ও ১৭৩৭ সালে। আর ছিল মগ-পর্তুগিজদের ক্রমাগত অত্যাচার । জলদস্যুরা জলপথে এসে লোকালয়ে লুণ্ঠন করত ও পুরুষ-নারী-শিশুদের ধরে নিয়ে দাস ব্যবসায়ে চালান করত । দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮২৪ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এক সংক্রামক জ্বরের তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায় ।

মোগল যুগে বড় ভুঁইয়ারা সম্রাটকে নামমাত্র স্বীকার করে কার্যত স্বাধীনভাবে চলতেন । ফলে মোগল বাহিনীকে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে । পাঠান রাজত্বের অবসানের পর প্রতাপাদিত্যের পিতা ও পিতৃব্য গৌড় থেকে সুদূর দক্ষিণবঙ্গে প্রথম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিদ্রোহী ভুঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্য বৃহৎ যশোররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠে । বস্তুত গৌড়বঙ্গের অবসানে যশোররাজ্যের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ঘটে - যা পরে যশোর-খুলনা-চব্বিশ পরগনা-নদিয়া নামে পরিচিত হয় ।

যশোর রাজ্য ও সমাজ প্রতিষ্ঠার কালে এই কায়স্থ রাজপরিবারের সম্পর্কিত বহু বিত্তশালী ও প্রভাবশালী মানুষ মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলি ও পূর্ববঙ্গ থেকে এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসতি করেন । এক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা ছিল প্রতাপের একান্ত সহচর শঙ্কর চক্রবর্তীর । শঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর পূর্ব বাসভূমি হুগলি থেকে বহু পরিবারকে আনেন ।

সে সময়ে বাদা কেটে বসত করার জন্য কোনও দাম দেওয়ার ব্যাপার ছিলনা, তবে জমি নথিভূক্ত হওয়ার পর কর দিতে হত ব্রাহ্মণদের জমি নিষ্কর হওয়ার জন্য তাঁরা বিশাল সম্পত্তি নিয়ে রাজ-সেবা আর সমাজ-শাসন করে দিব্বি সুখে কাটাতেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল সেনা শেষ অভিযান চালায় বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে। মোগল সেনাধ্যক্ষ ইসলাম খাঁ নৌবাহিনী নিয়ে পদ্মা, জলঙ্গী, হয়ে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমে শালকা (ঢিবি)-তে পৌঁছল। সেখানে যুদ্ধে রাজকুমার উদয়াদিত্যের পরাজয় হয় এবং মোগল বাহিনী আরও এগিয়ে ধুমঘাটের কাছে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের (১৬১২) পর যশোহর রাজ্যের অধিকাংশ নদিয়া রাজের অধীন হয়।

প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে আগত মোগল বাহিনীর অনেক অবাঙালি মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং পরে বাঙালি সমাজে মিশে যান। এভাবে পশ্চিমে ভাগীরথী থেকে পূর্বে মধুমতী, উত্তরে কপোতাক্ষ, মধ্যে যমুনা ও অন্যান্য নদী বরাবর ব্যাপক জনবসতি ঘটে। গড়ে ওঠে নতুন নতুন সমৃদ্ধ জনপদ। এই অঞ্চলের বর্তমান জনবিন্যাসের রূপরেখা প্রতাপাদিত্য-বসন্ত রায়ের উদ্যোগ ও ছত্রছায়ায় গঠিত। 'যশোর সমাজের' কাঠামো এখনও অনেকাংশে বজায় আছে। জনবিন্যাসে পরবর্তী প্রভাব ফেলে মারাঠা আক্রমণ তথা বর্গি হাঙ্গামা, ইংরেজ রাজত্ব ও দেশ-বিভাগ।

তথ্যঋণ :
১. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র
২. Bengal District Gazetteers - 24 Parganas : L. S. S. O'Malley

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◇ দেশের রাজা বণিক কোম্পানি

ইংরেজরা যে চব্বিশটি পরগনার জমিদারি স্বত্ব লাভ করেছিল তার অধিকাংশ ছিল যশোহর রাজ্যের ভূখণ্ড - যা মোগল রাজত্বের শেষ প্রান্তে নদিয়া রাজের, সাবর্ণ চৌধুরি ও অন্যান্য জমিদারদের অধিকারে আসে।

সুবা বাংলার জমির উপরে প্রভুত্ব তখন দুই স্তরে ন্যস্ত ছিল। উপরের স্তরে মালজমির রাজস্বভোগী মোগল শাসক এবং নীচের স্তরে বড় বড় পরগনার রাজস্ব আদায়কারী জমিদারবর্গ - যারা ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাঠান, রাজপুত ও ক্ষেত্রী। ইংরেজ বণিকদের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল নিরুপদ্রব ব্যাবসার স্বার্থে বাংলাতে একটি নিজস্ব শাসনাধীন উপনিবেশ স্থাপন করা।

পলাশির যুদ্ধের পরে ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মির জাফরের আনুকুল্যে খাজনা দেওয়ার শর্তে চব্বিশটি পরগনার জমিদারি স্বত্ব লাভ করে ('কলিকাতা জমিদারি বা চব্বিশ পরগনা জমিদারি' নামে)। ইতিমধ্যে ক্লাইভ ১৭৫৯ সালের ১৩ জুলাই সম্রাটের সনদের দ্বারা 'মনসবদার' ও 'উমরাহ' মর্যাদা লাভ করেন ও চব্বিশ পরগনার জায়গির লাভ করেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনত তার কর্মচারী 'জায়গিরদার ক্লাইভের' অধীন এক জমিদার হিসাবে পরিগণিত হল এবং চব্বিশ পরগনার জমিদারির খাজনা ক্লাইভকে দিতে বাধ্য হল।

ক্লাইভ সাহেব সুবা বাংলার (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার) দেওয়ানি পাওয়ার জন্য দুর্দশাগ্রস্ত দিল্লীশ্বরের সাথে প্রয়াগে সাক্ষাৎ করেন। ১২ আগস্ট ১৭৬৫ তারিখে সম্রাট আহ্লাদপূর্বক কোম্পানির পক্ষে ক্লাইভকে দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত করলেন। সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস লেখক লিখেছেন, একটা গর্দ্দভ বিক্রি করতে যে সময় লাগে দিল্লীশ্বর তারও কম সময়ে এই গুরুতর কাজ সমাধা করেন। ক্লাইভও ঐ তিন রাজ্যের রাজস্ব থেকে সম্রাট শাহ আলমকে মাসিক দুই লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে আগেই ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল। সম্রাটের ১৭৬৫ সালের দেওয়ানির সনদের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ক্লাইভ দশ বছর সুবা বাংলার অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান থাকার পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ান হিসাবে পরিগণিত হবে। ক্লাইভ দশ বছর সুবা বাংলার দেওয়ান ও 'ওমরাহ' থাকলেও তাঁর একান্ত বাসনা ছিল দিল্লির সম্রাটের অধীন সুবা বাংলার 'নবাব' হওয়া।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ কলকাতাসহ চব্বিশ পরগনার নিজ এলাকাতে নিজস্ব শাসন কায়েম করে। ১৭৯৩ সালে কলকাতা বাদে অবশিষ্ট চব্বিশ পরগনার দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব বিভাগ চালু করে। চব্বিশ পরগনার দেওয়ানি লাভ করার সময় এই জেলায় ছিল সদর (আলিপুর), ব্যারাকপুর ও ডায়মন্ড হারবার। বারাসত ও বসিরহাট সাবডিভিসনের প্রশাসন ন্যস্ত ছিল নদিয়া রাজের মধ্যে।

দেওয়ানি লাভের ফলে রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল বণিক কোম্পানি। নবাবের হাতে রইল আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাজ যা পরে বণিকরাই নিঃশব্দে নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। একদিকে তারা বলপ্রয়োগে ধ্বংস করল বাংলার তাঁত শিল্পকে অপরদিকে চলতে থাকল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের শোষণ।

দেওয়ানি লাভের পরে ইংরেজরা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে প্রথমেই সুন্দরবনের জমি উদ্ধারের কাজ শুরু করে। হাসনাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙ্গর, কুলপি, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, ক্যানিং-এ ১৭৮০ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে ব্যাপক জমি উদ্ধার হয়।

কোম্পানির আমলে প্রশাসন

চব্বিশ পরগনায় প্রথম সিপাই বিদ্রোহ হয় ব্যারাকপুরে ১৮২৪ সালে। ৪৭ রেজিমেন্টের দেশীয় সেনারা বিদ্রোহ করে এবং যারা ধরা পড়েছিল তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

সরকারি তথ্যে দেখা যায় ১৮৫৭ সালে চব্বিশ পরগনায় ৬১টি রাজস্ব কেন্দ্র বা পরগনা ছিল যার মধ্যে কয়েকটি হল - বসুরহাট (বসিরহাট) সাব-অর্ডিনেট জজ কোর্টের অধীন : আগরপাড়া (১৮টি জমিদারি এস্টেট; প্রধান জনপদ : টাকি); বালিয়া উত্তর (১৬১টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : বসিরহাট, বাদুড়িয়া, সিমুলিয়া, ধলতিথা, জাফরপুর, ট্যাঁটরা, সোলাদানা, রাজেন্দ্রপুর, পিপা, নলকুড়া); মাইহাটি (নদিয়া জেলা থেকে স্থানান্তরিত - ৮৮টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : দেবহাটা, শ্রীপুর, বরুণহাট, রহিমপুর, রঘুনাথপুর); পাইঘাটি (৮৬টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : ভাঙ্গড়হাট); হারুয়া (হাড়োয়া) সাব-অর্ডিনেট জজ কোর্টের অধীন : আমিরপুর (১টি এস্টেট); সাতক্ষীরা সাব-অর্ডিনেট জজ কোর্টের অধীন : বাজিতপুর (১৩টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : নলতা, রঘুনাথপুর, বড়সিমলা, নাঙ্গলা, তেঁতুলিয়া, কালীগঞ্জ, দমদমা, তরালি, রামনগর, শংকরকাটি); ভালুকা (১২টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : আসাসুনি, বুধহাটা, কয়ড়াঘাটি, পারুলিয়া); বুড়ন (১২০টি এস্টেট; প্রধান জনপদ : সাতক্ষীরা, বিথারি, আটুরিয়া, বৈকারি, ঝাউডাঙ্গা, মাধবকাটি, ভাটপাড়া, আগরদারি, বয়রা); সরফরাজপুর (৩৬টি এস্টেট; প্রধান জনপদ - পুঁড়া, শিবহাটি, শরিফনগর, সেনগঞ্জ, গোকুলপুর, কুড়াগাছি। এখানে যমুনা নদীর পরিত্যক্ত খাতে আছে পলতা ও বক্রচন্দ্র বাঁওড়)।

বারাসাত সাব-অর্ডিনেট জজ কোর্টের অধীন : আনোয়ারপুর (৩৯টি এস্টেট; প্রধান জনপদ - কদম্বগাছি, দত্তপুকুর, জয়পুল, কামদেবপুর, ঠাকুরপুকুর [বাদু বাজার], বালান্দা (২৫টি এস্টেট; প্রধান জনপদ - হাড়োয়া, গোঁসাইপুর, হাদিপুর, মাঝেরআটি, নয়াবাদ, বিহারি, খাতরা, চৈতল, জনার্দনপুর, চাঁদপুর, খুরদো, হরিপুর, গোপালপুর), চৌরাশি (নদিয়া জেলা থেকে স্থানান্তরিত - ২টি এস্টেট)।

কোম্পানির আমলে শিক্ষা

টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরি টাকিতে ১৮৩২ সালে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায়, চব্বিশ পরগনায় ১৮৭১-৭২ সালে ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল নৈহাটি, শ্যামনগর, হালিশহর, আগরপাড়া, সৈদপুর (সোদপুর), ইছাপুর, দমদম, বিষ্ণুপুর, কাদিহাটি, ছোট জাগুলিয়া, নিবোধয়, নলকুড়া, টাকি, গোবরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানে; বাংলা বিদ্যালয় ছিল মণিরামপুর, পলতা, খড়দা, নাটাগড়, সৈদপুর (সোদপুর), দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটি, বারাকপুর, রহড়া, বেলঘরিয়া, ইছাপুর, আড়িয়াদহ, বারাসাত, বাদু প্রভৃতি স্থানে।

কোম্পানির আমলে জনপথ

অতীতে জলপথই যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল। সব নদীই ছিল স্রোতস্বিনী। নদীতে ছুটে চলত বজরা, ছিপ, পানসি। প্রতাপাদিত্যের বিশাল নৌবহর ছিল - যা দাপিয়ে বেড়াত সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। সরকারি তথ্যে দেখা যায় ১৮৫৭ সালেও সোনাই, নোনা, যমুনা ও পদ্মা নদীতে যথেষ্ট জলপরিবহন চলত। টাকি থেকে গোবরডাঙ্গা স্টিমার চলত।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মানসিংহ বাদশাহি পথ ছেড়ে পূর্বে দত্তপুকুর থেকে বাদুড়িয়া হয়ে বসিরহাট অভিমুখে নতুন পথ 'গৌড়বঙ্গ রাস্তা' তৈরি করেছিলেন।

টাকির জমিদার কালীনাথ মুন্সির সৌজন্যে টাকি রোড তৈরি হয় ১৮৩০-এর দশকে।

টাকি রোড তৈরি হওয়ার পর ইংরেজরা ঘোড়ার গাড়িতে ডাক ব্যবস্থা শুরু করে। পরে ঐ ডাক-গাড়িতে যাত্রী বহনেরও ব্যবস্থা হয়। ডাক-গাড়িতে দূরত্ব হিসেবে ভাড়া ছিল। কুড়ি মাইল অন্তর অবস্থিত ডাক-বাংলোতে বিশ্রামের জন্য গাড়ি থামত। বসিরহাট থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য 'মতি শা'-র ঘোড়ার ডাক-গাড়ি চলত। বেলেঘাটার কালিয়ানি বিলের অংশটুকু গাড়ি ঠেলে, হেঁটে জল পার করে আবার গাড়িতে চাপতে হত। রেলপথ চালু হওয়ার পরে যাত্রী বহনের ডাক-গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

মার্টিন কোম্পানির বারাসত-বসিরহাট লাইট রেল চালু হয়েছিল ১৯০৫ সালে। বসিরহাট থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত চলত ছ্যাকরা গাড়ি। বসিরহাট থেকে চিংড়িঘাটা (হাসনাবাদ) ১৯০৯ সালে। টাকি রোডের বেলেঘাটা ব্রিজ থেকে খড়িবেড়িয়া, রাজারহাট হয়ে পাতিপুকুর ১৯১০ সালে। পাতিপুকুর থেকে বেলগাছিয়া (শ্যামবাজার) ১৯১৪ সালে। মার্টিন রেলের শেষ ট্রেন চলেছিল ১৩-০৬-১৯৫৫ তারিখে। নতুন বারাসত-হাসনাবাদ ব্রড গেজ রেলপথের কাজ শুরু হয় ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে। ট্রেন চলা শুরু হয় ০৯-০২-১৯৬২ তারিখে। শ্যামবাজার - বসিরহাট বাস চলে ১৯২৫ সালে।

তথ্যঋণ : ১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

২. A Statistical Account of Bengal. 24 Parganas : W.W.Hunter

৩. Bengal District Gazetteers - 24 Parganas : L. S. S. O'Malley

৪. A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916 : Monmohan Chakrabatti

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ

এই অঞ্চলের বিদ্রোহী বীর তিতুমিরের (মির সৈয়দ নিসার আলি) জন্ম ১৪ মাঘ ১৭৮২(?) খ্রিস্টাব্দ হায়দরপুর গ্রামে (চাঁদপুর)। শৈশবের শিক্ষা হায়দারপুরের মুনশি লাল মিঞা ও শেরপুরের পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যের কাছে। পরে বিহার শরিফে।

তিতুমির জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই যুদ্ধ বসিরহাট ও বারাসতের সমগ্র এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিতুর বিরুদ্ধে কলকাতায় লাটুবাবুর বাড়িতে জমিদারদের যে সভা হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, টাকির সদর নায়েব, নুরনগর ও রানাঘাটের নীলকুটির ম্যানেজার, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, যদুরহাটির দুর্গাচরণ চৌধুরি, বসিরহাট থানার কুখ্যাত দারোগা তথা সাহেব ও জমিদারদের অতি বিশ্বস্ত সেবক রামরাম চক্রবর্তী ওরফে মেটে চক্রবর্তী। বিভিন্ন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের সহায়তায় পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সফররাজপুরে আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা করে আত্মগোপন করেন। তিতু বারাসত ও কলকাতায় ইংরেজ দরবারে গিয়েও সুবিচার পান নি।

এর পর শুরু হয় তিতুর পরপর যুদ্ধ। ৬ নভেম্বর ১৮৩১ পুঁড়া আক্রমণ ও কৃষ্ণদেব রায়ের পলায়ন। ৮ নভেম্বর ১৮৩১ লাউঘাটির যুদ্ধে গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় নিহত। ক্রমান্বয়ে শেরপুরের নীলকর বেনজামিন পরাস্ত, গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বাদুড়িয়ার আলেকজান্ডারের পলায়ন, দারোগা রামরাম চক্রবর্তী নিহত।

সবশেষে ১৫ নভেম্বর ১৮৩১ গোকনার যুদ্ধে গোরা সেনা আবার বিধ্বস্ত। গোকনা আক্রমণের সময় জমিদার রায়নিধি হালদার দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে নাতি মধুসূদন হালদারকে ফেলে পালিয়ে যান। ১৪ নভেম্বর ১৮৩১ কলকাতা থেকে যে সৈন্যদল আসে তারাও পরাজিত হয়। পরে অশ্বারোহী ও কামান দ্বারা তিতুকে পরাস্ত করে। ইছামতীর দুপারের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে কামানের গর্জন শোনা গেল। বাঁশের কেল্লার পতনের ফলে তিতু শহীদ হন ১৯ নভেম্বর ১৮৩১।

জমিদারদের মধ্যে তিতুর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কেবলমাত্র খুলনার ভৈরব রায় ও ভুষণার মনোহর রায়। জমিদার মনোহর রায়কে আগেই দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল।

গোলাম মাসুম বা মাসুম খাঁ ছিলেন তিতুমিরের ভাগনে ও দলের সেনাপতি। বাঁশের কেল্লার পতনের পর তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন ও তাঁর ফাঁসি হয়। তিতুমিরের সহযোদ্ধা লোককবি ও মুজাহিদ সাজন গাজি বন্দী হয়ে সাত বছর জেল খাটেন।

তিতুমিরের নেতৃত্বে চালিত এই কৃষক অভ্যুত্থানের কিছুটা ধর্মীয় রূপ থাকলেও ওয়াহাবি নেতারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ছিল। বাংলার কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসে তিতুমিরের সংগ্রাম ও আত্মদান এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংরেজদের তুলনায় তাঁর যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিলনা। সম্বল ছিল তীর-ধনুক, লাঠি। ইংরেজদের ছিল রাইফেল আর কামান। ওয়াহাবি আন্দোলনের ধর্মীয় আবেদন সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তা ছিল সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। তিতুমির সেই বিদ্রোহের এক অনন্য নায়ক।

বিহারীলাল সরকারের বর্ণনায় 'তিতুর সঙ্কট-সঙ্কেত' -

''যেদিন হালদার মহাশয়ের সহিত তিতুর সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহারা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহারা অকসমাৎ মেটিয়ার গ্রামের দিকে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিসের এ কোলাহল? তিতু বুঝি সদলবলে আসিতেছে? তিতু আসিল না, তবে এ কিসের কোলাহল ?

সে রাত্রি কিছুই নিরূপিত হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কোলাকলের কারণ নির্ণয়ার্থ তিনটী ভদ্রলোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রেরিত লোকেরা গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁদের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পরন্তু একটু পুলকোদগমও হইল। তাঁহারা দেখিলেন, গ্রামের [মেটিয়া] প্রান্তসীমায় এক বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত। শিবির-সম্মুখে একজন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ। তাঁহার পরিধান, লাল কোট-পেন্টুলেন, মস্তকে টুপি, কটিদেশে চর্ম্মাবরণে নিবদ্ধ অসি। তাঁহার সম্মুখে অনেকগুলি কুলী উপস্থিত। তাঁহারা আরও দেখিলেন, অনেকগুলি সিপাহী ও গোরা যম-কিঙ্করবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিবির সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

পাঠক বুঝিলেন, ইঁহারা কাহারা ? ইতিপূর্ব্বে আলেকজেন্দার সাহেবের মুখে তাঁহার পরাভব এবং অত্যাচারের কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, কলিকাতার তাৎকালিক গবরণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক দুইটী কামান, একশত গোরা এবং তিনশত সিপাহীসহ কর্ণেল সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সাহেবের সম্মুখে কুলীরা উপস্থিত ছিল, তিনিই স্বয়ং কর্ণেল। কামান লইয়া যাইবার পথ পরিস্কার করিবার জন্য কর্ণেল সাহেব কুলীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। হঠাৎ হালদারগণ প্রেরিত তিনটি লোকের উপর কর্ণেল সাহেবের দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ঈঙ্গিত করিয়া, তাঁহাদের ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সাহেবের নিকট গমন করিলেন। ইনি তিন জনের মধ্যে সাহসী ছিলেন এবং ইংরেজি জানিতেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাকে জিঞ্জাসা করিলেন, - আপনি কে ?

বন্দ্যো। আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণ, - নিবাস গোকনায়।

সাহেব। আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?

বন্দ্যো। গত কল্য রাত্রিতে একটা কোলাহল শুনিয়াছিলাম। কিসের কোলাহল, তাই জানিতে আসিয়াছি।

সাহেব। আপনি তিতুমীরকে জানেন?

বন্দ্যো। আজ্ঞে জানি।

সাহেব। তিতু এখন কোথায়?

বন্দ্যো। নারিকেলবেড় গ্রামে।

সাহেব। আপনি তিতুকে চেনেন?

বন্দ্যো। তিতুকে আর চিনি না! তিতুকে কে না চেনে? সে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহার অত্যাচারে বাস করা দায়।

সাহেব। আমরা তিতুকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছি।

এই কথা বলিয়া কর্ণেল সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, আপনি আপনার সঙ্গী দুটী লোককে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে থাকুন। আমাকে নারিকেলবেড় গ্রামে লইয়া চলুন। মহাশয় স্বীকার পাইলেন। তাঁহার সঙ্গী দুইজন বিদায় লইয়া গোকনায় ফিরিয়া গেলেন।''

তথ্যঋণ :

১. পি এল টি-র 'তিতুমীর' নাটকের পরিচিতি পুস্তিকা, 'এপিক থিয়েটার' ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
২. বঙ্গজন সভ্যতা নমোজাতির আত্মপরিচয় / সুনীল কুমার রায়
৩. তিতুমীর : বিহারীলাল সরকার
৪. Bengal District Gazetteers - 24 Parganas : L. S. S. O'Malley
৫. The Young Zaminder [তিতুমিরের বিষয়ে] : শশীচন্দ্র দত্ত [H.B.Rowney - ছদ্মনামে]

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ নীল বিদ্রোহ

ইংরেজদের বাংলা অধিকারের কিছু পরেই নীলের চাষ শুরু হয়েছিল । বাংলায় প্রথম নীলচাষ হয় ১৭৭০-এর দশকে । শীঘ্রই নীল বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে পরিগণিত হল । জেলায় জেলায় নীলকরদের কুঠি ও কারখানা স্থাপন হল ।

অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার মহামারীর আকার ধারণ করল । ক্রমশ জনগণের ক্রোধ ও বিক্ষোভের পরিণতিতে নীল বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হল নদিয়া, যশোর, ও অন্যান্য জেলায় ।

মিঃ বানু নামে একজন ইংরেজ দেগঙ্গা অঞ্চলে আসেন নীলচাষ করার উদ্দেশ্যে । বানু সাহেবের অনেক মোসাহেব জুটে গেল । নীলকরের লোকেরা চৌরাশি, চাকলা, কলসুরের সমগ্র এলাকার জমিতে নিশান পুতে দিল । কলসুর, চৌকিপোতা, সরদার পাড়া, নসিমপুর, জীবনপুর, শেরপুর, মাটিকুমরা, সিরাজপুর, রায়পুর, চাকলা, শ্বেতপুর, বল্লভপুর, ঘোলদেড়িয়ার বিল, চাঁদপুর, কেয়াডাঙ্গা চাঁদপুর, বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় ছিল নীলকুঠি । মিঃ বানুর নিষ্ঠুরতা ও কর্মচারীদের অত্যাচার গ্রামের মানুষদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ।

জীবনপুরের কুঠির দেওয়ান ছিলেন মোহাম্মদ হেরাছতুল্লা । বাড়ি নিকটে রাজুকবেড়িয়াতে ।

ইতিমধ্যে দেওয়ান হেরাছতুল্লা মনে মনে বানু সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন ।

বিভিন্ন গ্রামের চাষিরাও ক্ষুব্ধ হয়ে হচ্ছিল । নীলকর সাহেবের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু রায়ত আবেদন করেন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট লেসলি ইডেনের কাছে । চৌরাশি পরগনার দুজন সাহসী মানুষ, শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি ও আমির বিশ্বাস ছিলেন আবেদনকারীদের মধ্যে । লেসলি ইডেন প্রজার পক্ষে রায় দিলেন । নদিয়া জেলার দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের বিদ্রোহের কথা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বাংলার ঘরে ঘরে । উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোবরডাঙ্গা, কলিঙ্গা, বাদুড়িয়ার চাষিরা ।

ঠিক এই সময় হেরাছতুল্লা দেওয়ানপদে ইস্তফা দিলেন । রাজুকবেড়িয়ার কাহার সম্প্রদায়ের লাঠিয়াল-সরদার ভীমচাঁদ কাহার হেরাছতুল্লার ডাকে সারা দিয়ে বানু সাহেবের ঘোড়া-সহিসের চাকরি ছেড়ে তার দলে যোগ দিলেন ।

তখন নসিমপুরের কুঠির খুব রমরমা । মিঃ বানু ফুর্তি করার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কলসুরের রাস্তা ধরে নসিমপুরের কুঠিতে । রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে থেকে ভীমচাঁদ বেড়িয়ে আসতেই তার চেনা ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ে । ভীমচাঁদ একলাফে ঘোড়ায় উঠেই ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাথি মেরে সাহেবকে দিলেন ফেলে ।

জখম সাহেব কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেই সায়েস্তা করতে চাইল হেরাছতুল্লা ও ভীমচাঁদকে আর চাষিদের উপর আরও অত্যাচার শুরু করল ।

আবার প্রতিশোধের প্রস্তুতি চলল । মাটিকুমরার দুর্ধর্ষ দুদ্ধিদীপ্ত মানুষ জরিপ শিকারি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে মানুষদের সমবেত করে জীবনপুর থেকে চাকলা পর্যন্ত রাস্তার দু-ধারে পাটকাঠির দেয়াল বানালেন ।

বিশ্বাসঘাতকদের কথা শুনে সাহেব ও মেমসাহেব আগেই সন্তর্পণে অকুস্থলে যেতেই জরিপ শিকারির লোকেরা আগুন লাগিয়ে দিল । বিস্তৃত আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা দেখে পালিয়ে আসে সাহেব, নীলকুঠি ফেলে চলে যায় কলকাতায় । অন্যমতে, সাহেব কুঠিতেই থাকে এবং সুবর্ণপুরের পুরকায়েত পরিবারের প্রধানকে কুঠিতে ফেলে অত্যাচার করার সময়ে ঐ পুরকায়েত ব্যক্তি সাহেবের পা কামড়ে দেয়, আর তার ফলে বিষক্রিয়া ও পচনেই সাহেবের মৃত্যু হয় ।

নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল উপস্থিতি খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র ও যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফের নাম । প্রশাসক হিসাবে আব্দুল লতিফই সর্বপ্রথম প্রজাদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের কথা সরকারের নজরে আনেন । নিজের চাকরিকে বিপন্ন করে আব্দুল লতিফ নির্ভীকভাবে সেই উত্তাল সময়ে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে যে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল ।

দক্ষিণবঙ্গে মোল্লাহাটির (বনগাঁ) বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির কুঠি ছিল সবচেয়ে বড় । নদিয়া, যশোর, খুলনা জেলা জুড়ে এদের ১৭টা কুঠি ছিল আর জমিদারি ছিল ৫৯৫টি গ্রাম জুড়ে । খুলনার হোগলা পরগনার নীলকর রেনি সাহেব খুব অত্যাচারী ।

খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জের নীলকর মোরেল সাহেবের সঙ্গে বড়খালি বা বারুইখলি গ্রামের বর্ধিষ্ণু প্রজা রহিমুল্লাহের সংঘর্ষ বাধে । রহিমুল্লাহ নীল চাষ করতে অস্বীকার করেন । মোরেল সাহেবের তিনশো-র বেশি লাঠিয়াল এক রাতে আক্রমণ করে রহিমুল্লাহের বাড়ি যা ছিল প্রায় দুর্গের মত । সারারাত লড়াই চলে । শেষে হিলি সাহেবের গুলিতে রহিমুল্লাহের মৃত্যু হয়। বারুইখলি গ্রামে চলে কুঠিয়ালদের অত্যাচার । রহিমুল্লাহের মৃত্যু নিয়ে মামলা চলেছিল ।

সে সময় ২৩/২৪ বছরের যুবক বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন খুলনা মহকুমার হাকিম । ঘটনার দিন তিনি পাশের ফকিরহাট থানায় কাজে এসেছিলেন । পরের দিন ঘটনা শুনে তিনি কয়েকজন সেপাই নিয়ে বারুইখলি গ্রামে হাজির হলেন । কুটির প্রধান কর্মচারী পলাতক দুর্গাচরণ সাহাকে বৃন্দাবন থেকে ও হেলি সাহেবকে বোম্বাই থেকে ওয়ারেন্টের বলে ধরে আনান ।

এই তদন্তের সময় নাকি কুঠির এক সাহেব এক হাতে এক লক্ষ টাকা আর এক হাতে পিস্তল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে আসে। পিস্তল ও টাকা অগ্রাহ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র তখনই সাহেবকে গ্রেপ্তার করেন। দুই বছর এই মামলার বিচার চলেছিল খুলনা, যশোর ও কলকাতায়। বিচারে চৌকিদারের ফাঁসি হয়, ৩৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু শেতাঙ্গ জুরিরা হিলি সাহেবকে বেকসুর খালাস দেয়। তবে মোরেল সাহেবের নীলকুঠির অবসান ঘটে।

অত্যাচারী নীলকর সাহেব যখন বঙ্কিমের মাথার দাম এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করে তখন বঙ্কিম একদিকে মোরেল সাহেবদের দাপট নির্মূল করছেন আর একই সঙ্গে স্থিরচিত্তে লিখে চলেছেন ‘দুর্গেশনন্দিনী’।

নীলকরদের বিরুদ্ধে সেসময়ের প্রতিষ্ঠিত মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা চাষিদের পাশে দাঁড়ান নি। চাষিদের পাশে সমস্ত শক্তি নিয়ে, এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্যতিক্রমী কয়েকজন পুরুষ - হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষ, নীলদর্পণ নাটক প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশির কুমার ঘোষ কার্যত এই আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে যুক্ত ছিলেন।

তথ্যঋণ :

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ : প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

২. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

৩. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

৪. সেকালের কৃতী বাঙালী : মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর : মন্মথনাথ ঘোষ

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ মুক্তি সংগ্রামের দিনলিপি

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে উত্তাল আন্দোলন সুরু হয় তার কিছু প্রভাব এ অঞ্চলে পড়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের খাতায় এই অঞ্চলের স্বদেশী ডাকাতদের 'খুলনা গ্যাং' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। খুলনা জেলার নাঙ্গলাতে ১৬ আগস্ট ১৯০৯, সোলেগাঁতিতে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১০, নন্দনপুরে ৩০ মার্চ ১৯১০, যশোর জেলার ধুলগ্রামে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০, মহিষাতে ৫ জুলাই ১৯১০, এবং দেগঙ্গা থানার মামুরাবাদে ৭ নভেম্বর ১৯১৪ স্বদেশী ডাকাতি হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালে বসিরহাটের হাটখোলায় সভায় বক্তৃতা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ সালে বসিরহাটে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। পৌর বাজারের সভাতে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে হাজির হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে সরকারি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (দণ্ডিরহাটবাসী), ভ্যাবলার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত বিজয়কালী ভট্টাচার্য ও বসিরহাট কোর্টের উকিল প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

বসিরহাটে জাতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালের জুন মাসে। উদ্বোধক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকতেন তারক ভট্টাচার্যের বাড়িতে। বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল১৯২৮সালে। এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রাজাগোপালচারী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে লবণ আইন ভঙ্গের সত্যাগ্রহ হয়েছিল বসিরহাটে ১২ মার্চ ১৯৩০ তারিখে। সত্যাগ্রহীরা দুটি দলে পদযাত্রা করেছিলেন। একটি দলে সুশীল রায়চৌধুরি (পরে কমিউনিস্ট নেতা), প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীবিহারী চক্রবর্তী, মদনলাল সাধু হাসনাবাদ হয়ে ভেবিয়া গিয়ে ১৫ দিন অবস্থান করেছিলেন। আরেকটি দলে তিনকড়ি গুহঠাকুরতা, শম্ভু ঘোষাল, হরেন বসু, খগেন ঘোষ, সুধীর সিংহ প্রমুখ স্বরুপনগর, বিথারি ইত্যাদি অঞ্চলে পদযাত্রা করেছিলেন।

জাতীয় পাঠাগার ক্লাবে ১৯৩০ সালে দীনেশ মজুমদার, ভবেশ মজুমদার, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ গোপনে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ শুরু করেন। এখান থেকে তারাপদ রায় (পরে RCPI - সদস্য) ও অন্যান্যরা ধলতিথা, দন্ডিরহাট, টাকি, খোলাপোতা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে শক্তি সংঘ-র শাখা গড়ে তুলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালাতেন।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বসিরহাট প্রায় নিরুত্তাপ ছিল। কেবলমাত্র বসিরহাট কোর্ট চত্বরে সভা হয় ২৭ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে। বসিরহাট কোর্টের কাজ বন্ধের জন্য দুবার জনতা হামলা চালায়। এ ছাড়া, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশেষ কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই।

আগস্ট মাসে চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকার ৪৭ জনকে পুলিশ অ্যারেসট করে। তার মধ্যে ১ জন মহিলাসহ ২৪ জনের কারাদণ্ড হয়। খুলনাতে অ্যারেসট হন ৫৬ জন, কারাদণ্ড হয় ২৬ জনের। যশোর জেলায় অনেককে পুলিশ অ্যারেসট করে। হরতাল হয় ১৬ আগস্ট যশোরে, ১৪ ও ১৭ খুলনাতে।

প্রতিবাদ সভা, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল সংঘটিত হয় যশোর, নড়াইল, খুলনা, সেনহাটি, চাঁদনিমহল, আজগরা, খালিশপুর। যশোরে ৫ জন এ. আর. পি. অফিসার ও খুলনায় একজন মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার পদত্যাগ করেন। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসেও আন্দোলন চলতে থাকে। চব্বিশ পরগনায় ১২ জন, যশোরে ৩০ জন, খুলনায় ২৩ জন অ্যারেসট হন। খুলনায় ৬ জনের কারাদণ্ড হয়। খুলনার মুন্সেফ কোর্টে জনতা অগ্নিসংযোগ করে। শায়েস্তানগর ইউনিয়ন বোর্ডের সকলে পদত্যাগ করেন। আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যশোর বাজার পোস্ট অফিস, যশোর কোতোয়ালি পোস্ট অফিস, বাসুন্দিয়া পোস্ট অফিস।

তথ্যঋণ :

১. টাকী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার হীরক জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ
২. Sedition Committee (1918) Report

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ তেভাগা আন্দোলন

ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি ও বঙ্গীয় কৃষক সভার উদ্যোগে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে বিশেষ করে গোসাবা, হাড়োয়া ও হাসনাবাদে ১৯৩০-এর দশক থেকে কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠে। কৃষক সমিতির সংগঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন মুজফফর আহমেদ, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ), বঙ্কিম মুখার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল মোমিন, শিবনাথ ব্যানার্জি, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ।

চব্বিশ পরগনাতে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল হাসনাবাদ থেকে কাকদ্বীপ অঞ্চল জুড়ে। হাড়োয়াতে ১৯৩৮ সালে খাস জমির আন্দোলন শুরু হয়।

তেভাগার ডাক ছিল - আধি নয় - তেভাগা চাই, জমিদারের নয় - নিজের খামারে ধান তোল। হাড়োয়া, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা অঞ্চলে কৃষক সমিতির ‘প্রধান সেনাপতি’ ছিলেন হেমন্ত ঘোষাল। তাঁরা আওয়াজ দিলেন - একটা লাঠি, একটা টাকা, একটা মেম্বার। শত শত কৃষক সামিল হলেন। কৃষক রমণীদের সংগঠিত করতেন নলিনীপ্রভা ঘোষ। সাহচর্য দিতেন কংসারি হালদার, রাসবিহারী ঘোষ, আবদুর রাজ্জাক খান, জ্যোতিষ রায়। বীজপুর, ডুমুরিয়া (খুলনা) এলাকায় কৃষক আন্দোলন হয়।

তেভাগা আন্দোলনের মাঝে ঢুকে পড়েছিলেন সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী চিত্তপ্রসাদের মত ব্যক্তিত্বেরা। ‘হারানের নাত জামাই’ প্রকৃতপক্ষে কৃষকনেতা হেমন্ত ঘোষাল।

বারাসত ও বসিরহাটে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ‘তোলা-বটি’ (হাট-তোলা) আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে মরিচা ইউনিয়ন, আমডাঙ্গা থানা এলাকা, গোবরডাঙ্গা, মসলন্দপুর, দেগঙ্গার চাঁপাতলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাসবিহারী ঘোষ, আবদুল, জে আলি, ননীগোপাল বিশ্বাস, সতীশচন্দ্র ঘোষ, হবিবুল্লা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫০ সালে চাল বেচতে চাওয়া গরিব চাষিদের পুলিশ আটক করতে থাকে। এ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বসিরহাটের হরিপুরকাটিতে প্রায় পাঁচ হাজার লোক পুলিশের কাছ থেকে চাল বোঝাই একশো গরুর গাড়ি ছিনিয়ে নেয়, দুজন পুলিশ জখম হয়।

তথ্যঋণ :

১. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

২. সময় অসময়ের স্মৃতি : হেমন্ত ঘোষাল

ইতিহাসের ছিন্নপত্র ◊ খাদ্য আন্দোলন

বসিরহাট থেকে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। বসিরহাট সহরের সবকটি স্কুলের ছাত্ররা ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ চাল ও কেরোসিনের দাবিতে মিছিল করে কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায় এবং দশজন ছাত্র আহত হয়। পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ স্বরূপনগরে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। মারা যায় তেঁতুলিয়া হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, ১১ বছরের নুরুল ইসলাম। উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলা।

তথ্যঋণ :

১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ দেগঙ্গা

সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, আদিশূরের সভায় আগত বাসুকি-গোত্রীয় রমানাথ সেন প্রাচীন দ্বিগঙ্গা নগরীতে বাস করেন। এজন্য তাঁরা 'দ্বিগঙ্গার সেন' নামে খ্যাত। রমানাথের প্রপৌত্র রামনারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীমান সেনের সময় দ্বিগঙ্গা বিখ্যাত শহর ও সভ্যতার কেন্দ্র হয়। এই পরিবারের উত্তর পুরুষ শিবশঙ্কর সেনের রাজত্বের পরে সেন বংশীয়রা দ্বিগঙ্গা ছেড়ে যশোর-খুলনার বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে রায়েরকাটি রাজবংশ বিখ্যাত ছিল। শিবশঙ্কর সেনের প্রপৌত্র কিঙ্কর সেন ভুঞা ছিলেন ও বাদশাহ আকবরের আমলে পূর্ববঙ্গে অনেকগুলি পরগনা লাভ করেছিলেন।

বৌদ্ধ বিজয়ের কথা-র পরিশিষ্টে অনুবাদক ক্ষেত্রকালী রায় লিখেছেন, রাজা লাক্ষণেয় সেনের উত্তর পুরুষ পুত্র দ্বিতীয় মাধবসেনের পত্নী রমাদেবী সুন্দরবনের বাগড়ি প্রদেশে অবতরণ করেন যা এখন রমাপুর নামে পরিচিত এবং দ্বিতীয় মাধবসেনও তার নিকটে অবতরণ করেন যা এখন মাধবপুর নামে পরিচিত। উভয়ে পরে দেগঙ্গাতে এসে রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় মাধবসেনের পুত্র পুরন্দর সেন। পুরন্দর সেনের অধস্তন পুরুষ রত্নেশ্বর সেন খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেগঙ্গায় রাজত্ব করতেন। রত্নেশ্বরের চার পুত্র - কুমার চন্দ্রকেতু, বনমালী, গোপাল ও বসন্ত। চন্দ্রকেতু কিঙ্কর সেন ও পৃথ্বীপতি উপাধি গ্রহণ করেন।

১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে দেগঙ্গার শেষ সেন-বংশীয় মহারাজা রামজয় রায়ের (সেন) সঙ্গে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ তিনবার যুদ্ধের পরে রামজয় রায় পরাজিত হন এবং দেগঙ্গা রাজ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। তবে নবাব আলিবর্দি খাঁ রামজয় রায়কে কয়েকটি পরগনা দান করেন। রামজয়ের পুত্র রামনারায়ণ দ্বিগঙ্গার রাজা হন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হওয়ায় ইংরেজরা তাঁর রাজ্য নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অর্পণ করে। দ্বিগঙ্গা রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। রামনারায়ণ সুন্দরবনের কাটুনিয়াতে 'লাটুর গড়' নির্মাণ করে সেখানে বসতি করেন।

ব্রিটিশ কলকাতার সূচনাপর্বে ১৬৯৯ সালে (১৬৯৮ সালে জমিদারি সত্ত্ব লাভ) সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার জমিদারির খাজনা আদায়কারী হয়েছিলেন শেলডন সাহেব আর সহকারী খাজনা আদায়কারী হয়েছিলেন বিখ্যাত নন্দরাম সেন। ইংরেজ রাজত্বে তিনিই প্রথম উচ্চপদে নিযুক্ত বাঙালি। তিনি ছিলেন দেগঙ্গার লোক। কলকাতার অন্যতম প্রাচীন রামেশ্বর শিবের মন্দির (১৬৫৫?) তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

কলকাতার মুনশিবাজারের (বেলিয়াঘাটা) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেগঙ্গার (গোঁসাইপুর) মুনসি মহম্মদ আমির। মুনসি মহম্মদ আমির বেলেঘাটায় থাকতেন ও বেলেঘাটায় অবস্থিত বিজয়নগরের মহারাজের প্রাসাদ (বর্তমানে কমার্শিয়াল ট্যাকস অফিস)-এর মালিক হয়েছিলেন। পাশে তাঁর আরও একটি বাগানবাড়ি ছিল যা এখন ওয়াকফ-করা সম্পত্তি। মতান্তরে, এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন টাকির জমিদার মথুরানাথ মুনশি (কালীনাথ মুনশির ছোট ভাই)।

অতীতে ভাষাচার্য সুকুমার সেনের পুর্বপুরুষদের বসতি ছিল দেগঙ্গাতে। সেখান থেকে তাঁরা চলে যান বর্ধমান জেলায়।

ভাসলিয়ার বিদুষী মহিলা ছাওলাতুন্নেছার স্মৃতিবিজরিত 'ভাসলিয়া ছাওলাতিয়া স্কুল'। তিনি ১৮৭৫ সালে মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে সেটি পরিণত হয় মিডল ইংলিশ স্কুলে। আরও পরে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হয়। ছাওলাতুন্নেছা মক্কাতে তীর্থ করতে গিয়ে সেখানে কিছু অর্থ দান করেন যার ফলে পূণ্যভূমি মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ছাওলাতুন্নেছা হিন্দিয়া মাদ্রসা', মসজিদ ও নিয়ামতখানা। সেই মাদ্রসা বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর স্বামী কলকাতা-বেলেঘাটার জমিদার লাতাফৎ হোসেনের নামে কলকাতায় রাস্তা আছে।

দেগঙ্গার অবনী সাহা জাতীয় শিক্ষকের সম্মাননা পেয়েছিলেন। প্রচুর ছড়া, কবিতা ও গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছেপেছেন। তাঁর প্রকাশিত বই 'বধূ মানেই মধু', 'কনে থেকে কনে বউ', 'অন্য বিবর', 'মগরা থেকে আগ্রা', 'রেজগীবাবুর রাজগীর ভ্রমণ', 'সতু খুড়ী পুরী গেলেন' 'ঝিনুকমন' (কাব্যগ্রন্থ), 'অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ', 'ধর্মাশোক' (নাটক) ইত্যাদি। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাঁর লেখা গান নিয়মিত গাইতেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অমর পাল, মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শেফালী ঘোষ, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র প্রমুখ। দেগঙ্গা-হাড়োয়া অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে তিনি একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

অম্বিকানগরের গণেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাপ্রেমী ও আদর্শ শিক্ষক।

অম্বিকানগরের প্রেমেন্দ্র মজুমদার দেগঙ্গা কার্তিকপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও সমাজকর্মী। সাহিত্য পত্রিকা 'লৌকিক উদ্যান'-এর সম্পাদক। শিল্প-সাহিত্য-সিনেমা-সামাজিক বিষয়ে তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বিখ্যাত সূচিশিল্পী আমিনা বেগমের বাড়ি দেগঙ্গা থানার নিরামিশা গ্রামে। সুন্দর ও সূক্ষ সূচিশিল্পকর্মের জন্য তিনি বহু জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সম্মাননা পেয়েছেন।
দেগঙ্গা থানার মামুরাবাদে ৭ নভেম্বর ১৯১৪ স্বদেশী ডাকাতি হয়।

দেগঙ্গার মামুরাবাদে আছে পেঁচো-পাঁচির থান।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় পারুলিয়ার সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ২০ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে
২. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র
৩. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ
৪. Sedition Committee (1918) Report
৫. রাজভাট ভগীরথ মিশ্র বিরচিত মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্ বল্লাল সেনদেবের বৌদ্ধবিজয় কথা : ক্ষেত্রকালী রায়

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ বেড়াচাঁপা

বর্তমান বেড়াচাঁপা-হাড়োয়ায় ছিল 'গঙ্গে' বন্দর-নগরী যা এখন 'চন্দ্রকেতুগড়' এই আধুনিক নামে প্রসিদ্ধ।

অতীতে দেউলিয়াতে কুটির শিল্পের অঙ্গ হিসাবে অনেক তেলের ঘানি ছিল ও ঘরে ঘরে চরকায় ও তকলিতে সুতো কাটা হত। খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেউলিয়াতে এসেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও হেমপ্রভা দেবী।

বেড়াচাঁপায় শিক্ষকতা করেছিলেন বিপ্লবী বিমল সেন (১৯০৬ - ১৯৩৪)। জন্ম বরিশালে। তিনি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হন। তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৫ বিষয়ে লেটার ও স্টার পান। তাঁর অনেক লেখা পত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর দু-খানা বই - 'ফুলঝুরি' ও 'স্বাধীনতার জয়যাত্রা' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ব্রিটিশ পুলিশের নির্যাতন ভোগ করে ছাড়া পাওয়ার পরে বেড়াচাঁপায় শিক্ষকতা করেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

দেগঙ্গা-বেড়াচাঁপা-হাড়োয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণের ও সংরক্ষণের স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছেন বেড়াচাঁপার দিলীপ কুমার মৈতে। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রত্ত্ব বস্তু সংগ্রহ শুরু করেন - যা এখন সুসজ্জিত প্রত্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত। প্রথম দিকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, কুঞ্জ গোপাল গোস্বামী, নিশীথরঞ্জন রায়, পরেশ দাশগুপ্ত, ব্রতীন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর লেখা বই - 'চন্দ্রকেতুগড়', 'গড় চন্দ্রকেতু কথা', 'ইতিহাসে দেগঙ্গা' ইত্যাদি।

বেড়াচাঁপার প্রতিভাবান ডাক্তার গোবিন্দলাল বিশ্বাসের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর ভাই পরিতোষ বিশ্বাস মৌলানা আজাদ কলেজের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। উভয়েই ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন।

বেড়াচাঁপাতে জন্ম শিল্পী নীতিন বিশ্বাসের (ডাঃ গোবিন্দলাল বিশ্বাসের ভাই)। নীতিনকুমার বিশ্বাস পুলিশ-শিল্পী। কোচবিহারে মদনমোহন মূর্তি চুরি থেকে পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণ মামলা, খাদিম-কর্তা অপহরণ থেকে সার্জেন্ট বাপি সেন হত্যা রহস্যের কিনারা হয়েছে তাঁর হাতের জাদুতে। বহু কুখ্যাত অপরাধী ধরা পড়েছে তাঁর আঁকা ছবির সূত্রে। মুখমণ্ডলের বর্ণনা শুনে না-দেখা অপরাধীর হুবহু ছবি এঁকে বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। পুলিস বিভাগে এ. এস. আই.-হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা Portrait Parley -এর চিত্রকর হিসেবে খ্যাত হন। এই দক্ষতার সুবাদে তিনি অনেক সম্মাননা পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা বই 'Principles of Reconstructions – Skull To Facial Contour'।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্টের উপরে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করেছিলেন নীতিন। তার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স ট্রেনিং অব আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন, দিল্লির ইনস্টিটিউট অব ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ফরেনসিক সায়েন্সে (আইসিএফএস) ফরেনসিক ফোটোগ্রাফির কোর্স। সিবিআই-এ ফোটোগ্রাফার-কাম-আর্টিস্ট পদে যোগ দিলেন ১৯৭৫-এ। সিবিআই-এর তৎকালীন জয়েন্ট ডিরেক্টর ই এন রেনিসন তাঁর অ্যালবাম দেখে মুগ্ধ হয়ে নীতিন বিশ্বাসকে ডেকে নেন সিবিআইয়ে।

বেড়াচাঁপা-কাউকেপাড়ার বাসিন্দা সমাজসচেতন সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী এম. এ. মজিদ। তাঁর লেখা বই 'ছায়া ঢাকা মুখ' (গল্প), 'চাঁদ নেমেছে ঘরে' (উপন্যাস), 'আলোর বৃত্তে ফেরা' (উপন্যাস), 'মুক্তির আলোয়' (উপন্যাস), 'পুণ্য জীবনের আলোকিত দিক' (জীবনীগ্রন্থ), 'হৃদয়ের নির্জনে' (স্মৃতি চারণা)। উপন্যাসগুলির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে 'এক মলাটে উপন্যাস ত্রয়ী' নামে। তিনি সরকারি দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন।

বেড়াচাঁপা-কাউকেপাড়ার মোঃ আবদুল হামিদ রেডিওখ্যাত পল্লিগীতি গায়ক।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় দেউলিয়া নিম্ন-পাঠশালায় ৫৮ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

২. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

৩. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৪. আনন্দবাজার : ২৭ মে ২০১৮

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হাড়োয়া-শালিপুর

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১০ জুলাই ১৮৮৫ - ১৩ জুলাই ১৯৬৯) পেয়ারা (হাড়োয়া) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে কিছুদিন বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেছিলেন। এক সময় বসিরহাট পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। কর্মজীবন প্রধানত বাংলাদেশে। বিশ্বের অনেকগুলি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে তাঁর অজস্র মূল্যবান রচনা আছে, যেগুলি বাংলা একাডেমি (বাংলাদেশ) থেকে বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ও বিশেষভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনি।

জীবনদর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজেরই লেখা -

“. . . কাজ নাই মোর স্মৃতি স্তম্ভে
কাজ কিবা মোর মাটির গোরে
বাঁচতে পারি যদি আমি
বিশ্ব মানুষের অন্তরে . . . ”

দেশপ্রেমী, সমাজসেবিকা ও সাহিত্যিক হোসেন আরা বেগম ৮ জুলাই ১৯১৬ পেয়ারা গ্রামে (হাড়োয়া) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পুঁথি সাহিত্যিক মৌলবি মহম্মদ এবাদুল্লাহ সাহেবের কন্যা। চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল বেগম রোকেয়া সম্পাদিত ‘মক্তব’ পত্রিকায়। স্বামী মহম্মদ মোদাব্বেরের উৎসাহে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩২ তারিখে কলকাতা ময়দানে সমাবেশে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু আগের দিন পুলিশ জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করে। পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হোসেন আরা পতাকা উত্তোলন করেন ও সমাবেশে তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণ চলাকালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। ছ-মাস কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাবার পর সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন। হোসেন আরা প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কারাগারে আটক থাকেন। স্বামী মহম্মদ মোদাব্বেরের মাধ্যমে কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমেদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

দেশভাগের পর হোসেন আরা স্থায়ীভাবে ঢাকায় বাস করেন। তাঁর রচিত ছড়ার বই ‘ফুলঝুরি’,‘খেয়ালখুশি’, ‘হল্লা’,‘টুংটাং’, ‘হট্টগোল’। নির্বাচিত কবিতা সংকলন ‘মিছিল’। তিনি ১৯৬১ সালে ‘বাংলা একাডেমি’ ও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের ‘শিশু একাডেমি’ পুরস্কার লাভ করেন। মৃত্যু ঢাকায় ৩০ মার্চ ১৯৯৮।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী, কৃষক নেতা, প্রত্নবস্তু সংগ্রাহক ও গবেষক এম. এ. জব্বারের জন্ম হাড়োয়া গ্রামে। ছাত্রজীবনে অনুশীলন দল, পরে কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। অমূল্য প্রত্ন সম্পদ আহরণ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালা। প্রাচীন বালান্দা বৌদ্ধ মহাবিহারের (বর্তমানে লাল মসজিদ নামে পরিচিত) গবেষণার পুরোধা তিনি। তাঁর লেখা বই - 'বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী', 'বালান্দা-চন্দ্রকেতু ইতিকথা' ইত্যাদি।

সমাজসেবী ও কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তী হাড়োয়াতে বাস করতেন।

হাড়োয়ার বাসিন্দা সংস্কৃতিমান শিক্ষক আজিজুর রহমান। গণ-আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশীদার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে লেখেন। প্রকাশিত গল্প 'মুনসী ঘেরীর মেয়ে', 'ঘর' ইত্যাদি। সম্পাদনা করেছেন 'জন্ম শতবর্ষে কবি শাহাদৎ হোসেন সমারক গ্রন্থ' (১৯৯৩), 'ডঃ শহীদুল্লাহ স্মরণিকা' (২০০৬)। 'বালান্দাবার্তা'-র সম্পাদক-প্রকাশক। বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালার সম্পাদক।

খ্যাতনামা সাংবাদিক মোদাব্বের হোসেনের জন্ম হাড়োয়ার কাছে শালিপুর গ্রামে। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে কলকাতার 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি।

সুন্দরবন কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারির সাংগঠনিক নেতা ছিলেন শ্রীশ মণ্ডল। ১৯৩৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে মিনাখাঁ থানার উচিলদহে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ও পরে খাস জমি দখলের লড়াই শুরু হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনি তেভাগা আন্দোলন ও মেছোঘেরির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৫৮ সালে গাববেড়িয়ায় মেছোঘেরি দখলের আন্দোলন চলাকালে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হাদিপুর

হাদিপুরে পাওয়া গেছে নিম্ন বাম চোয়ালের প্রস্তরীভূত পাঁচটি দাঁত, যা ভূতাত্বিকমতে দশ হাজার বছর পূর্বেকার।

হাদিপুরে এক পুকুর খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে ব্রাহ্মী ও লিপির নামমুদ্রালেখ ও মাটির পাত্র। এগুলি প্রথম শতকের শেষ পাদ থেকে পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকের।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় হাদিপুর মধ্য বিদ্যালয়ে ৪৬ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. বালান্দা-চন্দ্রকেতু ইতিকথা : বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী / এম. এ. জব্বার

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ পণ্ডিতপোল

পণ্ডিতপোল (দেগঙ্গা) গ্রামে জন্ম কল্লোল যুগের কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক শাহাদাৎ হোসেনের। জন্ম আগস্ট মাস ১৮৯৩। তাঁর রচিত গ্রন্থ - কাব্য - 'মৃদঙ্গ', 'চিত্রকুট', 'কল্পলেখা', 'রূপছন্দা', 'আলো', 'সোনার কাঁকন', 'লায়লী মজনু' ইত্যাদি, উপন্যাস - 'পথের দেখা', 'রিক্তা','মরুকুসুম','সতী মহিমা', 'বারোয়ারী', নাটক - 'সরফরাজ খাঁ', 'আনারকলি', কিশোর সাহিত্য - 'মোহনভোগ', 'ছেলেদের গল্প', 'বেগম নুরজাহান', 'গুলবদন','জাহানারা' ইত্যাদি। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল।

শাহাদাৎ হোসেনকে ব্রিটিশ আমলে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবাস করতে হয়েছিল। বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কল্লোল যুগের রবীন্দ্র-অনুসারী সাহিত্যিক। হাড়োয়ার মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাকালে শাহাদাৎ পণ্ডিত নামে খ্যাতিমান ছিলেন। আবৃত্তি করতেন ভরাট গলায়। সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। শিশির ভাদুড়ীর 'নাট্য মন্দিরে' অভিনয় করেছেন।

কবি শাহাদাৎ কিছুকাল পূর্ব-পাকিস্তানের রেডিওর সাথে যুক্ত ছিলেন। নাগরিকত্ব না পেয়ে ফিরে আসেন স্বভূমিতে। তাঁর শেষ জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম দারিদ্র, হতাশা, পানাসক্তি ও হাঁপানি। জীবনাবসন ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. শাহাদাৎ হোসেন : আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ ঝিকরা – আজিজনগর – চটকাবেড়ে

চন্দ্রকেতুগড়-সন্নিহিত ঝিকরা গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে মৌর্যযুগের মুদ্রা, শুঙ্গ-কুষাণযুগের বিভিন্ন ফলক, পালযুগের দেবদেবীর মৃন্ময়মূর্তি। পাশের গ্রাম বাসাবাটির পুরনো পুকুরের তলদেশে আছে বিশাল অট্টালিকার প্রাচীর ও ছাদ, যে রহস্য এখনও উন্মোচনের অপেক্ষায়।

পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাড়ি ছিল ঝিকরা গ্রামে। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, নাট্যকার ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বিদ্যাসাগরের আগ্রহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে নবীনচন্দ্র সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তাঁর রচিত নাটক 'বাঙালী বিলাস', 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে', 'বারুণী বিলাস' প্রভৃতি। এই পরিবার ছিলেন গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত রুদ্রেশ্বরের উত্তরপুরুষ।

কলকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থের বাড়ি ছিল ঝিকরা গ্রামে। ঝিকরা ভট্টাচার্যবংশীয় নৈয়ায়িক রামজয় শিরোমণি (জন্ম ১৭৯৬ খ্রি.) বালীতে চতুষ্পাঠী করেছিলেন।

আজিজনগরের চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দির খুব প্রাচীন। চৌধুরিদের পূর্বপুরুষ মাধব দেওয়ান বর্গি হাঙ্গামার ভয়ে নবাবি কাজ ছেড়ে এই গ্রামে বসতি করেছিলেন। গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত রুদ্রেশ্বরকে এনে পাশের ঝিকরা গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

আজিজনগরে ছিল 'ডাকাতে কালী' ও পঞ্চমুণ্ডির আসন।

বসিরহাট মহকুমার ঝিকরা চটকাবেড়ে গ্রামে উপেন্দ্রনাথ [কর্মকার?] নামক ৩০/৩১ বছরের যুবকের বাস ছিল। জীবিকা ছিল পিতলের তালা প্রস্তুত করা। সে বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হতাশ হয়ে কাশীধামে আসে সেখানে দেহত্যাগ করার মানসে। শীর্ণ শরীর নিয়ে অন্নসত্রে ব্রাহ্মণদের আহারের পর যে অন্ন বাঁচত তাই ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত। পরে কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে ওষুধ ও পথ্য নিতে থাকে। কিন্তু তার রোগের উপশম না হওয়াতে সেবাশ্রমের অধ্যক্ষেরা তাকে আশ্রমে রেখেই চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকমাস বাদে তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হল। উপেন্দ্রনাথ আশ্রমেই থাকার অনুমতি নিয়ে অতি আনন্দের সাথে জীবসেবারূপ মহৎ কাজে ব্রতী হল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ ও অন্য রোগীদের সেবাই ছিল তার দিবারাত্রের ধ্যান-জ্ঞান। সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক এক বসন্ত রোগীকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলে উপেন্দ্র নিজেই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে দেহত্যাগ করে।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৩. বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪. উদ্বোধন : ডিসেম্বর ২০০১

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ চৌরাশি

ইংরেজরা যখন চব্বিশটি পরগনার জমিদারি সত্ত্ব লাভ করে তখন তার মধ্যে চৌরাশি ও আনোয়ারপুর (বারাসাত) পরগনা ছিল না - কারণ এ অঞ্চলগুলি ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে।

চৌরাশির আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে নীলকুঠি ছিল। এদিকে বিভিন্ন গ্রামের চাষিরাও ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। নীলকর সাহেবের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি, আমির বিশ্বাস, আর জীবনপুরের কুঠির পূর্বতন দেওয়ান মোহাম্মদ হেরাছতুল্লা।

এই গ্রামের হরিহর হালদারের বাবা মারা গেলে মা 'সতী' হয়েছিলেন সহমৃতা হয়ে।

চৌরাশি গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৭ শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ মৌলিক, কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ ও মাতার নাম মোক্ষদা দেবী । তিনি হাওড়া জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কলঙ্কিনী'। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলেন। (বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী - হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য)

জনশ্রুতি আছে চৌরাশি গ্রামের এককালের জমিদার চ্যাটার্জি পরিবারের পুকুরের মধ্য থেকে পাওয়া যায় মদনমোহন ও রাধা বিগ্রহ এবং এখন তা আছে পানিহাটির রাঘব ভবনে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পানিহাটি এসে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে দর্শন করেছিলেন সেই মদনমোহন ও রাধা বিগ্রহ।

চৌরাশির ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রাণী রাসমণির জমিদারিতে কাজ করার সুবাদে খাজাঞ্চির কাজে দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁকে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। ভোলানাথ দক্ষিণেশ্বরেই দেহ রেখেছিলেন। তাঁর ভাই ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় রাণী রাসমণির পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগনার জমিদারির নায়েব ছিলেন ও কাজের অবসরে থাকতেন গ্রামের বাড়িতে।

চৌরাশির ডাঃ তারকনাথ ঘোষ চন্দ্রকেতুগড়ের ঐতিহাসিক ভিত্তির বিষয়ে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে ও প্রশাসনিক দপ্তরের গোচরে এনেছিলেন ১৯০৫ সালে।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ চাকলা

চাকলা অতি প্রাচীন জনপদ। প্রত্নপ্রেমী সত্যেন রায় চাকলা থেকে বৌদ্ধদেবী বিশালাক্ষীর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন।[১]

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সমৃতি-মাহাত্ম্যে চাকলা বিখ্যাত।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় চাকলা মধ্য বিদ্যালয়ে ৪০ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ রায়কোলা

বাংলা ৭০৮ সালে সুদূর মক্কা থেকে তিনশো-এক জনের ইসলাম ধর্মপ্রচারক ও সাধকের একটি দল দিল্লির অভিমুখে আসেন। দিল্লির থেকে যান সিলেটে। তাঁদের গুরু শাহজালালের নির্দেশে বাইশ জন আউলিয়া আব্বাস আলি রাজির নেতৃত্বে সিলেট থেকে দীর্ঘ পথ বেয়ে আসেন রায়কোলা গ্রামে। সেখান থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

রায়কোলায় আছে স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন 'সাত গম্বুজ' শাহি মসজিদ। প্রতিষ্ঠা ইং ১৬৮৫ সালে। শাহি মসজিদের দৈর্ঘ ১৪৪ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট, দেয়াল ৬ ফুট পুরু। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবায়েতদের দান করেছিলেন একশো বিঘা জমি।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ কলসুর

কলসুর এক প্রাচীন জনপদ। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনী কলসুরের পদ্মা পার হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল যে পথে তা গৌড়বঙ্গ রাস্তা নামে পরিচিত।

কলসুরে নীলকুঠি ছিল এক কালে।

অতীতে কলসুরে চতুষ্পাঠী ছিল। উদ্যোগী পুরুষ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অন্যান্যদের প্রয়াসে স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়, পাঠাগার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দেবালয়। এখানে আছে শ্যামসুন্দর জিউয়ের প্রাচীন মন্দির। কলসুরের দুর্গাপূজা অনেক প্রাচীন।

কলসুরের প্রবীণ শিক্ষক অনিল কুমার চক্রবর্তী দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চ্চা করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বই 'প্রাণের প্রদীপ', 'আপন মনের মাধুরী', 'পরিবেশ পরিচিতি'।

দক্ষিণ কলসুরে আছে এক প্রত্নস্থল, যা 'হাজরা রাজার বাড়ি' বা 'রাম হাজরার মঠ' নামে পরিচিত।

কলসুরের নিকটে মগরায় কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় কলসুর-১ নিম্ন-পাঠশালায় ৩৫ জন ও কলসুর-২ নিম্ন-পাঠশালায় ২৯ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

২. বালান্দা-চন্দ্রকেতু ইতিকথা : বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোরাই গাজী : এম. এ. জব্বার

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ ধান্যকুড়িয়া

ধান্যকুড়িয়া গ্রামের বসতির শুরু খুবই সাম্প্রতিক - ১৭৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে এবং নদী গর্ভের নবোত্থিত ভূখণ্ডে। দৃষ্টিনন্দন বিশাল বিশাল রাজবাড়ি ও বৈষ্ণব মন্দিরের সমাবেশ ধান্যকুড়িয়াতে। ধান্যকুড়িয়াকে 'অনু-শহর' বলা চলে। পর্যটকদের পক্ষে আকর্ষণীয় স্থান।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামের ইতিহাসের রূপরেখা প্রকাশ করেছেন সত্যদুলাল মণ্ডল মহাশয় তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান নিবন্ধে।

মারাঠা হাঙ্গামার অস্থির সময়ে নদিয়া জেলার কোনও এক গ্রাম থেকে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন জগন্নাথ দাস পরিবার। জগন্নাথ ও তাঁর পুত্র রত্নেশ্বর জঙ্গল কেটে আবাদ ও বসত গড়েছিলেন অনেক পরিশ্রমে। এই পরিবারের কৃতী পুরুষ পুরন্দর দাস নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেন ও রাজ-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হন। পুরন্দরের প্রচেষ্টাতে ক্রমশ বসতি করলেন আরও সম-সম্প্রদায়ভূক্ত স্বজাতীয়েরা। পুরন্দর পরিবার 'মণ্ডল' (সমাজ-প্রধান) পদবী ধারণ করলেন। সে সময়ে এলেন কাবাসী পরিবারও। এই পরিবারের রামদেব কাবাসী এই অঞ্চলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছারিদার ছিলেন।

পরে নতুন জনপদে আশ্রয় নিলেন রানাঘাটের ফতেপুর থেকে সাউ পরিবারের পূর্বপুরুষ যাদবরাম সাউ। মোগল রাজত্বের শেষ দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে সাউ পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় আসে। যাদবরামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পতিতচন্দ্র সাউ কলকাতায় গিয়ে লবণ, তেল, পাট ইত্যাদি নানা ব্যাবসায়ে লিপ্ত হন এবং ধনসঞ্চয় করেন।

পতিতচন্দ্রের পুত্র উপেন্দ্রনাথ সাউ (জন্ম ১৮৫৯) কলকাতার ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর ১৯ বৎসর বয়সকালে পিতা মারা যান। তিনি পিতার ব্যাবসার আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটান এবং বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা, যশোর ও খুলনা জেলায় জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ সালে মহারাণীর দিল্লি দরবার উপলক্ষে তিনি রায় বাহাদুর খেতাব পান।

গাইন পরিবারের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন বর্ধমান জেলা থেকে। এই পরিবারের রামকিশোর গাইনের দৌহিত্র শ্যামাচরণ বল্লভের আদি নিবাস ছিল বারাসত মহকুমার শ্বেতপুর গ্রামে।

শিক্ষা প্রসার ও জনকল্যাণের জন্য ধান্যকুড়িয়ার তিন জমিদার পরিবারের অসামান্য অবদান ছিল। তাঁরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন। কিন্তু জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের দানের শেষ ছিল না। ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র, প্রসূতিকেন্দ্র, বালিকা বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, বসিরহাটের টাউন হল, বিভিন্ন মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজে তাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এতদঞ্চলের পল্লিসমাজের উন্নয়নে তিন জমিদার পরিবারের বিশেষ করে উপেন্দ্রনাথ সাউ, মহেন্দ্রনাথ গাইন ও শ্যামাচরণ বল্লভের ঐতিহাসিক অবদান ছিল।

ধান্যকুড়িয়াতে আছে পূর্বতন জমিদারদের বহু দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ বাড়ি। অতীতে কলকাতার মত ধান্যকুড়িয়ার রাস্তার ধারে লোহার স্তম্ভের উপর গ্যাসের বাতি জ্বালানো হত। রাসের মেলা ছিল বিখ্যাত। কলকাতার সেরা যাত্রাদলের অভিনয় দেখার জন্য বিশাল জন-সমাবেশ হত।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এই অঞ্চলের একমাত্র শিক্ষাপীঠ ছিল। শতাধিক বৎসর আগে যখন পল্লিগ্রামে শিক্ষালয়ের নিতান্তই অভাব ছিল, সে সময়ে এই বিদ্যালয় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বিস্তৃত অঞ্চলের অগণিত ছাত্রদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। বসিরহাট, বাদুড়িয়া, দেগঙ্গা থানা ও সুন্দরবন-প্রান্তের এলাকা থেকে ছাত্রেরা পড়েছেন এই বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রেরা দেশ-বিদেশে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের অগণিত কৃতী ছাত্রদের তালিকা সংকলন করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯০৯ সালের একটি সংবাদে এই বিদ্যালয়ের চিত্র –

“ স্থানীয় সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল। কুশদহ অঞ্চলের স্কুলসমূহে নিম্নলিখিত সংখ্যাক্রমে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

	প্রথম বিভাগে	দ্বিতীয় বিঃ	তৃতীয় বিঃ	মোট
রাণাঘাট	১টি,	৫টি,	০	৬টি
বনগ্রাম	” ০	” ২	” ২	” ৪
গোবরডাঙ্গা	” ০	” ১	” ১	” ২
বারাসাত	” ৪	” ৩	” ০	” ৭
বসিরহাট	” ৩	” ৮	” ১	” ১২
ধানকুড়িয়া	” ৩	” ১	” ০	” ৪
নিবধাই	” ১	” ৩	” ০	” ৪
গুস্তে	” ০	” ৩	” ০	” ৩

উপরোক্ত পরীক্ষার ফল দৃষ্টে বসিরহাট স্কুলের ফল অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া বোধহয়। তৎপরে মহকুমার সহিত তুলনায় গ্রাম্য স্কুল ধানকুড়িয়া, নিবধাই ও গুস্তেও মন্দ নয়।...”
(‘কুশদহ’ মাসিকপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬, পৃঃ-১৪২)

১৯১৪ সালের একটি তুলনামূলক তথ্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার উজ্জ্বল চিত্র –

কয়েকটি হাই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা:

বসিরহাট	– ৪৮১	বারাসাত	– ২৪৮
ধান্যকুড়িয়া	– ৩৪৩	আড়বেলিয়া	– ১৩৫
টাকি	– ২৯০	গোবরডাঙ্গা	– ১২০
বারাকপুর	– ২৬৩		

(Bengal-District Gazeteers 24 Parganas : O'Malley : 1914)

বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের মেধাবী ছাত্র ছিলেন বিশিষ্ট রসায়ন বিঞ্জানী প্রফুল্লকুমার বসু। জন্ম বেলঘরিয়া। ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে তিনি বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯১৬ সালে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করে ১৯২৭ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ব্রিটিশ আমলে ভারত সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন ও বোস ইনস্টিটিউট -এর সঙ্গে অধ্যাপক, ডেপুটি ডিরেক্টর ও এমেরিটাস প্রফেসর হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

কচুয়ার পশুপতিনাথ মল্লিক ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কচুয়ার মঞ্জুপতিনাথ মল্লিক ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুল থেকে মেধাবৃত্তি পেয়ে স্কুল ফাইনাল (১৯৫৪) পাশ করেছিলেন। নদিয়ার শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন।

ধান্যকুড়িয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ছাত্র ছিলেন ডাঃ ভবানীপ্রসাদ রায় (নদিয়া), ডাঃ সুধীর পাল (দেগঙ্গা), সুযশ কুমার বাইন, সুন্দরচন্দ্র নাথ (হাদিপুর), ডাঃ রিয়াজুদ্দিন আহমেদ (নদিয়া), কাজি আবদুল গফফার (রাজবেড়িয়া), যশোদাদুলাল মণ্ডল প্রমুখ।

ধান্যকুড়িয়ার জমিদাররা গ্রামের মধ্যে একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। পরে ১৯৪২ সালে টাকি রোডের ধারে একটি প্রসূতিকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন যা এখন বসিরহাট ব্লক-২ স্বাস্থ্কেন্দ্রে উন্নীত। দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রটি পরে প্রসূতিকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার একটি সমৃদ্ধ ও সুপরিচালিত বেসরকারি গ্রন্থাগার।

অতীতে সৎচাষি সম্প্রদায় 'চাষিধব' (চাষিদের পতি বা চাষিদের মধ্যে বিশেষ পারদর্শী) নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা 'ধব' বিকৃত অর্থে 'ধোবা' করত বলে ১৯১১ সালে ধান্যকুড়িয়াতে অনুষ্ঠিত গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত জেলার সমসম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গের সাধারণ সম্মেলনে ভাষান্তরিত 'সৎচাষী' নাম গৃহীত হয়।

ধান্যকুড়িয়ার রাধানাথ কাবাসী বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। চার খণ্ডে সংকলিত তাঁর আকরগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তজনের কাছে অত্যন্ত আদৃত ছিল। এ ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন 'ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি', 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু', 'ভক্তিরত্নহার', 'লোচনদাসের ধামালি', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত'। গৃহী ভক্ত হয়েও তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শ্যামাচরণ বল্লভ 'জুট লর্ড' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর. জি. কর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ডা. রাধাগোবিন্দ করকে কিছু জমি ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন।

ধান্যকুড়িয়ায় একবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন (১৯৩১ সালে?)। ভগীরথ বাইনের 'স্বদেশী চিনির কলের' সামনে বক্তৃতা করেছিলেন।

ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে - অমূল্য অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর সংকলক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় (এখনকার নবম) শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়েছিলেন ও স্কুলের বোর্ডিং-এ ছিলেন। তিনি কিছুদিন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছিলেন।

আরো একটি স্মরণীয় বিষয় হল 'পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ' নামাঙ্কিত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত লিখিত উপেন্দ্রনাথ সাউ-এর জীবনী গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন

পল্লীর উন্নতি সাধন উদ্দেশে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পুণ্যস্মৃতি সেই উপেন্দ্রনাথ সাউর জীবন চরিত রচনায় তোমার অধ্যবসায় পল্লীহিতৈষী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে আমি আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

ইতি ১০।৪।৪০ শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র : 'পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ'-এর লেখক প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি

ধান্যকুড়িয়াতে ১৯৪০ সালে এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরি স্থাপিত 'বসিরহাট বাণী সম্মিলনী'-র দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল ধান্যকুড়িয়াতে। সভাপতি হয়েছিলেন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি।

ধান্যকুড়িয়ার প্রাচীনতম গৌরাঙ্গ ক্লাব। গ্রামের প্রত্যেকটি উৎসব, উদ্যোগে এই সংঘের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই সংঘের সংগঠকেরা ছিলেন নচিকেতা মণ্ডল, যশোদাদুলাল মণ্ডল, সুরেন্দ্রনাথ গাইন, কুঞ্জ সমাদ্দার, হেম সমাদ্দার প্রমুখেরা। সে সময়ে আগমনী ও বিজয়ার শোভাযাত্রা মুখর হত গৌরাঙ্গ ক্লাবের সভ্যদের গাওয়া গানে।

ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার বাং ১৩৪৪, শ্রী শ্রী মহাপ্রভূ নাট্য সমাজ বাং ১৩৪৮, ধান্যকুড়িয়া স্পোর্টিং ক্লাব বাং ১৩৪৮, ধান্যকুড়িয়া যুবক সংঘ ইং১৯৪১ সালে স্থাপিত। ধান্যকুড়িয়া শিবতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব স্থাপিত হয় বাং ১৩৫৭ সালে।

ধান্যকুড়িয়াতে নাট্যচর্চার প্রথম দিকের নাটকগুলির মঞ্চদৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাইন । ধান্যকুড়িয়ার এই কৃতী সন্তান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শিল্প ঘরানাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তিনি দীর্ঘদিন ভারতীয় যাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ধান্যকুড়িয়ার গৌরাঙ্গ ক্লাবের জন্য তিনি যে দৃশ্যপটগুলি এঁকেছিলেন সেগুলি কলকাতার স্টার বা অন্যান্য থিয়েটারের মঞ্চপটগুলির তুলনায় কোনো অংশেই কম ছিল না ।

ধান্যকুড়িয়ার অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন অশ্বিনী মণ্ডল, সুনীল মণ্ডল, দুলাল পাহাড়, অরূপ মণ্ডল, দীনবন্ধু মণ্ডল, শক্তি মণ্ডল, জয়দেব বাইন, বিপুল বাইন, শশাঙ্ক মণ্ডল, প্রমুখ। নাট্য প্রক্রিয়ার সর্ব বিষয়ে দক্ষ ও জনপ্রিয় নাট্য-ব্যক্তিত্ব অরূপ মণ্ডল অসংখ্য নাটক ও যাত্রায় অভিনয় ও নির্দেশনার করেছেন। যাত্রাভিনয়ে প্রগাঢ় অনুরাগী জয়দেব বাইন।

ধান্যকুড়িয়ার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব শুরু হয় ধান্যকুড়িয়া যুবক সংঘের উদ্যোগে । প্রথম দিকে এই সংঘের হাল ধরেছিলেন মানিক পাহাড়, কানাই গাইন, অমরনাথ সমাদ্দার, গোপাল লাহিড়ি প্রমুখ।

ধান্যকুড়িয়ার অতীতের বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন দেবদাস মণ্ডল, গোপাল লাহিড়ি, গৌর মণ্ডল, সুরথ মণ্ডল, লুৎফার মণ্ডল, কাঞ্চন গাইন, তুষার পান্তি, শক্তি পান্তি, অজিত সাউ, প্রিতম হাজরা প্রমুখ।

ধান্যকুড়িয়ার জনজীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ধান্যকুড়িয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ধান্যকুড়িয়া যুবক সংঘ ও অন্যান্য সংস্থাগুলি।

ধান্যকুড়িয়ার অনুপ কুমার মণ্ডল, শুভময় মণ্ডল ও মনজিৎ গাইন ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন ও তাঁদের লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুভময় মণ্ডলের অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে । তরুণ সাহিত্যিক মনজিৎ গাইনের প্রকাশিত গোয়েন্দা উপন্যাস ‘চন্দ্রকেতুগড়ে চাঞ্চল্য’, ‘ডুয়ার্সে গোয়েন্দা সতুকা’, ‘মিলন রহস্য’, ‘লেডি টারজান’, 'তালিবানের দেশে মালালা', 'ট্যাঁপাদার ডবল কীর্তি', ‘মহাকাশের বিপদ’, ‘পৃথিবীর দখল’ ও অন্যান্য অনেক গল্পের বই।

ধান্যকুড়িয়াতে অনেক সিনেমার সুটিং হয়েছে - যার মধ্যে আছে ‘স্বরলিপি’,‘সাহেব বিবি ঔর গোলাম’, ‘লা নুই বেঙ্গলি’, ‘ভূমিকন্যা’ ইত্যাদি । ‘সাহেব বিবি ঔর গোলাম’-এর শুটিং উপলক্ষ্যে এসেছন গুরু দত্ত, মীনা কুমারী, ওহায়িদা রহমান, প্রমুখ । অন্যান্য শুটিংয়ে এসেছেন শাবানা আজমি, সুপ্রিয়া পাঠ্ উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, অমল পালেক্ বিশ্বজিৎ, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন সেন, কৌশিক সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ ও অন্যান্যরা।

হাজরাতলার গাঙ্গুলি পরিবারের জয়কৃষ্ণ স্মৃতি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

হাজরাতলার পিয়ারীলাল মণ্ডল শৌখিন উদ্ভিদপ্রেমী । শশা-কুমড়োর পরাগমিলন ঘটিয়ে নতুন ফলের জন্ম দিয়েছেন। একই গাছে হরেক রকম আম ফলিয়েছেন।

ধান্যকুড়িয়ার সুদীপ বিশ্বাস কয়েকবার সাইকেলে ভারত পরিক্রমা করেছেন।

ধান্যকুড়িয়ার বিশ্বমিত্র মণ্ডল একবার পায়ে হেঁটে দার্জিলিং গিয়েছিলেন।

নিকটবর্তী আশুতোষ সিনেমা চালু হয়েছিল ১১ মার্চ ১৯৫১, রবিবার। প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি আশুতোষ সিনেমাতে একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ২০ মার্চ ১৯৫৪।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় ধান্যকুড়িয়া নিম্ন-পাঠশালায় ২২ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মরণিকা - ১৮৮৫-১৯৮৫

২. ধান্যকুড়িয়া যুবক সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মারক পত্রিকা - ১৯৯০

৩. Second supplement to Who's who in India: brought up to 1914/SUPPLEMENT 107

৪. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৫. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ

৬. পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ : প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

৭. দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ : সন্ন্যাসীচরণ চন্দ্র

৮. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ গোকনা

গো-কর্ণ থেকে গোকনা নাম। টাকির জমিদারদের কাছ থেকে হালদাররা জমিদারি পত্তনি পান। হালদাররা ছিলেন অনেক পুরনো জমিদার।

হালদার (চট্টোপাধ্যায়) জমিদারদের পূর্বনিবাস ছিল সাতক্ষীরা।

নিধিরাম হালদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছিলেন বনগাঁর খাজরা গ্রাম থেকে।

হালদার জমিদার পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার গোবরডাঙ্গা থেকে গোকনায় বসতি করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হালদার, দাশ প্রভৃতি পরিবার শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন ও কর্মজীবনে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অনেকেই সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। টাকি-প্রবাসী ডাঃ মুরারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক ও সুলেখক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষক ও সাহিত্যিক। বেশ কয়েকজন ডাক্তার হয়েছেন এই পরিবারে - লন্ডন-প্রবাসীসহ। চাষনালা কয়লাখনির শ্রমিক নেতা ছিলেন কালটু বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চিত্রশিল্পী।

সিদ্ধেশ্বর হালদারের পুরস্কৃত বই 'ওহ কৌন' ও ভ্রমণ কাহিনি 'পায়ে চলা পথের কথা'।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গোকনার কিছু মানুষ সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁরা লবণ তৈরি ও বিক্রি করতেন। বিভুতিভূষণ হালদার বিপ্লবী ছিলেন। পরে রাজসাক্ষী ও সরকারি গুপ্তচর হয়েছিলেন। শেষে বিদেশে চলে যান। জনশ্রুতি, তিনি পরে জেরুজালেমে গিয়ে পোস্টমাস্টার হয়েছিলেন।

গোকনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক ও 'বেহালা দর্পণ' গ্রন্থ প্রণেতা নবীনকৃষ্ণ হালদার। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতসভার গায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছিলেন তাঁর গুরু।

গোকনার কেদারনাথ হালদার সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। পঞ্চানন হালদার, অমরকৃষ্ণ হালদার ও পরেশ হালদার ঢোল, তবলা ও পাখোয়াজ শিল্পী ছিলেন।

গোকনার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি জানেন দেখে তিতুমিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে ইংরেজ সাহেব তাঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন নারকেলবেড়িয়া পর্যন্ত পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে, যখন কলকাতাতেই ইংরেজি জানা লোক ছিল অল্প, সে সময়ে গোকনার জনৈক রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি জানতেন, এটা আশ্চর্যের বিষয়।

গোকনা গ্রামে অতীতে ছিল নিশানাথ পণ্ডিতের পাঠশালা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত গোকনার কালী মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে। তখন ছিল মাটির প্রতিমা। আগে খড়-গোলপাতার ছাউনির মেটেঘর ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের জন্য ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন।

ধান্যকুড়িয়ার জমিদার মহেন্দ্রনাথ গাইন নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়ে পাকা মন্দির করে দেন ও কাশী থেকে পাথরের কালী ও মহাদেবের মূর্তি চতুর্দোলায় করে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন পঞ্চবটীতলায় আছে বাবাঠকুরের (পঞ্চানন) থান।

গোকনা গ্রামে একটি নীলকুটি ছিল।

গোকনার মোঃ আতর আলি গায়েন আসর জমিয়ে কবিগান গাইতেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় গোকনা মধ্য বিদ্যালয়ে ২৫ জন ছাত্র ছিল।

১. তিতুমীর : বিহারীলাল সরকার
২. 'বেহালা-দর্পণ ও গণিত-সঙ্গীত' : নবীনকৃষ্ণ হালদার
৩. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ যদুরহাটি

যদুরহাটির বসতি নবোত্থিত ভূমিতে। এই গ্রামের খুশিলাল কাবাসি ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কবি বিজয়মাধব মণ্ডলের (হরিশপুর) জীবনসংগ্রামে সাহচর্য দিয়েছিলেন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনে যদুরহাটির তরুণেরা এগিয়ে এসেছিলেন। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে সারস্বত সম্মেলন সুরু হয়েছিল ১৯২৫ সালে। বিভিন্ন সময়ে এসেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ইলা মিত্র, গোলাম কুদ্দুস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন ঠাকুর, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ। ব্রতচারী স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে।

যদুরহাটির বরুণ কাবাসী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গণনাট্যের নাট্যকার। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'ছুটির ঘন্টা', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'অমর জ্যোতি', 'দৈত্য', 'পণপ্রথা' (তথ্যচিত্র) ইত্যাদি।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় যদুরহাটি নিম্ন-পাঠশালায় ৩৫ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :
১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ খাসপুর

যদুরহাটির কাছে একটি বনেদি গ্রাম খাসপুর অতীতে এই গ্রামের অনেক মানুষ শিক্ষায় ও জীবিকায় উচ্চপদ লাভ করেছেন। খাসপুরের মানুষ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন। খেলাধুলায় খাসপুরের খুব সুনাম ছিল। খাসপুরে খাসবিবির মাজার আছে।

ড. আনিসুজ্জামান

দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ড. আনিসুজ্জামানের পারিবারিক আদি বাড়ি ছিল খাসপুর গ্রামে। তাঁর মামার বাড়ি বসিরহাট শহরে। আনিসুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি । তাঁর পিতা ছিলেন বসিরহাটের খুবই নামি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এ টি এম মোয়াজ্জেম। তাঁর পিতামহ ছিলেন শেখ আবদুর রহিম।

ড. আনিসুজ্জামানের জন্মস্থান বসিরহাট নয়, কলকাতায়। জন্মের আগেই তাঁর পিতা এ টি এম মোয়াজ্জেম হোসেন বসিরহাটের বাড়ি বিক্রি করে কলকাতার পার্ক সার্কাসে বাড়ি কেনেন , সেখানেই আনিসুজ্জামানের জন্ম হয় । দেশভাগের সময় তাঁরা ওপারে খুলনায় চলে যান। তখন তিনি সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত। শৈশবে খাসপুর গ্রামে তাঁর যাতায়াত ছিল।

তার বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতার পার্ক সার্কাস হাই স্কুল থেকে । বাংলাদেশে গিয়ে খুলনা শহরের এক স্কুলে ভর্তি হন।

তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক । মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়াও তিনি জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেন এবং 'কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমি স্টাফ ফেলো' হিসেবে লন্ডন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক । তিনি ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) , উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯) ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আনিসুজ্জামানের বইগুলো বেশিরভাগই গবেষণা এবং প্রবন্ধধর্মী । আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ এবং গবেষণা গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ', 'আমার একাত্তর', 'কাল নিরবধি', 'সোশ্যাল এস্পেক্টস অব এন্ডোজেনাস ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়েটিভিটি ' ইত্যাদি । আনিসুজ্জামান এর বই সমূহ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সাহিত্যে ও সমাজে', 'কালচার এন্ড থট', 'নারীর কথা', 'আইনশব্দকোষ', ইত্যাদি ।

আনিসুজ্জামান শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন । প্রবন্ধ গবেষণায় অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমি থেকে প্রদত্ত বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন । শিক্ষায় অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদকে' ভূষিত করা হয় । শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' পদক প্রদান করা হয় । তাঁকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'স্বাধীনতা' পুরস্কার প্রদান করা হয় । তিনি ১৯৯৩ ও ২০১৭ সালে দুবার আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার , ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি লিট' ডিগ্রি এবং ২০১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন । ২০১৮ সালের ১৯ জুন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করে ।

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ কচুয়া

লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তাঁর গুরু সাধক ভগবান গাঙ্গুলি ও সতীর্থ বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-মাহাত্ম্যে কচুয়া বিখ্যাত।

কচুয়ার কাছে কাঁকড়া গ্রামের দ্বাদশ শিবমন্দির ও আনন্দময়ী কালী মন্দির খুব প্রাচীন। প্রতিষ্ঠাতা রায় ভোলানাথ চক্রবর্তী ছিলেন নবাব আলিবর্দি খানের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। সেই সময়ের দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাতকে শায়েস্তা করার জন্য নবাব তাঁকে রায় উপাধি-সহ বালিয়া ও বালান্ডা পরগনার কিছু এলাকার জমিদারি প্রদান করেন।

কচুয়ার পশুপতিনাথ মল্লিক ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ও কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এই পরিবারের মঞ্জুপতিনাথ মল্লিক ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুল থেকে মেধাবৃত্তি পেয়ে স্কুল ফাইনাল (১৯৫৪) পাশ করেছিলেন। অনেক গল্প ও কবিতার বই লিখেছেন।[১]

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় কচুয়ার সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ৩৩ জন ছাত্র ছিল।

কচুয়ার বাসিন্দা কবি আব্দুল্লাহ আল মাসুম। পেশায় শিক্ষক। তাঁর লেখা সুমিষ্ট ছড়া ও কবিতার বই 'গড়ানো জল'।

কচুয়ার কৃতী সন্তান অধ্যাপক মোঃ সহিদুল ইসলাম।

তথ্যঋণ :

১. ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মরণিকা - ১৮৮৫-১৯৮৫
২. চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন : কমল চৌধুরী

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ স্বরূপনগর - বেগমপুর - নেহালপুর

বেগমপুরের মোঃ মেকাইল রহমান ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন ও তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পের বই 'অন্য খুনি'।

বেগমপুরের মোঃ নাজিমুল হক প্রখ্যাত ফুটবলার।

বাসগৃহ, চণ্ডীমণ্ডপ, দলুজ ঘরের জন্য কাঠের উপর সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ও বাঁশের চিকন-কাজের দক্ষ শিল্পীদের বাস ছিল স্বরূপনগরের নিকটস্থ বাগুয়াডাঙ্গা, নগরকচুয়া ও অন্যান্য গ্রামে। এ শিল্প বর্তমানে প্রায় অবলুপ্ত।

জনশ্রুতি আছে, একসময় জঙ্গলপূর্ণ নেহালপুরে বাগদাদের দুজন ধর্মপ্রচারক এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের একজনের নাম থেকেই নেহালপুর নামকরণ হয়েছে। পির গোরাচাঁদের নামে প্রতি বছর ১২ ফাল্গুন মেলা বসে নেহালপুরের মহিষপুকুরের ধারে।

নেহালপুরের অনেক শিক্ষিত সন্তান কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আবার অনেকে সামাজিক-রাজনীতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছেন।

তথ্যঋণ :

১. চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন : কমল চৌধুরী

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ আড়বালিয়া

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আড়বালিয়ায় আসতেন। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও পরে অরবিন্দ ঘোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী রূপে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে সাত বছরের জন্য আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন।

আড়বালিয়ার জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরি ১৯১৪ সালে কলকাতায় ছোটলাট অ্যান্ডরুজ-কে হত্যা করতে গুলি চালান ও পরে গ্রেপ্তার হন।

বিশ্ববিপ্লবী ও দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)-এর জন্ম আড়বালিয়ায় (১৮৮৭)। পরে কোদালিয়া চলে যান। নবমানবতাবাদ দর্শনের জনক। বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। তিনি ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

সাহিত্যিক উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের (বিদ্যাভূষণ) জন্ম আড়বালিয়ায়। তাঁর রচিত বই 'ভারতের নারী', 'ভারতপুরুষ-শ্রীঅরবিন্দ', 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'সচিত্র-পদ্যগীতা' ইত্যাদি। 'ভারতের নারী' আজও বাঙালির ঘরে ঘরে সাদরে রাখা থাকে।

আড়বালিয়ার কৃতী সন্তান ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও নরেন্দ্র কুমার বসু (বাঘা নরেন)। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষে যে উকিলরা আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে উভয়েই ছিলেন।

আড়বালিয়ার অমিয়নাথ বসু ছিলেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান। পুরনো মার্টিন রেলপথ বন্ধ হওয়ার পরে নতুন রেলপথ অনেক দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল। তাঁর রচিত বিখ্যাত বই 'বাংলায় ভ্রমণ'।

অভিনেত্রী মলিনা বসু, বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য, অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য এই গ্রামের সন্তান।

স্বদেশী যুগে আড়বালিয়াতে ১৯৩০ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেবক সমিতি লাইব্রেরি ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানে আসতেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা।

আড়বালিয়ার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আড়বালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব।

আড়বালিয়ার বসু ও নাগচৌধুরি জমিদারেরা বিখ্যাত ছিলেন।

আড়বালিয়াতে একটি ছাদবিহীন বড় একতলা বাড়ি আছে যা নাকি একরাতে তৈরি হয়েছিল।

আড়বালিয়াতে অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

আড়বালিয়ার সুদক্ষ প্রতিমা-শিল্পীরা কয়েক প্রজন্ম ধরে নিজস্ব ঘরানার সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে চলেছেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় আড়বালিয়া সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ৪২ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. নূতন বাঙ্গালা অভিধান

৩. সুখী গৃহকোণ : ১ মার্চ ২০১৪

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ শিকড়া-কুলীনগ্রাম

শিকড়া-কুলীনগ্রাম এ অঞ্চলের অতি প্রাচীন গ্রাম। আনুমানিক ১৫৮০-এর দশকে সপ্তগ্রাম থেকে এখানে নদীর তীরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বপুরুষ সদানন্দ ঘোষ (মরকন্দ ঘোষের ১৭তম অধস্তন) বসতি স্থাপন করেছিলেন। পূর্ব নিবাস হুগলি জেলার বালীর নিকট আকনা গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর দিকে ছিল ইছামতীর এক শাখা নদী যা পরে বাঁওড়ে পরিণত হয়। সে সময়ে নদী তীরের উত্তর দিক গ্রামের সামনের দিক ছিল এবং টাকি রোড হওয়ার পরে দক্ষিণ দিক সামনের দিক হয়।

ঘোষ পরিবারের দেবীদাস ঘোষ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গা পূজা শুরু করেন - যা এখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরিবারের গিরীশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৯ সালে বি. এ. পাশ করেন এবং সম্ভবত তিনি বসিরহাট মহকুমার প্রথম গ্রাজুয়েট।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখালচন্দ্র ঘোষ) শিকড়া-কুলীনগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন (২১-১-১৮৬৩)।

শিকড়া-কুলীনগ্রামের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম' বেলুড় মঠের ট্রাস্টিগণ ১৫ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে অধিগ্রহণ করেন।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম ভারতী নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে এবং ১৯২৬ সালে দুর্গাদালানের সামনে পাকা থিয়েটার মঞ্চ তৈরি হয়েছিল (আশ্রম নির্মাণের কারণে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে)।

শিকড়া ফুটবল ক্লাব ১৯১১ সালে স্থাপিত। শিকড়া-কুলীনগ্রামের নাট্য প্রক্রিয়ার প্রাণপুরুষ ছিলেন হরিপদ বসু। নামী ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন নিখিলেশ ঘোষ, ভূপাল বসু প্রমুখ।

শিকড়া-কুলীনগ্রামের কাছে আছে পেঁচো-পাঁচির মন্দির। আগে নিকটে ছিল একটি আট-মাথা খেজুর গাছ।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় শিকড়া সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ২৬ জন ছাত্র ছিল ও ১৮৭৪ সালে ঘোড়ারাস নিম্ন-পাঠশালায় ২২ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীনগ্রাম : অরুণ প্রকাশ ঘোষ

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ গোপালপুর

গোপালপুর প্রাচীন গ্রাম। গোপালপুরে মিত্রদের বাড়ির নীচে প্রাচীন সুরঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বেশ কিছু মৌর্যযুগের প্রত্নুনিদর্শন পাওয়া গেছে। 'চন্দ্রকেতুগড়' এই আধুনিক নামে পরিচিত অতীতের 'গঙ্গে' বন্দর-নগরীর পূর্ব সীমান্তে ছিল গোপালপুর গ্রাম।

গোপালপুরে রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দেশ্বর-এর মন্দির আছে।[২]

গোপালপুরের কর্মকারেরা উৎকৃষ্ট তালা-চাবি ও দাঁড়ি-পাল্লা নির্মাণে বিখ্যাত ছিলেন।

বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী, স্বাধীনতা সংগ্রামী সুধীরকৃষ্ণ দাসের (১৯২১ -) জন্ম গোপালপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস চাঁপাপুকুর গ্রাম। গোপালপুর স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। প্রথম জীবনে অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে ছ-মাস ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছ-মাস বন্দি ছিলেন। বিপ্লবী যতীন দাসের ভাই কিরণ দাসের সাথে যোগাযোগের সূত্রে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দু-বছর বন্দী ছিলেন। ১৯৭৫ সালে ভারত সরকারের তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা পান।

তথ্যঋণ :

১. চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন : কমল চৌধুরী

২. A List of Objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal, 1879

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ বাদুড়িয়া

দক্ষিণবঙ্গের সর্বপ্রাচীন কবি ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপ্রদাস পিপিলাই। জন্ম বাদুড়িয়া (বাদুড়্যা-বটগ্রাম)। মনসা মঙ্গল কাব্যের (মনসা বিজয়) অন্যতম প্রাচীন কবি। রচনাকাল আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

বাদুড়িয়ার লন্ডন মিশনারি স্কুল (L.M.S.) স্থাপিত হয় ১৮৩৭ সালে। ১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় বাদুড়িয়া সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ২৫ জন ছাত্র ছিল।

বাদুড়িয়া (মাথাভাঙ্গা) L.M.S.-এর ময়দানে সাহেবদের সাথে খেলেছিলেন সেকালের ফুটবলার গনি মিঞা। গনি মিঞার ফুটবল টিম (ছাত্র সংঘ, হাবড়া) খুব বিখ্যাত ছিল। তাঁর দুই ছেলে নাসির ও নৌসাদ দক্ষ খেলোয়ার ছিলেন। নৌসাদ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলতেন।

বাদুড়িয়া থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে সাহিত্য পত্রিকা 'বিদ্রোহিনী যোদ্ধা'। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ঘোষনা করে মুনমুন মণ্ডল এই কাজটি করে চলেছেন নিষ্ঠার সাথে। স্বাধীনচেতা এই নারীর একক প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ইতিমধ্যে 'নটী বিনোদিনী', 'নজরুল ইসলাম', 'তিতুমীর', 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ও 'বিশ্ব কবিতা দিবস' নিয়ে প্রামান্য সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হরিশপুর - খোলাপোতা

কল্লোল যুগের কবি বিজয়মাধব মণ্ডল হরিশপুরের বাসিন্দা ছিলেন। বিজয়মাধব মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ 'ইছামতী', 'বৈজয়ন্তী', 'এত দুঃখ চাঁদের কপালে', 'ধুসর সন্ধ্যা', 'শতপর্ণী' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাঁর লেখা ভক্তিমূলক নাটক 'সনাতন'।

হরিশপুরের বাসিন্দা ছিলেন শিক্ষক ও সাহিত্যিক গোলাম হোসেন।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় হরিশপুর নিম্ন-পাঠশালায় ৩৪ জন ছাত্র ছিল।

খোলাপোতা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার সুধীন সরকার।

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ যশাইকাটি

অমূল্য অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল যশাইকাটি গ্রামে। তাঁর পিতামহ যশোহর জেলার ঝাঁপামস্যিনগর থেকে শ্বশুরের গ্রাম যশাইকাটিতে আসেন। জীবন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি বহু বিদ্যালয়ে পড়েছেন। গ্রামের বাংলা প্রাথমিক, বসিরহাট মাইনর স্কুল, চাঁপাপুকর উচ্চ প্রাথমিক, বাদুড়িয়ার L.M.S., আড়বেলিয়া হাইস্কুল, ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুল। ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলে দ্বিতীয় (এখনকার নবম) শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে স্কুলের বোর্ডিং-এ ছিলেন। এই স্কুল ছেড়ে কলকাতায় পড়তে চলে যান। বাদুড়িয়া হাইস্কুলে হেডপণ্ডিত পদে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে কাজ ছেড়ে ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে কিছুদিন কাজ করে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর দীর্ঘ চার দশকের সাধনার ফল 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

তথ্যঋণ :

১. *আভিধানিকের আত্মকথা* (জীবনস্মৃতি) : *হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়*

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ রুদ্রপুর – নারকেলবেড়িয়া

রুদ্রপুরের চৌধুরিরা বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরিদের সগোত্র। রুদ্রপুরের কিছু জমিদারি ছিল মেদিনীপুরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবার তাঁদের প্রজা ছিলেন। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল রুদ্রপুরের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি ছিলেন পুরুলিয়ার সাব-রেজিস্ট্রার।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় রুদ্রপুরের সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ৩১ জন ছাত্র ছিল।

নারকেলবেড়িয়ার ভূমিপুত্র জানকীনাথ ভট্টাচার্য ছাত্রজীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি ও আইনের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সতীর্থ ও সহ-অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় নারকেলবেড়িয়া সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ২৫ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :
১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ শায়েস্তানগর – গোকুলপুর–কৈজুড়ি

শায়েস্তানগরে জন্ম প্রখ্যাত সমাজসেবী ও কৈজুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শিরোমণি সরকারের।

গবেষক-সাহিত্যিক ড. গিরীন্দ্রনাথ দাশের জন্ম গোকুলপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই ‘বাঙলার পীর সাহিত্যের কথা’। তিনি ‘Pir Cult and its Literature in Barasat Basirhat Region’ নিবন্ধের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. লাভ করেন।

বাউল শিল্পী মাধব মণ্ডলের বাড়ি ছিল গোকুলপুর গ্রামে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কৈজুড়ি গ্রামের বসন্তকুমার পাল ছিলেন বিখ্যাত কীর্তনীয়া ও বেতার শিল্পী।

তথ্যঋণ :
১. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ পদ্মবিলা - সগুনা

বিথারি গ্রামের (পবনকাটি) মেধাবী সন্তান সাহিত্যিক মোশারফ হোসেন । পৈতৃক নিবাস পদ্মবিলা গ্রাম । বর্তমানে বনমালীপুরের (বারাসত) বাসিন্দা । তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'পাঞ্চাল কন্যার আত্মকথন', 'রোহিনী' ইত্যাদি । স্মৃতিচারণমূলক বই 'স্মৃতিকথা সমকাল ও সোনাই ইছামতি জনপদ' ।

সাহিত্যিক ও নাট্য-গবেষক সুধী প্রধানের জন্ম সগুনা গ্রামে । প্রথম জীবনে তিনি যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন । মাত্র ১৯ বছর বয়সে টেগার্ট হত্যা মামলায় দৃত হন । তেঁতুলিয়ায় নজরবন্দী থাকাকালে ওই অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন । তাঁর লেখা বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'Marxist Cultural Movement in India : Chronicles and Documents (1936-1947)' ।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. স্মৃতিকথা সমকাল ও সোনাই ইছামতি জনপদ : মোশারফ হোসেন

৩. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হাকিমপুর

আরবি, ফারসি, উর্দু, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত মওলানা মোহাম্মদ আক্রম খাঁ-র জন্মভূমি হাকিমপুর । তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মহম্মদ আলি জিন্নার সুযোগ্য সহকর্মী । তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'আজাদ' ও 'মোহম্মদী'-এর সম্পাদক ছিলেন । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । পরে মুসলিম লিগে যোগদান করেন ও প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট হন । তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশভাগের পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান।

ভারতের কমিউনিস্ট মতাদর্শের অন্যতম পথিকৃৎ আব্দুর রেজ্জাক খানের জন্মভূমি হাকিমপুর। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। জনশ্রুতি, তাঁদের পূর্বপুরুষরা পিরালি ব্রাহ্মণ ছিলেন । আব্দুর রেজ্জাক খান কৈশোরে 'রেশমি রুমাল' দলের মুসলমান তরুণদের নিয়ে বিপ্লবী দল গঠন করেন। ইতিমধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন । চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহসহ বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে তিনি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে দিতেন। পরে কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সারা জীবন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. স্মৃতিকথা সমকাল ও সোনাই ইছামতি জনপদ : মোশারফ হোসেন

৩. ইছামতীর দেশ : প্রবীর মুখোপাধ্যায়

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ তরঙ্গহাটি - ভাটকলাগাছি

সাতক্ষীরার ঝিটকা ও অন্যান্য এলাকার কিছু পরিবার ১৯২০-এর দশকে খরা-বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গাইঘাটা থানার ধর্মপুর অঞ্চলের এক জলা-জঙ্গল-বনভূমিতে বসতি করেন। বহুপূর্বে 'তরঙ্গ ডাকাতের' আস্তানা ছিল সেখানে। সে ধনীর সম্পদ লুট করে গরিবদের দান করত। নবাগত মানুষেরা বহু কষ্টে তরঙ্গহাটি গ্রামের পত্তন করেন।

তরঙ্গহাটির কবি-সাহিত্যিক বিমলেন্দু সরকার। তাঁর কবিতায় নজরুল-জীবনানন্দ-জসিমুদ্দিনের আঘ্রাণ মেলে। তাঁর প্রকাশিত বই 'ভোরের শিশিরে শিউলি', 'প্রণাম জন্মভূমি'। চরমতম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যবন হরিদাসের জন্ম ১৪৫০ সালে সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা মনোহর চক্রবর্তী, মাতা উজ্জ্বলা। পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় শিশু হরিদাসকে পুত্রের মত মানুষ করেছিলেন হাকিমপুরের হবিবুল্লা কাজী। পরে হরিদাস গৃহত্যাগ করে চলে যান বনগাঁর বেনাপোল অঞ্চলে (হরিদাসপুর) ও তারপর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে চৈতন্যদেবের অনুসারী হয়ে পুরী চলে যান।

তথ্যঋণ :
১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
২. স্মৃতিকথা সমকাল ও সোনাই ইছামতি জনপদ : মোশারফ হোসেন
৩. ইছামতীর দেশ : প্রবীর মুখোপাধ্যায়

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ চাতরা - মসলন্দপুর

যশোর রাজ্যে অনেক অবাঙালি পরিবার বসতি করেছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য কনৌজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লবঙ্গ মিশ্রকে এনে তাঁর সভাপণ্ডিত করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মিশ্ররা কচু রায়ের সান্নিধ্যে আঁধারমানিক গ্রামে আসেন। পরে তাঁরা বাস করেছেন পাপিলা, উত্তর চাতরা, চন্দনপুর (খুলনা) গ্রামে।

অবাঙালি ব্রাহ্মণ বিক্রম শুকুলের পরিবার দক্ষিণ চাতরায় বসতি করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনে উত্তর চাতরা ও দক্ষিণ চাতরার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মিশ্র পরিবারের যুবকেরা। চাতরা কংগ্রেস কমিটি দক্ষিণ চাতরা গ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিল ২৫ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখের এক জনসভায় (তখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতারিত)। সভায় সুভাষচন্দ্র ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ভাষণ দিয়েছিলেন।

উত্তর চাতরার সন্তান বিপ্লবী কান্তিচন্দ্র (নীলমাধব) মিশ্র। যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। চন্দননগর বোমা মামলার আসামী ছিলেন। কলকাতার বাঁশতলা ডাকাতি ও কাঁটাপুকুর ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আত্মগোপন ও দীর্ঘ কারাবাসের পর মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান।

দক্ষিণ চাতরার পল্লব কীর্তনীয়া একাধারে গায়ক, অভিনেতা, সাহিত্যিক ও ডাক্তার।

মসলন্দপুরের মেয়ে গায়িকা অন্তরা মিত্র মুম্বাই সিনেমার 'দিলোয়ালে' ছবিতে গাওয়ার পর বিখ্যাত হয়েছেন। এখন মুম্বাইবাসী।

তথ্যঋণ :

১. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক
২. ইছামতীর দেশ : প্রবীর মুখোপাধ্যায়
৩. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ খাসপুর – রামচন্দ্রপুর

আবদুল গফুর সিদ্দিকির জন্মস্থান খাসপুর। পুঁথি-সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শহিদ তিতুমীর', 'মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্য', 'বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি' ইত্যাদি। নিরন্তর অন্বেষণে বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রাচীন রচনা উদ্ধার করেছেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম সংগঠক ছিলেন দেশান্তরী হতে হয়েছিল ১৯৫০ সালে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে ত্রাণ শিবিরে থেকেছেন। পরে এক খণ্ড জমি পেলেও মৃত্যু হয় নিদারুণ অভাবের তাড়নায়।

বাদুড়িয়া থানার খাসপুর-রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ রায়। সুরেন্দ্রনাথ রায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে বসিরহাটের ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের সহযোগী ছিলেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন।

রামচন্দ্রপুরের সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র সত্যেন রায়। প্রবন্ধকার, প্রত্ন-গবেষক, ছড়া ও প্রবাদ-সংগ্রাহক। মাতুলালয় চৌরাশিতে জন্ম। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন (১৯৩৭)। বৈচিত্র্যময় ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্ন অনুসন্ধানের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। প্রত্নপ্রেমী সত্যেন রায় চাকলা থেকে বৌদ্ধদেবী বিশালাক্ষীর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। বেড়াচাঁপায় বাস শুরু করেন ১৯৪০ সালে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পরে ১৯৭৮ সাল থেকে বারাসতে বাস করেন। 'বারাসত সংস্কৃতি পরিষদের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বাউল গান গাইতেন একতারা বাজিয়ে।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ বিথারি

বিথারি গ্রামে জন্মভূমি রানি রাসমণির জামাতা ও শ্রী রামকৃষ্ণের অনুগ্রাহী জমিদার মথুরমোহন বিশ্বাসের। সেই সূত্রে শ্রী রামকৃষ্ণের পদধূলি পড়েছিল এই গ্রামে।

জননেতা শশধর চক্রবর্তীর জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস বিথারি গ্রাম। প্রথমে পানিহাটির বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এ ও পরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে ফোর্ট উইলিয়াম সেনা ছাউনিতে থাকার সময় গোরা কর্নেল হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন ও আত্মগোপন করেন সুন্দরবনে। সেখানে তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত হন ও ১৯৫০ সালে কাকদ্বীপে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কারাবাস করেন। পরে বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকেন ও বনগাঁতে স্থায়ীভাবে বাস করেন। বনগাঁ পুরসভার সাথে দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলেন। বনগাঁ অঞ্চলের ও অন্যান্য আঞ্চলিক ইতিহাসের বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন।

হাকিমপুর -বিথারি অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন সমাজসেবী ফজলার রহমান সাহেব (ফজলু পণ্ডিত)। তাঁর বিথারির বাড়িতে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃষকবেশে আত্মগোপন করেছিলেন হেমন্ত ঘোষাল। পার্টির নির্দেশে এখানে থেকে তিনি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতেন। হেমন্ত ঘোষাল দিনের বেলা তিনি লুঙ্গি পরে, মাথায় তালপাতার টোকা দিয়ে হুকো টানতে টানতে মাঠে যেতেন, চাষিদের সাথে মাঠে কাজ করতেন।

'অনুষ্টুপ' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যসেবী অনিল আচার্য বিথারীর সন্তান।

তথ্যঋণ :

১. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৩. ইছামতীর দেশ : প্রবীর মুখোপাধ্যায়
৪. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস
৫. স্মৃতিকথা সমকাল ও সোনাই ইছামতি জনপদ : মোশারফ হোসেন

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ শিবহাটি – সংগ্রামপুর - পানিতর

কল্লোল যুগের কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরির (২৭-৮-১৮৭২ - ১৫-৯-১৯৪০) জন্ম শিবহাটি গ্রামে। তিনি ওকালতি করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'গোধূলি', 'রাকা', 'সিন্ধু', 'মঞ্জরি', 'ছায়াপথ' ইত্যাদি। বসিরহাটে সাহিত্যচর্চার রূপকার ছিলেন ভূজঙ্গধর। স্থানীয় সাহিত্যসেবীদের নিয়ে 'বসিরহাট বাণী সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। সম্মিলনীর মুখপত্র ছিল 'পল্লীবাণী'। সম্মিলনীর মোট চারবার অনুষ্ঠান হয়েছিল বসিরহাটে ও স্থানীয় অঞ্চলে। বিভিন্ন অধিবেশনে এসেছিলেন জলধর সেন, নিখিলনাথ রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ। 'পল্লীবাণী'কে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা করতেন কবি বিজয়মাধব মণ্ডল, কবি মোঃ খোশলাল, দেবেন্দ্র নাথ প্রমুখ।

শিবহাটির নিশিকান্ত রায়চৌধুরি (২৪-৩-১৯০৯ - ২০-৫-১৯৭৩) ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের জগতে এক সাধক কবি। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসে কবিগুরুর সান্নিধ্যে আসেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লন্দলাল বসুর কাছে শিল্পচর্চার পাঠ নিয়ে অসাধারণ চিত্রশিল্পী রূপে খ্যাত হয়েছেন। পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দর সান্নিধ্য লাভ করেন। অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সমানভাবে কাব্যসাধনাও করে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অলকনন্দা', 'বৈজয়ন্তী', 'বন্দেমাতরম', 'নবদীপন', 'লীলায়ন', 'ভোরের পাখি', 'দিনের সূর্য্য', 'মর্মবিহঙ্গ', 'চিরন্তনী' ইত্যাদি; সঙ্গীত গ্রন্থ 'গীতশ্রী', 'সুরলিপিকা', 'সঙ্গীত শতদল'। তাঁর কিছু কবিতা শ্রী অরবিন্দ অনুবাদ করেছিলেন।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় শিবহাটির সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ৪২ জন ছাত্র ছিল।

কবি মোঃ খোশলালের বাড়ি ছিল সংগ্রামপুরে। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'মুক্তি কোন পথে?', 'মানবতার গান ও গাথা', 'সন্ধান', 'মানবতা'।

পানিতর গ্রামের প্রাচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উত্তরপুরুষ ছিলেন সাহিত্যিক বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কবিরাজ পিতামহ চিকিৎসার কাজের সুবিধার জন্য পানিতর ছেড়ে বনগাঁর বারাকপুর গ্রামে বসতি করেন। বিভূতিভূষণের শ্বশুরবাড়িও পানিতরে। তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবী ছিলেন পানিতরের কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় পানিতর নিম্ন-পাঠশালায় ৫১ জন ও ইটিন্ডা সার্কেল নিম্ন-পাঠশালায় ২১ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ পুঁড়া - আধাঁরমানিক - মালঙ্গপাড়া - বালতি

যশোর রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে 'ছোট নবদ্বীপ' ছিল পুঁড়া-আধাঁরমানিক-মালঙ্গপাড়া-বালতি অঞ্চল।

অতীতে পুঁড়া গ্রাম সংস্কৃতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে অনেক চতুষ্পাটী ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ভট্টাচার্য বংশের কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের খুব খ্যাতি ছিল। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তিনি বলতেন, 'কমলাকান্ত শর্ম্মা যে স্থানে থাকবেন সেই স্থানই নবদ্বীপ'। কমলাকান্তের উত্তরপুরুষ ছিলেন পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ। সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ও অনুবাদক ছিলেন।

পুঁড়ার ভট্টাচার্য বংশের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালংকার ১৮২৪ সালে স্যস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পুঁড়া গ্রামের অন্যান্য বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, রমানাথ ন্যায়বাচস্পতি, কৃষ্ণচরণ ন্যায়বাগীশ, দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ, কন্দর্প তর্কসিদ্ধান্ত।

বাংলার নবজাগৃতির সময়ের বাস্তববাদী ভাবনার প্রথম ব্যক্তিত্ব অক্ষয় কুমার দত্তের (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) পরিবারের আদি নিবাস ছিল পুঁড়ার কাছে গন্ধর্বপুর গ্রামে। এই পরিবার পরে বর্ধমানের চুপি গ্রামের বাসিন্দা হয়েছিলেন।

সাহিত্যিক নিখিলনাথ রায়ের (গুহ) পৈত্রিক নিবাস ছিল পুঁড়া গ্রামে। তিনি ছিলেন 'সরস্বতী' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বসিরহাটের 'পল্লীবাণী' পত্রিকার সম্পাদক। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'সোনার বাংলা', 'জগৎশেঠ', 'প্রতাপাদিত্য', 'অশ্রুহার', 'সমাধান' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে বহরমপুরে।

মালঙ্গপাড়া সংস্কৃত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে অনেকগুলি চতুষ্পাটী চলত। মালঙ্গপাড়াতে জন্মেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাধর ন্যায়ভূষণ, গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, মোহিনীমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমূখ।

রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব (কচু রায়) ও চাঁদ রায় আঁধারমানিক গ্রামে বসতি করেছিলেন। এই গ্রামে অনেক টোল ছিল এবং মেয়েরাও টোলে পড়াতেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় পুঁড়া মধ্য বিদ্যালয়ে ৪৭ জন ছাত্র ছিল। ১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় আধাঁরমানিক নিম্ন-পাঠশালায় ২২ জন, নারায়ণপুর নিম্ন-পাঠশালায় ১৭ জন, লক্ষীকান্তপুর নিম্ন-পাঠশালায় ২১ জন, ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৩. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

৪. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ বসিরহাট

ষোড়শ শতাব্দীতে বসিরহাটে রেশমকুঠি ছিল। রেশমকুঠির দেওয়ান ছিলেন শিকড়া-কুলীনগ্রামের ঘোষ পরিবারের জামাতা রামরাম বসু (পূর্ব নিবাস অম্বিকা কালনা, বর্ধমান জেলা)। সেকালে বাদুড়িয়া, বসিরহাট, গোবরডাঙা. সুখচর ইত্যাদি স্থানে দিশি চিনির উৎপাদন হত।

বসিরহাট অঞ্চলে অনেক নিমক কুঠি ছিল। তখন প্রশাসনকেন্দ্র ছিল বাগুন্ডি। বাগুন্ডিতে থাকত নিমক কুঠির দেওয়ান। মোগল আমলে প্রশাসক ছিল কিল্লাদার বা ফৌজদার। ইংরেজরা বারাসত জেলা তৈরি করে (১৮২১) তার প্রশাসনিক কেন্দ্র করেছিল প্রথমে বাগুন্ডিতে। পরে ১৮২৩ সালে প্রশাসনিক কেন্দ্র বাগুন্ডি থেকে বারাসতে স্থানান্তরিত করে এবং বারাসত জেলা তুলে দিয়ে বারাসত সাব-ডিভিসন করে।

ইছামতীর ভাঙনে বাগুন্ডি-সোলাদানা বিপর্যস্ত হয়ে হয়। অপরদিকে নতুন চরভূমি জেগে ওঠে যা তপা-ম্রিজাপুর ও বেলে-বসিরহাট নামে পরিচিত হয়। বসিরহাটে দারোগার চৌকি বসে। তিতুমিরের সহযোদ্ধা সাজন ফকিরের গানে বসিরহাটের দারোগাকে 'বেলের (বালিয়ার) দারোগা' বলা হয়েছে। ১৮৬১ সালের জানুয়ারিতে 'বসুরহাট' নামে মহকুমা স্থাপিত হয়।

এক সময় মৌজা বসিরহাটের জমিদার ছিলেন টাকির রায়চৌধুরিরা ও মৌজা তপা-ম্রিজাপুরের জমিদার ছিলেন ধান্যকুড়িয়ার সাউ জমিদার পরিবার। এ অঞ্চলই এখন বসিরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র।

সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, যশোহর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিখ্যাত কুলীন ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি গোপালদাস বসু বাকলা চন্দ্রদ্বীপ থেকে যশোহর রাজ্যে আসেন। তাঁর আবাসস্থল বসুরহাট (বসিরহাট) নামে খ্যাত। তাঁর কন্যার সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হয়েছিল।

প্রতাপপুত্র অনন্ত রায়ের শিশুপুত্র বিজয়াদিত্য মাতামহ গোপালদাস বসুর বাড়িতে আশ্রয় পান। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর বসু মহাশয় বিজয়াদিত্যকে নিয়ে ঢাকায় চলে যান।

বিপ্লবী ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল বসিরহাটে বাস করতেন। তিনি বাঘা যতীন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সহযোগী ছিলেন। বসিরহাটের কংগ্রেস সংগঠনের তিনি প্রথম সম্পাদক ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় অনেক চিকিৎসাবিদ্যার বই লিখেছিলেন।

বসিরহাটের ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের পুত্র প্রফুল্লকুমার ঘোষাল নাট্যানুরাগী ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড হয়ে আমেরিকায় যান। হলিউডে সিনেমার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে আমেরিকার বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ভারতের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকল্পে The People of India ও The People in Colonies বই লেখেন। দ্বিতীয় বইটি ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন।

বসিরহাট কোর্টের উকিল দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরির পুত্র যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি ৭ নভেম্বর ১৯০৮ তারিখে কলকাতার ওভারটুন হলে বাংলার ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারকে গুলি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফ্রেজারের পাশে বসে থাকা বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব অতর্কিতে ছুটে এসে যতীন্দ্রনাথকে বাহুবন্দী করেন। বিচারে যতীন্দ্রনাথের দশ বছরের দ্বীপান্তর হয়। এর পরে যতীন্দ্রনাথের সাঙ্গপাঙ্গদের ধরার জন্য পুলিস বসিরহাটে ব্যাপক তল্লাসি চালায়।

কবি নজরুল ইসলাম ১৯২৫ সালে বসিরহাটে এসেছিলেন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। সঙ্গে ছিলেন শামসুদ্দিন হুমায়ুন ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবদুল হালিম। নজরুল এখানে দশ-বারো দিন ছিলেন। ছিলেন ডাকবাংলোতে। সেখান থেকে হুগলিতে ফিরেই নজরুল সাংঘাতিকভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং কোনও ক্রমে বেঁচে ওঠেন।

বসিরহাটের সন্তান বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার। জন্ম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ ও তাঁর ফাঁসি হয় ৯ জুলাই ১৯৩৪ সাল। বিপ্লবী দলের নির্দেশে ২৫ আগস্ট ১৯৩০ টেগার্ট হত্যার চেষ্টায় আক্রমণকারীর তিনজনের তিনি অন্যতম ছিলেন। আক্রমণকালে তিনি গ্রেপ্তার হন ও তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়। পরে পালিয়ে বিপ্লবী কাজ করতে থাকেন। পুলিস গোপন আস্তানায় হানা দিলে উভয় পক্ষে গুলি চলে ও শেষে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন।

ফাঁসির প্রাক্মুহূর্তে তিনি জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্' 'বন্দেমাতরম্' - কারার নির্জন প্রাকার ভেদ করে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল, 'বন্দেমাতরম্'- 'বন্দেমাতরম্'। পাশের সেলের হেমন্ত ঘোষাল ও অন্য বন্দীরা তার আগের রাত্রে শুনেছিলেন তাঁর নিজের রচিত গান 'বন্দেমাতরম্' -

চাঁদের আলো এই কারাতে
আবার কেন এলে রাতে
হেথায় নাহি চম্পাবেলি
ফুটবে যে ফুল তাঁর সাড়াতে।
পাষাণকারা বন্দীশালা
হেথায় শুধুই দহনজ্বালা
অশ্রুজলের বয় তটিনী
লক্ষ নীরব ধারাতে।
নাও ফিরিয়ে জ্যোৎস্নাধারা
রইব আমি তন্দ্রাহারা
শেষের নিঃশ্বাস দাও ছাড়িতে
বন্ধু ফাঁসির মহতপরে।

ভারতের যশস্বী শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্যাবলা গ্রামের (বসিরহাট) সন্তান। বসিরহাটের মার্টিন কোম্পানির রেলপথ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। 'সঙ্গীত' ও 'সঙ্গীত-সুধা'-র গ্রন্থকার প্রেমলতা দেবী তাঁর কন্যা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শিল্পপতি স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্টিন বার্ন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও Indian Iron and Steel Co.-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বসিরহাটের উজ্জ্বল নাট্যপ্রতিভা ছিলেন নট ও নাট্যকার দেবেন্দ্র নাথ। দেবেন নাথের লেখা ৬২টি যাত্রাপালার কয়েকটি হল 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা', 'লালন ফকির', 'সন্তোষী মা'।

বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব ও 'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের (জন্ম আড়বালিয়া গ্রামে) ছাত্রজীবন কেটেছিল বসিরহাটে।

বসিরহাটের গুণী শিক্ষক সুভাষচন্দ্র কুণ্ডু বিজ্ঞানের ছাত্রদের তাঁর 'ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স'-এ বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে চলেছেন। তাঁর অগণিত ছাত্র পরবর্তী জীবনে দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মহাকাশ বিজ্ঞানী অমলেন্দু দত্ত ছিলেন বসিরহাট হাই স্কুলের ছাত্র। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেনের আদি নিবাস সম্ভবত বসিরহাট অঞ্চল। মুক্তমনা সম্পূর্ণ অন্বিত মানুষ। পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, অধ্যাপক, সাহিত্যপ্রেমী, সঙ্গীতপিয়াসী, দাবারু। বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কবি নজরুল ও আবদুল ওদুদের বন্ধু। তাঁর কন্যা বাংলাদেশের প্রবীণা লেখিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সন্জীদা খাতুন।

বসিরহাটের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট মহকুমার আঞ্চলিক ইতিহাসের অন্যতম গবেষক ছিলেন। বসিরহাট ইতিহাস সংসদ, ভাষা-শহিদ স্মারক সমিতি, মাসিক সাহিত্য পাঠের আসর ইত্যাদি স্থাপনার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন তিনি। অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছেন স্থানীয় পত্র-পত্রিকায়।

বসিরহাটের গর্ব প্রখ্যাত ফুটবলার রবীন সেনগুপ্ত (ঘ্যাসদা), মিহির বসু, অলোক দাশ, দীপেন্দু বিশ্বাস, হবিবুর রহমান, তপন ঘোষ, সুধীর দাশ, মৃদুল ব্যানার্জি, নাসির আহমেদ, মহিলা ফুটবলার টুম্পা মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

বসিরহাটের সংস্কৃতিমান ব্যক্তিত্ব পান্নালাল মল্লিক সাহিত্যচর্চা ও আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষণা করে চলেছেন। তাঁর অমূল্য গবেষণা গ্রন্থ 'বসিরহাট মহকুমার ইতিবৃত্ত'। বসিরহাট সম্পর্কে মৌলিক ও বিস্তারিত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কাজে তিনি পথিকৃৎ।

বসিরহাটের বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে চলেছেন অনিল ঘোষ।

বসিরহাটের নাট্যদলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কালচারাল ইউনিট', 'সুমেরু', 'মহুয়া', 'শবনম', 'উর্বী', 'স্বর্গদল', 'বসিরহাট মহকুমা নাট্য আকাদেমি' প্রভৃতি।

বসিরহাটের সংস্কৃতিচর্চার একটি মাধ্যম হল স্থানীয় পত্রিকা । ২০১৯ সালের শারদোৎসবে ১১টি পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে । এগুলি হল – তরঙ্গপ্রবাহ, বিবস্বান, কাশফুল, শাশ্বত আলাপন, মর্ত্যলোক, ছাউনি, জেলা হিতৈষী, বিবেক, আমার পত্রপুট, ইছামতী সংবাদ, তিমির বিনাশী।

বামাক্ষ্যাপা-শিষ্য তান্ত্রিক যোগী তারাক্ষেপার মণিমোহন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালী ও তারা মায়ের মন্দির আছে বসিরহাটের আশ্রমপাড়াতে।

বাংলার দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ বসিরহাটের শাহি মসজিদ (শালিক মসজিদ) ইং ১৪৬৬-৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। আরব থেকে আগত বাইশ আউলিয়ার অন্যতম পির হজরৎ শাহ আলির প্রাচীন আস্তানা বা মাজার আছে বসিরহাটে।

১৯০৯ সালের একটি সংবাদে বসিরহাটের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের চিত্র –

" স্থানীয় সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল । কুশদহ অঞ্চলের স্কুলসমূহে নিম্নলিখিত সংখ্যাক্রমে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

রাণাঘাট	প্রথম বিভাগে ১টি,	দ্বিতীয় বিঃ ৫টি,	তৃতীয় বিঃ ০	মোট ৬টি
বনগ্রাম	” ০	” ২	” ২	” ৪
গোবরডাঙ্গা	” ০	” ১	” ১	” ২
বারাসাত	” ৪	” ৩	” ০	” ৭
বসিরহাট	” ৩	” ৮	” ১	” ১২
ধানকুড়িয়া	” ৩	” ১	” ০	” ৪
নিবধাই	” ১	” ৩	” ০	” ৪
গুস্তে	” ০	” ৩	” ০	” ৩

উপরোক্ত পরীক্ষার ফল দৃষ্টে বসিরহাট স্কুলের ফল অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া বোধহয় । তৎপরে মহকুমার সহিত তুলনায় গ্রাম্য স্কুল ধানকুড়িয়া, নিবধাই ও গুস্তেও মন্দ নয়।..."
('কুশদহ' মাসিকপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬, পৃঃ-১৪২)

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় বসিরহাট ২৭ সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে জন ছাত্র ছিল।

বসিরহাট টাউন স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্র স্বর্ণেন্দু রায় পথ দুর্ঘটনায় মারা যায় । শোকসন্তপ্ত মা-বাবা চেয়েছিলেন স্বর্ণেন্দু নেই, কিন্তু স্বর্ণেন্দুরা বেঁচে থাকুক । তাই তাঁরা চেয়েছেন প্রাণাধিক প্রিয় ছেলের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দেওয়া হোক অন্য মুমূর্ষুরোগীকে । শোকের আবহেও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । সেই মত এক রোগীকে লিভার, ও অন্য দুই রোগীকে দুই কিডনি দেওয়া হয়েছে।

তথ্যঋণ :

১. A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916 : Monmohan Chakrabatti

২. A Statistical Account of Bengal. 24 Parganas : W.W.Hunter

৩. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

৪. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৫. বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা : পান্নালাল মল্লিক

৬. Sedition Committee (1918) Report

৭. কাজী নজরুল ইসলাম : সমৃতিকথা : মুজফফর আহ্মদ

৮. সময় অসময়ের সমৃতি : হেমন্ত ঘোষাল

৯. ইছামতী বিদ্যাধরী : শরৎ ১৪২০

১০. Final Report of Survey and Settlements in 24 Parganas : A. C. Lahiri

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ দণ্ডিরহাট

দণ্ডিরহাটের ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৩৬-১৮৮০) ছিলেন ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র ও পরে তাঁর সহযোগী। তিনি প্রথম যুগের ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

দণ্ডিরহাটের রাধামাধব বসু ছিলেন ঢাকার নবাবের দেওয়ান। তাঁর পুত্র ডাঃ জগদ্বন্ধু বসু। ডাঃ জগদ্বন্ধু বসু ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি. (১৮৬৩) ছিলেন। এম. বি. ও এম. ডি. মেডিক্যাল পরীক্ষার পরীক্ষক হয়েছিলেন। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহযোগী ছিলেন।

নট-নাট্যকার মনোজ মিত্র দণ্ডিরহাটের বাসিন্দা ছিলেন (পূর্ব নিবাস - ধূলিহর, সাতক্ষীরা)।

বিখ্যাত নাট্যপ্রেমী ছাকা মিঞার বাড়ি ছিল দন্ডিরহাটে। তাঁর যাত্রাদল ১৯৫০-৬০-এর দশকে গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য যাত্রাভিনয় করেছিল। যাত্রাদল চালানোর নেশাতেই তিনি নিঃস্ব হয়েছিলেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় দণ্ডিরহাট মধ্য বিদ্যালয়ে ৮০ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

৩. স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীনগ্রাম : অরুণ প্রকাশ ঘোষ

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ ট্যাটরা - ভেবিয়া

ট্যাটরা অনেক প্রাচীন গ্রাম। ট্যাটরা গ্রামের চৌধুরি পরিবারে বিয়ে করে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বপুরুষ সদানন্দ ঘোষ শিকড়া-কুলীনগ্রামে ১৫৮০-এর দশকে বসবাস শুরু করেছিলেন।

ট্যাটরা সুক্ষ্ম তাঁত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল।

যাত্রাভিনেতা মোহন চট্টোপাধ্যায় বসিরহাটের ট্যাটরা গ্রামের বাসিন্দা।

ট্যাটরা গ্রামের বাসিন্দা শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ক্ষুদে লেখক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর কাজের মধ্যে কয়েকটি - একটা মুসুরি ডালের উপর ভারতের মানচিত্র, একটা ডিমের খোসার উপর দশ হাজার শব্দ লেখা।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় ট্যাটরা সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ৩৫ জন ছাত্র ছিল।

ভেবিয়ার (উত্তর কোনানগর) সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন অন্ধ মুরারীমোহন মণ্ডল।

তথ্যঋণ :

১. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

২. স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীনগ্রাম : অরুণ প্রকাশ ঘোষ

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ ধলতিথা - নলকোঁড়া

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অভিনেতা ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রপিতামহ ধলতিথা থেকে কলকাতায় বসতি করেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়েছিলেন এবং কর্মজীবনে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন W. C. Bonnerjee, চন্দ্রনাথ বসু, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। কৈলাসচন্দ্র বসু শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ধলতিথার এই বসুবাড়ির এক অংশের দেরাদুনপ্রবাসী খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান ছিলেন ডাঃ বিধুমুখী বসু, চন্দ্রমুখী বসু, রাজকুমারী (দাস) ও ডাঃ বিন্দুবাসিনী বসু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা কলেজ 'বেথুন কলেজ' থেকে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) একযোগে ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন (Wikipedia)। চন্দ্রমুখী বসু পরে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম মহিলারূপে এম এ (১৮৮৪) পাশ করেন ও বেথুন কলেজে অধ্যক্ষতা করতে থাকেন। রাজকুমারীও বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন।

ধলতিথার মানুষ ছিলেন পরেশ ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'মাঝি'।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ড. দীপক চন্দ্রের শৈশব কেটেছে তাঁদের ধলতিথার ছিন্নমূল পরিবারে।

ধলতিথার সন্তান তরুণ চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশক ধনঞ্জয় মণ্ডল। 'লগান' ছবিতে ছিলেন আর্ট ডিরেক্টর নীতিন দেশাইয়ের সহকারী। আরও অনেক হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'উড়ো চিঠি' ও 'মহাভারত'-এর শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন।

বসিরহাট থানার নলকোঁড়া গ্রামে অনেক পণ্ডিতের বাস ছিল। গ্রামের শতায়ুপ্রায় দেবময় ভট্টাচার্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বৃদ্ধ বয়সেও নিজ সংগ্রহের বিপুল পুঁথি নিয়ে গবেষণায় রত। তালপাতার ও পুরনো মোটা কাগজের পুঁথিগুলির বেশিরভাগই জীর্ণ। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য ছাত্র। তরুণ বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

নলকোঁড়া গ্রামের কর-বাড়ির সন্তান সাহিত্যিক বিমল কর ও ভাস্কর চিন্তামণি কর।

তথ্যঋণ :

১. রসরাজের রসকথন : পুরাতন প্রসঙ্গ : অমৃতলাল বসু

২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ টাকি

টাকির রায়চৌধুরি পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামকান্ত মুন্সি (গুহ) । তিনি সংস্কৃত, ফারসি ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন । এই পরিবার প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর । ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মুন্সি ছিলেন । হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর-এর আমলে উচ্চপদে বহাল ছিলেন । ইংরেজ শাসকদের পরম বিশ্বাসভাজন থাকার মাধ্যমেই তিনি বিত্তশালী হয়েছিলেন ।

টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরি টাকিতে ১৮৩২ সালে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেব । এখানে পড়ানো হত ইংরেজি, বাংলা, আরবি, ফারসি, ও সংস্কৃত । টাকির রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮১ সালে । রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলনের একান্ত সহযোগী ছিলেন কালীনাথ । কালীনাথের মতো রক্ষক না পেলে রামমোহন নিশ্চয়ই বিরুদ্ধপক্ষের গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হতেন ।

টাকির গোপীকৃষ্ণ তর্কালংকার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

টাকির যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ‘বঙ্গের বীরপুত্র’ (বাং ১২৯১) নামে প্রতাপাদিত্যের কাব্যজীবনী লিখেছিলেন ।

উনবিংশ শতাব্দীর কবি প্রমীলা নাগের (১৮৭১ -১৮৯৬) জন্ম টাকিতে । পিতা বিজয়চন্দ্র বসু, মাতুল বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ । তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘প্রমীলা’ এবং ‘তটিনী’ ।

টাকির সন্তান ছিলেন বিখ্যাত ডাঃ অজিতনাথ রায়চৌধুরি, ডাঃ অমল রায়চৌধুরি (জামাতা ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র), সাহিত্যসেবী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কংগ্রেস কর্মী যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষা-সংস্কারক, সাহিত্য-সমালোচক ও শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি ।

টাকির সনৎকুমার রায়চৌধুরি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী ছিলেন । কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র ও মেয়র হয়েছিলেন । হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন । টাকি ভবনাথ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দু সৎকার সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । পুরীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের জমি ও বাড়ি তাঁরই অবদান । তাঁর নামে কলকাতার ট্যাংরায় সনৎকুমার রায়চৌধুরি মেমোরিয়াল বিদ্যালয় ।

সাহিত্যিক কমল কুমার মজুমদার, শিল্পী নীরদ মজুমদার ও শিল্পী শানু লাহিড়ী টাকির একই পরিবারের সন্তান ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা সুশীতল রায়চৌধুরির আদি নিবাস ছিল ঘলঘলিয়া, টাকি ।

ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় টাকির সন্তান। তাঁদের পূর্ব নিবাস ছিল গোকনা গ্রামে।

টাকির প্রমীলচন্দ্র বসু (মধ্যমগ্রাম নিবাসী) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি মধ্যমগ্রামের বসুনগর গ্রন্থাগার, বসুনগর জনকল্যান সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

টাকির বিরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন কবি, পত্রিকা-সম্পাদক ও বাংলা গ্রন্থ-মুদ্রণের নতুন যুগের অন্যতম দিশারি।

টাকির অরুণকুমার বসু (১৯১৯ -১৯৯৬) সাহিত্যসেবী ছিলেন।

টাকি এরিয়ান ক্লাব এ অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন সংঘ (১৮৯৭ সাল)।

টাকির নাট্য-জগৎ ঐতিহ্যমণ্ডিত। টাকির প্রাচীনতম নাট্য সংস্থা ছিল 'টাকী আর্য নাট্য সমাজ' (বর্তমানে অবলুপ্ত)। অন্যান্য সংস্থা হল 'টাকী সম্মিলনী', 'সৈয়দপুর হীরক নাট্য সমাজ', 'সৈয়দপুর পল্লী মিলন সমিতি', 'টাকী মহাকালী নাট্য সমাজ', 'থুবা নাট্য সংস্থা', 'বাংলা বন্ধু নাট্য সংস্থা', 'টাকি সান্ধ্য নাট্য সমাজ' (বান্ধব নাট্য সমাজ), 'স্মরণী নাট্য গোষ্ঠী', 'টাকি যুবগোষ্ঠী', 'টাকি এস. কিউ. নাট্য সংস্থা', 'মিত্রম', 'হাসনাবাদ ড্রামাটিক ক্লাব', 'হাসনাবাদ যুব গোষ্ঠী', 'টাকী কালচারাল ইউনিট', 'নাট্যম', 'টাকি মিলন সমিতি', 'দত্তপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব' (বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব), 'প্রগতি নাট্য সংস্থা', 'টাকী ফায়ার ইউনিট নাট্য সংস্থা', 'সোদপুর দর্পণ', 'টাকি কুশীলব' ইত্যাদি।

ভারতের প্রাক্তন সেনা প্রধান শঙ্কর রায়চৌধুরির বাসস্থান টাকি-সৈদপুরে।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় টাকি ৫৫ উচ্চ বিদ্যালয়ে জন ছাত্র ছিল ও ১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় টাকি বালিকা নিম্ন-পাঠশালায় ২৫ জন ছাত্রী ছিল ও টাকির সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ৭৮ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ

৩. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

৪. টাকী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার হীরক জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ

৫. 'বঙ্গের বীরপুত্র' : যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হাসনাবাদ

বাংলা মুদ্রণের অন্যতম পথিকৃৎ উইলিয়ম কেরি জীবিকার তাগিদে হাসনাবাদের সুন্দরবনে ছিলেন কিছুদিন। ধর্মপ্রচারক কেরি ও জাহাজের ডাক্তার জনৈক জন টমাস ১৭৯৩ সালে এদেশে আসেন। তাঁরা কলকাতায় থেকে কোনও জীবিকার ব্যবস্থা করতে না পেরে কেরির মুনসির পরামর্শে সুন্দরবনের ফাঁকা জমিতে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে হাসনাবদে আসেন। ধার-করা টাকায় একটি নৌকো ভাড়া করে কলকাতার বেলেঘাটা থেকে হাসনাবাদে আসতে চার দিন সময় লেগেছিল। সঙ্গের খাবার তখন নিঃশেষ। নজরে পড়ল এক সাহেবের বাড়ি। নিমক কুঠির ম্যানেজার সাহেব চার্লস শর্ট-এর বাড়ি। তাঁরা শর্ট সাহেবের অতিথি হলেন।

কেরি সাহেব যমুনা-ইছামতীর চরে কয়েক একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করলেন আর থাকার জন্য বানালেন একটা চালাঘর। সাহেবের বন্দুক আছে দেখে স্থানীয় মানুষজনও বসবাস শুরু করল। কারণ তখন সেখানে বাঘের ভয় ছিল। কয়েক মাস পরে ভালো জীবিকার সুযোগে কেরি সাহেব চলে যান মালদহে।

প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৯১০ সালে হাসনাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের জনপ্রিয় জননেতা হারাণচন্দ্র মণ্ডলের (বাং ১৩২৬-১৪০০) জন্ম হাসনাবাদ ব্লকের বাইনাড়া গ্রামে। পরে সাতজেলিয়াতে বসতি করেন। ১৯৫৮ সালে বসিরহাটে খাদ্য আন্দোলনের নেতৃত্বের একজন ছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সালে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় দিল্লি জেলে আটক থাকেন। আসামে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে অন্যান্যদের সাথে কারাবরণ করেন। কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিহার জেলে বন্দী ছিলেন। দীর্ঘদিন R.S.P. দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বিধায়ক ছিলেন।

তথ্যঋণ :

১. Bengal District Gazetteers - 24 Parganas : L. S. S. O'Malley

২. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ হিঙ্গলগঞ্জ - সন্দেশখালি

সুন্দরবন আবাদি-করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের তৈরি বাংলার প্রথম জেলা যশোরের কালেক্টর হেঙ্কেল সাহেব। তাঁর নাম থেকে জায়গার নাম হয় হেঙ্কেলগঞ্জ। স্থানীয় উচ্চারণে হয়ে যায় হিঙ্গুলগঞ্জ, হিঙ্গলগঞ্জ।

সুন্দরবনের বারুইখালির কৃষক-বিদ্রোহী ও লাঠিয়াল ছিলেন রহিমুল্লাহ। ইংরেজ জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলের মহান শিক্ষাব্রতী মঙ্গলচন্দ্র মণ্ডল হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলের এক অখ্যাত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (৯ বৈশাখ ১২৭৬)। নিজে উচ্চ বিদ্যালাভ করতে না পারলেও শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আত্মত্যাগ উজ্জ্বল। তাঁর নামাঙ্কিত ছোট মোল্লাখালির 'মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ' সুন্দরবনে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনের জন্য তিনি বিস্তর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন।

দেশপ্রেমী পাতিরাম রায় (১৯০১ - ১৯৫৫) -এর জন্ম সাতক্ষীরা থানার কাঠালতলা গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে। বসিরহাট মহকুমার সফিরাবাদ স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। চাকরি ত্যাগ করে দেশকর্মী হিসাবে অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটির কাজে যুক্ত হন। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে বসিরহাট কেন্দ্রের সংরক্ষিত আসন থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বসিরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে অন্নসত্র খুলে দরিদ্র মানুষদের সেবা করেছিলেন। তিনি 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামক একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেছিলেন। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান 'সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি'-র সভাপতি ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক জেলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ও ব্যারিস্টার পি. আর. ঠাকুর।

সুন্দরবনের কর্মযোগী শুকচাঁদ বর্মণের (১৯১০-১৯৭৬) জন্ম খুলনা জেলার শ্রীফলতলা গ্রামে। জন-মজুরের কাজের জন্য শৈশবে বাবার সাথে চলে আসেন গোসাবার সাতজেলিয়া গ্রামে। আবাদ জমি হাঁসিলের কাজ, নদীর বাঁধ দেওয়ার কাজ করার সাথে সাথে সুন্দরবনের নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। R.S.P.-দলের কাজে যুক্ত হন।এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'এমলিবাড়ি যজ্ঞেশ্বর বিদ্যা নিকেতন'। অন্যান্য অনেক জনহিতকর কাজের সাথে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী চব্বিশ পরগনা ও খুলনা জেলার কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন। জন্ম হুগলি জেলার এক দরিদ্র তপশিলী কৃষক পরিবারে। স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে কৈশোরে গৃহত্যাগ করেন। সুন্দরবন উন্নয়নের প্রাণপুরুষ এই দেশসেবক সুন্দরবনে আসেন ১৯৪০-এর দশকে। 'সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি'-র সম্পাদক ছিলেন। তপশীলি ছাত্র ও যুব সমাজের কল্যাণে আপ্রাণ কাজ করেছেন। সুন্দরবনকে একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন পাতিরাম রায় ও ব্যারিস্টার পি. আর. ঠাকুর।

সমাজকর্মী ও জননেতা বিনোদবিহারী গায়েন (১৯২২-)-এর জন্ম সন্দেশখালি থানার খুলনা গ্রামে। সুন্দরবনের ওই অঞ্চলে ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯টি জুনিয়র হাইস্কুল ও ২০টি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় খুলনা গ্রামে হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

হিঙ্গলগঞ্জের সমাজকর্মী ও সাহিত্যসেবী দেবাশীষ বর্মণের (১৯৪৬-) জন্মস্থান খুলনা জেলার শ্যামনগর থানার মন্দিরনগর গ্রামে। হিঙ্গলগঞ্জের লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র-এর অন্যতম সংগঠক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই - 'প্রাক-ইতিহাসে সুন্দরবন'।

বসিরহাট মহকুমার ভাণ্ডারখালি গ্রামের অরুণকুমার দাশ (১৯৪৯-) এ যুগের সাহিত্যিক। গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ও নাটক রচয়িতা। সুন্দরবনের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ের গবেষক।

সন্দেশখালি থানার ন্যাজাটের কৃতী সন্তান প্রণবকুমার সরকার (১৯৬৬ -)। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সুন্দরবনের সমাজ, লোকসংস্কৃতি, ধর্ম, লৌকিক দেবদেবী ইত্যাদির বিষয়ে লেখালিখি ও গবেষণা করে চলেছেন। তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাটক ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তরুণ সাহিত্যিক ও শিক্ষক অজিত ত্রিবেদীর (১৯৬৮ -) জন্মস্থান কোঠাবাড়ি, হিঙ্গলগঞ্জ। অনেক গল্প ও কবিতার বই প্রকাশ করেছেন।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় মালঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ে (প্রাইভেট) ৫৫ জন ছাত্র ছিল। ১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় মালঞ্চ নিম্ন-পাঠশালায় ২৭ জন ছাত্র ছিল ও কালীনগর নিম্ন-পাঠশালায় ৫১ জন ছাত্র ছিল। ১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় মিনাখাঁ আবাদ মধ্য বিদ্যালয়ে ২০ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

২. Bengal District Gazetteers - 24 Parganas : L. S. S. O'Malley

৩. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৪. সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত : সুবর্ণ দাস

৫. চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন : কমল চৌধুরী

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ ছোট জাগুলিয়া - শ্বেতপুর

বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের পৈত্রিক নিবাস ছিল ছোট জাগুলিয়া।

দেশের প্রথম যুগের ডাক্তারদের একজন ছিলেন ছোট জাগুলিয়ার হরনাথ বসু। জন্ম পৃথিবা গ্রামে মামার বাড়িতে ১৮৪৭ সালে। কলকাতার গোয়াবাগানে থাকতেন ও সে সময়ে উত্তর কলকাতায় জনদরদী ও দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

ছোট জাগুলিয়ার বসু বাড়ির মনোমোহন বসু ছিলেন কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার ও গীতিকার। তিনি জাতীয় নাট্যশালার ও হিন্দুমেলার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শে নিজ গ্রামে ১৮৪৮ সালে 'ছোটজাগুলিয়া হিতৈষী সভা' গঠন করেছিলেন।

মনোমোহন বসুর দ্বিতীয় পুত্র মতিলাল বসুর কন্যা ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা-অভিনেত্রী ইন্দুবালা দেবী। মনোমোহন বসুর অপর পুত্র প্রিয়নাথ বসু (প্রফেসর বোস নামে খ্যাত) ১৮৮৭ সালে বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে বিখ্যাত 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সার্কাসে বাঙালি মেয়েদের তিনিই প্রথম এনেছিলেন।

মনোমোহন বসুর প্রচেষ্টায় চব্বিশ পরগনা জেলার প্রাচীনতম পত্রিকা 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষী সভার বক্তৃতা' (মাসিক পত্রিকা) নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে।

ছোট জাগুলিয়ার ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু (জন্ম গিরিডিতে) ১৯৩৩ সালে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. পাশ করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে ও রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন।

মৈত্রেয়ী বসুর উচ্চশিক্ষিত পিতা শশীভূষণ বসু সাহেবদের অধীনে চাকরি প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছিলেন। পরে নেপাল সরকরের অধীনে জিওলজিস্টের কাজ করেছেন।

এক ভৈরবী সন্ন্যাসিনী শ্বেতপুরের প্রাচীন মৃন্ময়ী কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবীর সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

ধান্যকুড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার শ্যামাচরণ বল্লভের জন্মস্থান শ্বেতপুর গ্রাম।

অভিনেতা ও গায়ক জহর গাঙ্গুলির পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্বেতপুর।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় শ্বেতপুর নিম্ন-পাঠশালায় ৩৬ জন ছাত্র ছিল ও পৃথিবা নিম্ন-পাঠশালায় ২৬ জন ছাত্র ছিল।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

২. বিষয় কলকাতা : জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

৩ বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ

৪. ইতিহাসে দেগঙ্গা : দিলীপ কুমার মৈতে

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ কদম্বগাছি - কাজিপাড়া

তিতুমিরের বিদ্রোহের পরে ১৮৩৪ সালে বারাসত জেলা তৈরি হয় । ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টরের বাসভবন ছিল 'হেস্টিংস ভিলা' । মুন্সেফ কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল কদম্বগাছিতে ।

১৮৬৩-৬৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় কদম্বগাছি সার্কেল মধ্য বিদ্যালয়ে ২৮ জন ছাত্র ছিল ।

মোগল আমলে উত্তর প্রদেশের জৌনপুর থেকে আনোয়ার পরগনায় এসেছিলেন কাজি ইসমাইল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও কাজির দায়িত্ব পালন করতে । নদীপথে এসেছিলেন আনোয়ার পরগনার জগদিঘাটায় (বারাসতের কাছে) । এখানকার সুতি নদীতে তখন নৌযান চলাচল করত । জগদিঘাটায় রাজা প্রতাপাদিত্যের নৌঘাটি ছিল । পরে নদী মজে যায় । কাজি ইসমাইল জৌনপুরের নাম অনুসারে ওই স্থানের নাম হয় কাজিপাড়া ।

কাজি ইসমাইল জৌনপুরের চতুর্দ্দশ অধস্তন বংশধর ছিলেন কাজি আবদুল ওদুদ (১৯২৬ - ১৯৯১) । তিনি সাহিত্যানুরাগী ও কাজিপাড়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন ।

দক্ষিণ কাজিপাড়ার সন্তান ছিলেন আইনজীবী ও সমাজসেবী মৌলবি মহম্মদ সাদাতুল্লাহ (১৮৮৬ - ১৯৬৩) । বারাসত পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯২৫ -১৯২৮ সালে ।

উত্তর কাজিপাড়ার সন্তান ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী মৌলবি নুরুল হোসেন (১৮৯৫ - ১৯৬৭) । বসিরহাট মহকুমার বেগমপুর বিবিপুর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা । বারাসত পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৩৮ -১৯৪২ সালে ।

১৮৭৪ সালের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় কাজিপাড়ার সার্কেল মধ্য-পাঠশালায় ৫৯ জন ছাত্র ছিল ।

তথ্যঋণ :

১. A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916 : Monmohan Chakrabatti

২. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ বাদু - গুস্তিয়া

গুস্তিয়াতে জন্মেছিলেন ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । ক্ষেত্রনাথ ১৮৬০ সালে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাশ করেন । প্রথম দুজন ছিলেন ইংরেজ । ক্ষেত্রনাথ ছিলেন বাংলার প্রথম এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং ভারতের প্রথম M.I.C.E. (Member of the Institute of Civil Engineers, London) । কলকাতার ইমপিরিয়াল ট্রেজারি বিল্ডিং ও নৈহাটি-ব্যান্ডেল রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণের তিনি ছিলেন প্রধান বাস্তু বিশারদ ।

তিনি নিজের গ্রামে ১৮৭২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৮৮৫ সালে হাইস্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন । তিনি ও বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে ইংরেজ সরকারের রায়বাহাদুর ও কে. সি. আই. ই. খেতাব পেয়েছিলেন । তিনি বারাসত পৌরসভার দ্বিতীয় পৌরপ্রধান (১৮৯১) হয়েছিলেন । তাঁর নামে বারাসতে আছে কে. এন. সি. রোড ।

গুস্তিয়ার সন্তান সুষেন মুখোপাধ্যায় । রামকৃষ্ণ মিশন ও অনান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ১৯২২ সালে রাজনৈতিক মামলায় কারারুদ্ধ হন । মুক্তি পাবার পর ১৯২৩ সালে বোলপুরের কাছে বল্লভপুরে কোপাই নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে ‘আমার কুটির’ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে কুটির শিল্প ও গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করেন । ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গৃহহারা বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে । অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন । স্বাধীন ভারতেও তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে । অকৃতদার এই সর্বজনপ্রিয় মানুষ ছিলেন সকলের ‘দাদু’ ।

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ কুবেরপুর

কুবেরপুরের রায় পরিবারে (ঘোষাল মতান্তরে কাঞ্জিলাল) অনেক গুণী ব্যক্তির জন্ম । এই পরিবারের সন্তান ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী রায় ।

বিপিনবিহারী রায়ের পুত্র নির্মলকুমার রায় ভক্তিমূলক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । বিপিনবিহারী রায়ের অপর পুত্র শ্যামাচরণ রায় ছিলেন সাহিত্যিক, সঙ্গীতপ্রেমী, নাট্যকার ও অভিনেতা । রায়-বাড়ির লাবণ্যকুমার রায়ের পরিচিতি ক্রীড়াবিদ, হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে ।

কুবেরপুরে প্রাচীন ডাকাতে কালী বাড়ি আছে ।

তথ্যঋণ :

১. বারাসতের সুধীজন (১) : হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ

২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

জনপদ ও বাবু-বৃত্তান্ত ◊ কাদিহাটি

কাদিহাটিতে (একাংশ বর্তমানে কলকাতা বিমান বন্দর) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ, বস্তুবাদী বিজ্ঞানী ও পাভলভ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি ঢাকার বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সদস্য ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুগামী ছিলেন । নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজক ছিলেন । তাঁর লেখা অনেক বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে - 'A Psychiatrist Reviews Indian Religion', 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি ।

তথ্যঋণ :

১. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান